পরগাছা

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় এম্, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স্
পুস্তক প্রকাশক—৯০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এক টাকা চার আনা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, বি-এ
পক্ষে
রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্‌স্
পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৯০।২এ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে
ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পিতা ও মাতার শ্রীচরণকমলে

"পরগাছা" ধারাবাহিকভাবে একবৎসর ধরিয়া প্রবাসীতে প্রকাশ হইয়াছিল।

দোলপূর্ণিমা
২৪ ফাল্গুন ১৩২৩

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরগাছা

(১)

গোসাঁইগঞ্জের বৃন্দাবন গোস্বামীর বিধবা ভগিনী মাধবী স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন তত বেলাতেও তাঁহার ভ্রাতার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী নারাণদাসীর ঘুম ভাঙে নাই। মাধবী তাড়াতাড়ি কাঁখ হইতে গঙ্গাজলের ঘড়া নামাইয়া ভিজা কাপড়েই রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। দেখিলেন,

রান্নাঘরের দরজায় তালা বন্ধ। মাধবী ব্যস্ত হইয়া নামিয়া আসিলেন, কাপড় ছাড়িলেন, কাপড় শুকাইতে দিলেন, বার কতক শব্দ করিয়া করিয়া ভ্রাতৃজায়ার ঘরের সামনে দিয়া যাওয়া আসা করিলেন; স্নানের পূর্ব্বে বাসন মাজিয়া জল ঝরিবার জন্য উবুড় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলিতে গঙ্গাজল বুলাইয়া খুব ঠনঠন ঝনাংঝন শব্দ করিয়া ঘরে তুলিতে লাগিলেন, তবু নারাণদাসীর নিদ্রা হইতে জাগরণের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তখন মাধবী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। উঠানে রোদ চড়চড় করিতেছে—একবার উঠানে নামিয়া আসিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া কতখানি বেলা বাড়িতেছে দেখিতেছেন, আবার ভ্রাতৃজায়ার দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেছেন। নারাণদাসীর কাঁচা ঘুম ভাঙিলে মাথা ধরে, মাথা ধরিলে চড়া মেজাজ ঊর্দ্ধক হয়, সুতরাং ভ্রাতৃ-জায়াকে জাগাইতে মাধবীর সাহসে কুলাইতেছিল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া করিয়া মাধবী ভ্রাতৃজায়ার ঘরের রক হইতে নামিয়া গোয়ালঘরের পাশে কুয়োর ধারে আপনার মেটেঘরের দাওয়ায় গিয়া উঠিলেন। সেখানে একটি ষোল সতর বৎসরের সুন্দর ছেলে বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্কুলের পড়া করিতেছিল। তাহার বড় বড় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি স্তবকে স্তবকে ফুলিয়া ফুলিয়া কপালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

মাধবী তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—হাঁরে রাখাল, আজ কি তোর ইস্কুল আছে ?

রাখাল বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—আছে বৈ কি দিদিমা, আজকে আবার কিসের ছুটি থাকবে ?

মাধবী আর কিছু না বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। আবার গিয়া নারাণদাসীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইলেন। নারাণদাসী ভালো করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তখন অসম সাহসকে প্রাণপণে অবলম্বন করিয়া মাধবী ছোট্ট করিয়া ডাকিলেন—বৌ !

বৌএর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

মাধবী গলার কাঠের মালায় আংটা দিয়া ঝুলানো হরিনামের মালার ঝুলিটি বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া নারাণদাসীর ঘরের দরজার সামনে ধন্না দিয়া জপ করিতে বসিলেন।

রোদে রোদে উঠান ভরিয়া উঠিয়াছে, শেষ জ্যৈষ্ঠের খর রোদে কাঠ ফাটিতেছে, কিন্তু নারাণদাসীর ঘুম চটিতেছে না, মাধবীকে তাহার দরজার গোড়ায় ধন্না পাড়িয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কিন্তু মেজাজ চটিতেছে।

মাধবী আবার উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া বলিলেন—রাখাল, বেলা হল, নাইতে যা।

রাখাল এলজেব্রার একটা অঙ্ক কষিয়া শ্লেট হইতে

খাতায় কালি দিয়া লিখিয়া লইতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল—এই যাই দিদিমা। তোমার রান্না কি হল?

"তুই নেয়ে আসতে আসতে হয়ে যাবে। তুই নাইতে যা।"—বলিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন; পাছে তাঁহার একগুঁয়ে তেজী স্বভাবের নাতিটি তাহার রাঙা দিদিমার আচরণের আভাস পাইয়া চটিয়া উঠিয়া একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিয়া বসে, এই তাঁহার ভয় হইতেছিল।

রাখাল কুলীনের ছেলে; জন্মে সে কখনো বাপের মুখ দেখে নাই; তাহার মাও তাঁহার মামার বাড়ীতে রাখালকে প্রসব করিয়াই মারা গিয়াছেন, মাকেও সে দেখে নাই। তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন তাহার দিদিমা; তিনিও কুলীনের স্ত্রী, তিনি কখনো শ্বশুরবাড়ীতে পা দ্যান নাই। এজন্য রাখাল তাহার মায়ের মামা বৃন্দাবনের গলগ্রহ আশ্রিত; তাহার উপর বৃন্দাবন আবার প্রসিদ্ধ কৃপণ সুদখোর মহাজন বনবিহারী গোস্বামীর কন্যা নারাণদাসীকে সুন্দর দেখিয়া দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। দিদিমা মা ও নিজে পরপর কোনো ন্যায্য অধিকার না থাকিলেও যেখানে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে সেখানে যতখানি কুণ্ঠিত হইয়া ও পরের মন জোগাইয়া চলিতে হয়, রাখাল সেরূপ চলিতে জানিত না। সে যে-বাড়ীতে জন্মিয়াছে সেখানকার সে আপনার, এই ধারণায় সে জোর

করিয়া স্নেহ না হোক ন্যায্য ব্যবহারের দাবী করিতে চাহিত। তাহার দিদিমা মাধবী এইজন্য তাঁহার নাতিটিকে বিশেষ রকম ভয় করিয়া চারিদিক সামলাইয়া লইয়া চলি-বার চেষ্টা করিতেন।

মাধবী আসিয়া দেখিলেন তখনো নারাণদাসীর ঘুম ভাঙে নাই।

মাধবী ব্যাকুল ও হতাশ হইয়া নারাণদাসীর ঘরের রকে উঠিবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন।

কৈবর্ত্তদের থাকোর মা উঠানে আসিয়া ডাকিল—কৈ গো মা-গোসাঁই!

মাধবীকে দেখিয়া থাকোর মা বলিল—কি গো দিদি-গোসাঁই, তুমি অমন করে' বসে রয়েছ? রান্না-বান্না এখনো চড়েনি?

মাধবী একটু হাসিয়া বলিলেন—না, আজ একাদশী।

থাকোর মা জিজ্ঞাসা করিল—মা-গোসাঁই কম্নে? চান্ কর্‌তে গেছে বুঝি?

মাধবী আস্তে বলিলেন—না, ঘুমুচ্ছে।

থাকোর মা আশ্চর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ঘুমুচ্ছে! ভ্যালা গেরস্তর বৌ যা হোক! এতখানি বেলা হল, এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুতে নেগেছে! তুমি জাগিয়ে দাও না।

মাধবী বলিলেন—শরীরটে বোধ হয় ভালো নেই, কাঁচা ঘুব ভাঙাব না।

থাকোর মা বলিল—তবে বোলো, আমি এয়েলাম, সুদের পয়সাকটা দিতে। পারি ত ওবেলা আসব'খন।

থাকোর মা চলিয়া যাইতেছে। অমনি নারাণদাসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া নাক সিঁটকাইয়া পরম বিরক্তির ভরে মাধবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আঃ! কী জ্বালাতন! একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার জো নেই। ভোর না হতে দরজার সামনে বসে বকর বকর বকর!... বলি ও থাকোর মা, গেলি নাকি?...

বলিতে বলিতে নারাণদাসী উঠানে নামিয়া তাড়াতাড়ি থাকোর মাকে গ্রেপ্তার করিতে ছুটিল।

পলাতক পয়সা কয়টিকে আদায় করিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে নারাণদাসী উঠানে ফিরিয়া আসিলে মাধবী সসঙ্কোচ ধীর স্বরে বলিলেন—বৌ, রান্নাঘরের চাবিটে?

নারাণদাসী হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে গম্ভীর হইয়া বলিল—আজ আর রান্না চড়াতে হবে না—মহাপ্রেসাদের বাড়ী আমার নেমন্তন্ন, ওঁর আজ হরিবাসর,—রান্না হবে কার জন্যে।

মাধবী সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন—রাখাল?

নারাণদাসী মুখ বাঁকাইয়া নথ দুলাইয়া বলিল—হ্যাঃ! রেখোর জন্যে আবার কাঠ পুড়িয়ে তেল নুন খরচ করে রাঁধতে হবে! ওকে মহাপ্রেসাদের বাড়ী, না হয় ঠাকুর-বাড়ী পাঠিয়ে দিও, চারটি খেয়ে আসবে।

মাধবী মর্ম্মাহত হইয়াও সকল ব্যথা গোপন করিয়া বলিলেন—ওর যে স্কুল আছে বৌ! বেলা করে খেলে যে ওর স্কুল কামাই হবে!

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—তা না হয় স্কুল থেকে এসেই খেলে।

ছু ক্রোশ দূরে স্কুল। সেখানে না খাইয়া পড়িতে গিয়া ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। এতখানি বেলা না খাইয়া ছেলেমানুষ রাখাল কেমন করিয়া থাকিবে?—এ সব তর্ক মাধবীর মনে উঠিলেও তর্ক নিষ্ফল জানিয়া তিনি মিনতির স্বরে বলিলেন—তুমি রান্নাঘরের চাবিটে শুধু দাও, আর সংসার থেকে তুমি একটু নুন দিও; আমি আর সব জোগাড় করে ওকে চারটি রেঁধে দেবো।

নারাণদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—চাল ডাল তেল তরকারী কোথা থেকে জোগাড় করবে শুনি!

মাধবী কুণ্ঠিতস্বরে অপ্রতিভ মুখে বলিলেন—কাঠ কুড়িয়ে রেখেছি; আমায় দশমীর রাত্তিরে যে চাল-গুড় খেতে দাও তাই জমিয়ে জমিয়ে রেখেছি; কেদাত্ত দুলের কাছ থেকে চারটি পাটের শাগ এনেছি; তাই ছুটো সেদ্ধ করে দেবো। তুমি শুধু রান্নাঘরের চাবিটে দেবে চল।

নারাণদাসী অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বলিল—সে চাবি আমার গয়নার সিন্দুকে।

মাধবী মিনতি করিয়া বলিলেন—সিন্দুক খুলে বার করে দেবে চল বৌ; অনেক বেলা হয়ে উঠল, এই রদ্দুর মাথায় করে ওকে দুকোশ পথ হেঁটে ইস্কুল যেতে হবে।

নারাণদাসী নিতান্ত অগ্রাহ্যের ভাবে বলিল—এড়া কাপড়ে সিন্দুক ছোঁব কি করে? ডুবটা দিয়ে আসি।

নারাণদাসীর ডুব দেওয়া মানে যে কতখানি ডুব দেওয়া তাহা মাধবীর বিলক্ষণ জানা ছিল। মাধবী বলিলেন—সিন্দুকের চাবিটে আমায় দাও, আমি বার করে নিচ্ছি।

নারাণদাসী গম্ভীর হইয়া বলিল—ও সিন্দুকে অনেক লোকের গচ্ছিত টাকা আছে, বন্ধকী গয়না আছে, ওর চাবি তোমার হাতে কেমন করে দেবো!

রাখাল তখন নাহিতে যাইবে বলিয়া রান্নাঘরে তেল লইতে আসিতেছিল। সে নারাণদাসীর কথা শুনিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেখানে আসিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—কী! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা, আমার দিদিমা চোর!

মাধবী তাড়াতাড়ি আসিয়া রাখালের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—রাখাল, দাদা আমার, তুই নাইতে যা।

রাখাল রুকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলব রাঙা দিদিমা, তুমি আমার মায়ের মামী; দিদিমার পর মা, মায়ের পর আমি ক্রমান্বয়ে তোমাদের অচ্ছেদ্দার উচ্ছিষ্ট

খেয়ে মানুষ; নইলে অন্য কেউ হলে যে-মুখে আমার দিদিমার অপমান করেছে সে-মুখ আস্ত থাকত না।

মাধবী চোখ রাঙাইয়া বলিলেন—রাখাল! ও কি কথা! আমি যেমন তোর দিদিমা বৌও তেমনি তোর দিদিমা। যা, পায়ে ধরে ঘাট মান।

নারাণদাসী তাড়াতাড়ি কাঁধে গামছা ফেলিয়া কাঁখে কলসী তুলিয়া তেলের বাটি হাতে করিয়া তাহার গোলালো দেহখানি দুলাইয়া বাড়ী হইতে হনহন করিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আগে কুকুর লেলিয়ে দিয়ে পরে আর ঠাট করে ওষুধ মালিস করে আত্তি জানাতে হবে না! থাক্, ঢের হয়েছে!...

মাধবীকে পদে পদে ছুতায়-নাতায় মর্ম্মান্তিক অপমান করিয়া কষ্ট দিতে নারাণদাসীর অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যাইত। কিন্তু রাখালের কাছে কখনো সে এই পরিচয় দিতে পারিত না। কারণ নারাণদাসীর মনের মধ্যে রাখালের যে কতকগুলি বিশেষণ জমা করা ছিল, তাহার মধ্যে গোঁয়ার গুণ্ডা দুটি।

চাবি না দিয়াই নারাণদাসী নাহিতে চলিয়া গেল দেখিয়া রাখাল গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—দিদিমা, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি রান্নাঘরের তালা ভেঙে ফেলি।

মাধবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন—না, গোঁয়ার্ত্তুমি করতে পাবিনে।

রাখাল অভিমান করিয়া বলিল—তুমি মুখটি বুজে অপমান বরদাস্ত করবে, তা লোকে তোমায় অপমান করবে না! বেশ করে রাঙা দিদিমা তোমায় অপমান করে!

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—যা যা নেয়ে আয়গে, মাথা গরম হয়ে উঠেছে, একে আজ রুক্ষু নাইতে হবে, অত মাথা গরম করিসনে।

দিদিমার এত দুঃখেও মুখে হাসি দেখিয়া রাখালও ছল-ছল চোখে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—রুক্ষু নাওয়াটা কি আজকে দিদিমা নতুন?

মাধবী উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ও বিগলিত অশ্রু চাপিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাখালও গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া সেইখানেই সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িল।

একটি তের চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে আসিয়া সুন্দর মুখে হাসি মাখাইয়া বলিল—রাখাল-দা, তুমি অমন করে বসে রয়েছ যে? নাইতে যাওনি? দাদারা যে সব খেতে বসেছে। তুমি নাবে খাবে কখন?

রাখাল দুই হাতের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া হাসিয়া বলিল—আজকে খাব না, আজ একাদশী।

কিশোরী হাসিয়া বলিল—ইস্! এখনো ওঁর পৈতে হয়নি, উনি আবার একাদশী করবেন! সকল মিথ্যে কথা।

রাখালের মুখ হইতে সকল অসন্তোষ বিরক্তি রাগ ও দুঃখের চিহ্ন ঐ সুন্দর মেয়েটির স্নিগ্ধ হাসিটি মুছিয়া দিয়া ছিল। রাখাল প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে হাসিয়া বলিল—মিথে কথা নয় প্রসাদী, ঐ দেখ্ রান্নাঘরে তালা বন্ধ। গোসাঁইদ আজ হরিবাসর করবেন, আর আমি তাঁর ভক্ত নাতি হরি মটর করব!

প্রসাদী একবার রান্নাঘরের তালার দিকে আরবা রাখালের কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকা ইতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া রাখ লের হাত ধরিয়া প্রসাদী বলিল—রাখাল-দা, তুমি আমাদে বাড়ী খাবে এস।

রাখাল অপ্রস্তুত হইয়া চট করিয়া এক মোচড়ে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—যাঃ, আর পাকামি করতে হবে না। আজ আমার একাদশী।

তারপর গলায় গামছা ফেলিয়া একছুটে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। প্রসাদী ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেল। মাধবী তখন মরাইএর আড়ালে দাঁড়াইয়া অঝোরঝোরে কাঁদিতেছিলেন।

মাধবী আঁচলে চোখ মুছিয়া দুখানি ইট পাতিয়া রাখা-লের জন্য আলুনি পাটশাক-সিদ্ধ দুটি ভাত রাঁধিবার জোগাড় করিতে লাগিলেন। প্রসাদীর দাদা ব্রজ আসিয়া বলিল—ঠাকুরমা, আপনাকে আর রান্নার জোগাড় করতে

হবে না। রাখাল আমাদের বাড়ীতে খাবে। প্রসাদী আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

মাধবীর চোখের জলে আগুন আর জ্বালা গেল না।

রাখাল স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেই ব্রজ বলিল—কি রে রাখাল, তোর রকম কি, স্কুল যাবিনে?

রাখাল বলিল—যাব বৈকি। তুই বই নিয়ে নতুন দীঘির ধারে দাঁড়াগে, আমি কাপড়টা ছেড়েই যাচ্ছি।

ব্রজ বলিল—তুই বই নিয়ে আমাদের বাড়ী চ, ভাত খেয়ে নিবি।

রাখাল কাপড় ছাড়িয়া ছেঁড়া জ্যালজেলে ময়লা উড়ানিখানি গায়ে দিতে দিতে বলিল—আজ আমি ভাত খাব না; আজ আমার একাদশী।

ব্রজ হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—চ চ, আর পাগলামি করতে হবে না।

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—পাগলামি নয়, সত্যি বলছি ব্রজ, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আজ থেকে একাদশী করব। বাঙালীর বিধবার মতন কুলীনের ছেলেও নিরাশ্রয়; তাকেও উপোষ অভ্যাস করতে হবে। আজ থেকে দিদিমার সঙ্গে আমারও একাদশী।

রাখাল বই লইয়া উঠানে নামিল। ব্রজ রাখালের একগুঁয়ে স্বভাবের কথা জানিত; রাখালের সত্য কথা জোর করিয়া বলিবার খ্যাতি তাহার সমবয়সী দলে বিলক্ষণ

ছিল ; তাহারা জানিত রাখাল যাহা বলে তাহা করে ; তাহার কথা কখনো যদি একটু আধটু টলে তবে সে তাহার দিদিমার অনুরোধে। সুতরাং ব্রজ তাহাকে আর খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিল না।

মাধবী বলিলেন—ওরে রাখাল, একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে যা...

—না দিদিমা, আমি আজ আর কিছু খাব না।

মাধবী রাখালের হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন —কিছু না খেলে তোকে আজ ইস্কুল যেতে দেবো না।

রাখাল দাওয়ায় উঠিবার সিঁড়িতে বসিয়া পড়িয়া বলিল —কি দেবে দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

"তুই ছেঁচ থেকে উঠে বোস"—বলিয়া মাধবী ঘরে মিষ্টি আনিতে গেলেন ; একখানি রেকাবিতে করিয়া দুটি ছোট-ছোট গুড়ের নারিকেল-সন্দেশ ও এক গেলাস জল রাখালের সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন।

রাখাল এই দুর্লভ দ্রব্য দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টি দিদিমার দিকে ফিরাইয়া বলিল—এ কোথায় পেলে দিদিমা ?

—তা যেখানে পাই না কেন, সে খবরে তোর কাজ কি ? তুই খা না।

"চুরির জিনিস আমি খাইনে"—বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল। "কাল দশমীর রাত্তিরে এইটুকু জল খেতে পেয়েছিলে, তাও নিজের মুখের কাছ থেকে চুরি করে

আমার জন্যে রেখেছ ; তাই আমি খাব ? বেশ করে রাঙা দিদিমা তোমায় চোর বলে !" রাখালের চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মাধবী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।

রাখাল চট করিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—"দিদিমা, ও তুলে রেখে দাও, আমি স্কুল থেকে এসে খাব।" তার পর ব্রজকে বলিল – চ।

ব্রজ রাখালকে বলিল—জুতো পায়ে দিলিনে।

রাখাল সহজ অসঙ্কোচের ভাবে বলিল—জুতো আমার নেই, ছিঁড়ে গেছে।

রাখাল জোরে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইল। ব্রজ নীরবে ধীরে ধীরে রাখালের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। মাধবী দুই চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

(২)

নারাণদাসী বাঁ-কাঁখে জলভরা কলসী, ডান হাতে হরিনামের মালার ঝুলি লইয়া নাহিয়া বাড়ী ঢুকিতেই দেখিল মাধবী দাওয়ায় বসিয়া সামনে একখানি রেকাবিতে দুটি নারিকেল-সন্দেশ সাজাইয়া কাঁদিতেছেন। নারাণদাসীকে দেখিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া সন্দেশের রেকাবিখানি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নারাণদাসী রান্নাঘরের

দাওয়ায় দুম করিয়া কলসী নামাইয়া বলিল—ঠাকুরঝি, ও নারকোল-সন্দেশ কি হবে?

মাধবী অপরাধীর মতন কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—রাখালকে খেতে দিয়েছিলাম।

নারাণদাসী বলিয়া উঠিল—নাতি বুঝি রাগ করে না খেয়েই ইস্কুলে গেলেন? বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলো-পানা চক্কর! দেখে আর বাঁচিনে!—তা ও সন্দেশ পেলে কোথায়?

মাধবী বলিলেন—কাল রাত্তিরে আমায় খেতে দিয়েছিলে, আমি খাইনি।

নারাণদাসী মুখ বাঁকাইয়া জনান্তিকে বলিতে লাগিল—সবাই অমনি না খেয়েই থাকে! পাকা হত্তুকি খেয়েছে আর কি? তাইত বলি, যে, রোজ রোজ ঘরের জিনিস এমন করে উড়ে যায় কোথায়? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তাইতেই!

মাধবী দৃপ্তস্বরে বলিলেন—দেখ বৌ, অমন অকথা কুকথাগুলো বোলো না। ভগবান জানেন, তুমিও জানো, যে, আমি চুরি করিনে, চুরি করবার আমার জো নেই, শুনো উনুনটাতে পর্য্যন্ত তোমার চাবি!

নারাণদাসী নিতান্ত নির্য্যাতিত নির্দ্দোষীর মতন ভাব করিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা ঠাকুরঝি, আমি তোমার নাম বাষ্প কিছু করেছে যে তুমি এই সক্কালবেলা ভগমান্

দেখিয়ে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে? আমি যার এইসব ছোটলোকপনা ঝগড়া খিটমিটির ভয়ে বাড়ীতেই থাকিনে। বুকের ওপর বসে নাতিপুতি নিয়ে গণ্ডেপিণ্ডে গিলবে আবার ভগমান দেখিয়ে শাপ মন্যিও দেবে! এমনি কলিই বটে!

মাধবী আর কিছু না বলিয়া সন্দেশের রেকাবিখানি লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। নারাণদাসী গজর গজর করিতে করিতে কাপড় ছাড়িয়া কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে গেল।

খানিক পরে নাকে গোপীচন্দনের সূক্ষ্ম একটি তিলক কাটিয়া, হাতে একজোড়া তাস লইয়া, নারাণদাসী বাহির হইল। মাধবীর ঘরের দাওয়ার কাছে আসিয়া দাওয়ার উপর ঝনাৎ করিয়া রিং-সুদ্ধ দুটা চাবি ফেলিয়া দিয়া নারাণদাসী বলিল—ঠাকুরঝি, আমি মহাপ্পেসাদের বাড়ী যাচ্ছি; তুমি এক তোলো ধান সেদ্ধ কোরো, ঘরে চাল বাড়ন্ত;—রাত পোয়ালে তোমারই নাতি সক্কালের আগে গোগ্রাসে গিলবে।

(৩)

মাধবী ধান সিদ্ধ করিতেছেন। বৃন্দাবন গোসাঁই সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম ও চরণের ছাপ মারিয়া, নাকের ডগা হইতে কপালের উপর-সীমা পর্য্যন্ত তিলক কাটিয়া, ন্যাড়া মাথার মধ্যস্থল হইতে মোটা লম্বা তেলচিকচিকে টিকি দুলাইয়া, ভুঁড়ি ফুলাইয়া, হাতে হুঁকা ঝুলাইয়া, বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন মাধবীকে বলিলেন—মাধী,

আজকে রেখো নাকি রাঙা বৌএর সঙ্গে ঝগড়া করে না খেয়ে ইস্কুলে গেছে?

মাধবী কোনো জবাব দিলেন না।

বৃন্দাবন বলিয়া চলিলেন—ভ্যালা গোঁয়ার ছেলে হয়েছে। ওকে এর পর এঁটে ওঠা দায় হবে। ওকে বাড়ীতে রাখতে হলে একটা লেঠেল রাখতে হবে দেখছি। যার ছেলে সে সকল-উৎপাত মিষ্টি মেনে সয়ে যেতে পারে; পরে সইবে কেন? রাঙা বৌ যদি রেখোর গোঁয়ার্তুমিতে রাগ করে, তবে তাকে ত সেজন্যে দোষ দেওয়া যায় না। মাধী, তুমিই ভেবে দ্যাখ না। আমি হক্ ন্যায্য কথাই বলছি, কারো দিকে টেনে বলছি নে। এক তোমাকেই চিরকালটা বাড়ীতে পুষতে হল, তারপর তোমার মেয়েকে পুষতে হল—তোমরা কেউ একদিনের তরে ত শ্বশুর-সোয়ামির ভিটে মাড়ালে না......

মাধবী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—দাদা, সেটা কি আমাদের দোষ? আমার অজ্ঞানে বাবা কুলীনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন আপত্তি করতে পারিনি। কিন্তু যখন আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ তোমরা কুলীনের ঘরে করছিলে তখন কি আমি আপত্তি করিনি? আমি কি বলিনি, কুলীনে আর কাজ নেই, কুলীনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে? বংশজেরা বিয়ে করতে মেয়ে পায় না, তাদের ঘরে পড়লে মেয়ে আমার সোয়ামির

ভিটেয় আঁসভাত খেয়ে সুখে থাকবে,—সেই রকম একটা পাত্তর দেখে বিয়ে দেবার জন্যে তোমাদের কি সাধিনি? তার উত্তরে তোমরা বল্লে কি যে কুলীনের মেয়ের জাত মারলে অধর্ম্ম হবে। মস্ত কুলীন দেখে বিয়ে দিলে তোমার ভাগ্নীর! তোমরা জাত দেখেছিলে, ভাত দেখনি; এখন বিরক্ত হলে চলবে কেন দাদা?

বৃন্দাবন অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—আমরা ভালো ভেবেই ত করেছিলাম। আর ভালো যে নাই হবে তাই বা কে বলতে পারে। কেনারাম দাদা বলছিল যে পাহাড়-পুরের রাজারা মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে একটি ঘরজামাই খুঁজছে—পাত্তরটি দেখতে শুনতে ভালো হবে, কুলীনের ছেলে হবে, বাপ মা কেউ থাকবে না, বয়েস অল্প হবে। রাখালের সঙ্গে সব ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে। তুমি যদি বল ত আমি কেনারাম দাদাকে দিয়ে রাখালের জন্যে চেষ্টা করি। রাখাল সেখানে রাজার হালে সুখে থাকবে; রাজার সেই এক মেয়ে মাত্তর, আর ছেলেপিলে হয়নি।

মাধবী একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—সে পাহাড়পুর কোথায়? রাজারা বামুন ত?

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, বামুন বৈ কি। সেই যে যেখানে বাণেশ্বরপুরের পঞ্চু মুখুয্যের ছেলে শ্রীকেষ্ট বিয়ে করেছিল। শ্রীকেষ্ট হল গে সেই রাজার ভগ্নীপোত।

মাধবী খুসী হইয়া বলিলেন—ও! তা হলে ত খুব

ভালোই হয়। শ্রীকেষ্ট তা হলে রাখালের পিসশ্বশুর হবে। শ্রীকেষ্টর বৌকেও আমরা দেখেছি, সেবার বিন্দাবনে দেখা হয়েছিল, বেশ অমায়িক লোক। তা দাদা, তুমি একটু চেষ্টা কর।

(৪)

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট হইয়া গেল যে রাখাল পাহাড়পুরের রাজার ঘরজামাই হইতে যাইতেছে। গ্রামের লোকে ছেলেটার পাতাচাপা কপাল দেখিয়া কপালে চোখ তুলিতে লাগিল।

খবর শুনিয়া প্রসাদীর বাবা মথুর আসিয়া মাধবীকে বলিল—মাধীপিসি, যা শুনছি তা কি সত্যি?

—সত্যি মিথ্যে এখন ভবিতব্যই জানেন বাবা, আমরা চেষ্টা করছি।

—কিন্তু রাখালকে যে আমার জামাই করব অনেক দিনের সাধ ছিল। সেই মনে করে পেসাদীর এত বড় বয়সেও আমি বিয়ের চেষ্টা করিনি।

—জানি বাবা। কিন্তু কি দেখে তুমি পেসাদীকে রাখালের হাতে দিতে চাচ্ছ? যার মাথা গুঁজবার মতন একখানা চালা নেই, ডুটি কিছু সেদ্ধ করে খাবার মতন একটা চুলো নেই, তাকে মেয়ে দিতে চাও কোন্ সাহসে? যাদের বাড়ীতে আছে তারা যেদিন কিছু খেতে ছায় খেতে পায়,

না খেতে দিলে উপোষ করে থাকে। আজকে রাখাল আমার না খেয়ে ইস্কুলে গেছে।

মাধবীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল। মথুর দুঃখিত হইয়া বলিল—সবই শুনেছি পিসি! রাখাল খেয়ে যায়নি বলে পেসাদীর সে কী কান্না, সেও কি কিছুতে ভাত খায়। তবে বুঝলে কিনা পিসি, ছেলেটি ভালো দেখে দেওয়া, তারপর মেয়ের বরাতে সুখ থাকে হবে, না থাকে ত আমরা কি করতে পারি বল! রাখালকে আর ব্রজকে ত আমরা ভিন্ন মনে করিনে। রাখাল এখন না হয় আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। তারপর বড় হয়ে আপনার পথ আপনিই দেখে শুনে নেবে।

মাধবী বলিলেন—তুমি ছা-পোষা মানুষ; মেয়ে জামাই পোষবার মতন অবস্থা ত তোমার নয়। খাওয়া-পরার সংস্থান আছে এমন ভালো ছেলে পেসাদীর জন্যে ঢের পাবে বাবা। তোমরা দশজনে আশীর্ব্বাদ কর আমার রাখালের একটা হিল্লে লাগুক।

মথুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হ্যাঁ, সে ত আশীর্ব্বাদ করছিই, রাখাল ত আমাদের পর নয়।

রাখালের উপর গ্রামের অকর্ম্মণ্য ছেলের দলের বিশেষ আক্রোশ ছিল। তাহারা পরিপাটি ভাবে তিলক-সেবা করিয়া সমস্ত দিন তাস পিটিয়া গাঁজা টানিয়া গুড়ুক ফুঁকিয়া কদর্য্য আলাপে দিন কাটাইত, এবং সময়ে সময়ে

গোসাঁইজু সাজিয়া শিষ্যবাড়ী হইতে টাকাটা সিকেটা ফলটা তরকারীটা সংগ্রহ করিয়া আনিত, এবং মচ্ছবের সময় কীর্ত্তনে মাতিয়া লাফালাফি করিয়া দশায় পড়িয়া মালসা-ভোগটা মালপোটা সংগ্রহ করিত। এজন্য রাখাল তাহা-দিগকে দেখিতে পারিত না, তাহাদের সঙ্গে মিশিত না। তাহাদিগকেও রাখালকে সমীহ করিয়া চলিতে হইত, রাখালকে দেখিয়া অভিভাবকের আবির্ভাবের মতন তাড়া-তাড়ি গাঁজার কল্কে লুকাইতে হইত, কদর্য্য আলাপ থামাইতে হইত; এজন্য রাখালের উপর তাহাদের বিষম আক্রোশ ছিল।

রাখাল স্কুল হইতে ফিরিয়া গ্রামে ঢুকিতেই দেখিল তাহারা দল পাকাইয়া ঘোষের 'পড়া'র উপর বসিয়া আছে। নবগোপাল ওরফে নবাই ডাকিয়া বলিল—ওহে রাখাল, তোমার আর পৈতে হল না; একেবারে বিয়েই হবে।

এত বয়স পর্য্যন্ত পৈতা হয় নাই বলিয়া রাখাল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত থাকিত। কিন্তু তাহার মায়ের মামা বৃন্দাবন গোসাঁই এই বাজে খরচটা যতদিন পারেন না করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং মাধবী কখনো তাগাদা করিলেই বলিতেন—দাঁড়াও, দেখি, কোনো শিষ্যি সেবক যদি পৈতেটা ওর দিয়ে দ্যায়। নইলে আমি খরচপত্তর করে পৈতে দি এমন ত আমার অবস্থা নয়।" বোধ হয় বৃন্দাবনের মনে নারাণদাসী এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল

যে মাধবীর কিছু গুপ্তধন নিশ্চয়ই আছে, কারে-পড়িয়া একদিন তাহা বাহির করিতেও পারে হয়ত।

নবাইএর কথা শুনিয়া রাখাল লজ্জিত হইয়া কোনো কথা না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। নিমে বলিয়া উঠিল—উঃ! রাজার জামাই হবে কিনা, তাইতে আর দেমাকে মুখ থেকে রা খরচ করা হচ্ছে না।

কাঙালী উহারই মধ্যে একটু লেখাপড়ার ধার ধারিত, দুচারখানা নাটক নভেল পড়িয়াছিল। তাই সে দলের গোদা। বয়সেও সে দলের ছেলেদের চেয়ে অনেক বড় এবং উহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া চুকিয়াছিল। সে দীনবন্ধুর জামাই-বারিকের গং আওড়াইয়া বলিল—

ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

নমে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ওরে—

কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলমান,
ঘরজামায়ে পুষ্যিপুত্তুর সব কটাই সমান।

ভুতো সুর করিয়া বলিল—ঘরজামায়ের আদর কতক্ষণ?

তেতো তেমনি সুর করিয়া জবাব দিল—তার বৌ-মনিবটি যতক্ষণ!

কাঙালী বলিল—ওহে রাখাল, তুমি ত ভাই রাজনন্দিনীর খাস খানসামা হতে চললে। আমাদেরও এক-একটা মহিসী মহিষী জোগাড় করে দিও।

কাঙালী মহিষী শব্দটার উপর এমন জোর দিয়া বলিল যে সকলে তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

রাখাল ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেন উহারা তাহাকে ওরূপ সমস্ত কথা বলিল তাহা ঠিক বুঝিতে না পারায় রাগ সম্বরণ করিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

বটু চেঁচাইয়া বলিল—যাও যাও, তোমার শ্বশু র লেঠেল ডেকে আনগে যাও।

সকলের উচ্চ হাসি রাখাল দূর হইতে শুনিতে পাইল। আর শুনিতে পাইল কাঙালী তাহাদের মূল গায়েন হইয়া সুর করিয়া দীনবন্ধুর মাণিকপীরের গান গাহিতেছে—

"পাহাড়ে প্রকাণ্ড হাতী শিকলি বাঁধা পায়।

ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ীর ব্যাঙের লাথি খায়!"

বিশ্বাসদের ডোবার ধারে বিন্দির-মা গরু বাঁধিতেছিল। রাখালকে শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া সে আপন মনেই ..লয়া উঠিল—আহা বাছারে! এখানে বড় কষ্ট, ভগবা মুখ তুলে চান, সেখানে যেন বিয়েটা হয়।

রাখাল বাড়ী ঢুকিতেই নারাণদাসী তাড়াতাড়ি আসিয় তাহার দাড়ি ধরিয়া বলিল—হাঁ-রে রাখাল, আমি নেয়ে এসে ভাত রেঁধে দিচ্ছি বলে নাইতে গেলাম; ডুবটে দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে দেখলাম তুই না খেয়ে চলে গেছিস! ভ্যালা রাগ ভাই তোর! দিদিমা হই, নাতির সঙ্গে একটু ঠাট্টা করি, তাও বুঝতে পারিসনে? এই এত

বড় আষাঢ়ান্ত বেলা ঠায় অমনি গেল; মুখ যে শুকিয়ে আমসি দড়ি হয়ে গেছে! নে নে চটপট হাত মুখ ধুয়ে নে, আমি ভাত বাড়িগে।

রাখাল তাহার রাঙা দিদিমার এই অকস্মাৎ স্নেহাতিশয্যের কোনো সঙ্গত কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া একবার মাধবীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—আমি আজ ভাত খাবনা রাঙা দিদিমা, আজ একাদশী।

নারাণদাসী স্নেহের অনুযোগের স্বরে বলিল—আবার রাগ করে! নে নে আর রাগ করতে হবে না, আয়।

—রাগ নয় রাঙা দিদিমা। কালই ত ভাত খেতে হবে। কিন্তু আজ খাব না। আজ থেকে আমি একাদশী আরম্ভ করেছি।

—আচ্ছা তবে আয় জল খাবি আয়।

রাখাল হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া দেখিল একখানা বড় থালায় আম জাম কাঁঠাল তালশাঁস শশা ফুটি ছানা ক্ষীর সন্দেশ, এবং তিনটি পাথর বাটিতে চিনির পানা, বেলের পানা, তরমুজের সরবৎ সাজানো রহিয়াছে। যে দিনটা নিরম্বু একাদশী দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, সে দিনটার অবসানে এমন রাজভোগ যে কেন এবং কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা রাখাল কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যেন আরব্য-উপন্যাসের কোন্ পরীর অনুগ্রহে হঠাৎ

তাহার দৈন্যদশা হইতে রাজার হাল হইয়াছে। রাখাল অল্পক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া থাকিয়া ডাকিল—দিদিমা।

মাধবী আসিলে রাখাল তাঁহাকে বলিল—দিদিমা, আমি যে তোমায় নারকোল-সন্দেশ তুলে রাখতে বলেছিলাম, এনে দাও।

মাধবী সেই দুটি তে-বাস্‌টে নারিকেল-সন্দেশ আনিয়া দিলে রাখাল তাঁহাই খাইয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত এক গেলাস জল খাইয়া বলিল—আঃ!

মাধবী ভীত হইয়া উঠিলেন পাছে বা রাখাল নারাণ-দাসীর দেওয়া খাবার স্পর্শও না করে। তাই আদেশের স্বরে বলিলেন—রাখাল, খা।

রাখাল একবার দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে নত হইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

(৫)

রাখাল খাওয়া-দাওয়া করিয়া নিজের মেটে ঘরটিতে গিয়া দিদিমার কোলের কাছে বসিয়া বলিল—দিদিমা ব্যাপার কি বল ত?

রাখাল দিদিমার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল প্রদীপের আলোতে তাঁহার চোখে জল চকচক করিতেছে। অথচ কথায় পরম সন্তোষের হাসি মাখাইয়া মাধবী বলিলেন—তোর যে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে!

—দিদিমা, তোমরা কি ক্ষেপেছ? নিজেরা খেতে

পাও না, তার ওপর রাজার মেয়েকে নিয়ে আসবে রাঙা দিদিমার মুখনাড়া খাওয়াতে আর উপোষ করাতে।

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—না রে সে ভয় আর নেই, দেখছিস নে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে উদ্দেশেই বৌএর মেজাজ বদলে গেছে। কিন্তু মেজাজ বদলাক আর না বদলাক, তাতে কিছু আসে যায় না; রাজার মেয়ে এ ভিটে মাড়াতে আসছে না, তুই রাজার বাড়ীতে গিয়ে রাজার হালে থাকবি।

—ও! তাইতে কাঙালী ননে ভুতো ওরা আমাকে ঘরজামায়ে বলে ঠাট্টা করছিল! না দিদিমা, আমি ঘর-জামাই কিছুতেই হব না। তুমি যদি জোর কর ত আমি দেশত্যাগী হয়ে যাব।

মাধবী রাখালের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-কোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন—আমার কি বড় সাধ যে তোকে সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পাঠিয়ে আমি এই ভিটেয় একলা পড়ে থাকি? তোর এই পেটে দুটি অন্ন পড়ে না, রুক্ষ মাথায় একটু তেল পড়ে না, পরণে একখানা কাপড় জোটে না, পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই, এ আর আমি দেখতে পারিনে। তুই শুকনো মুখে খালি গায়ে খালি পায়ে দুকোশ পথ হেঁটে দুবেলা রোদ্দুর মাথায় করে ইস্কুলে যাওয়া আসা করিস, আমার বুক যে ফেটে ফেটে যায়।

মাধবীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—কিন্তু দিদিমা, তুমি যাই বল, আমি ঘরজামাই হতে পারব না। না হতেই লোকে কত ঠাট্টা করতে লেগেছে। শ্বশুরবাড়ীর সুখের চেয়ে আমার এ দুঃখ ঢের ভালো।

মাধবী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—মেয়েরা যে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাকে তাদের ত কৈ তাতে অপমান হয় না? শ্বশুর ত বাপের সমান। তোর যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, বাপ-মায়ের সে একমাত্তর সন্তান; সমস্ত বিষয় ত তোরই হবে; তা ছাড়া বিয়ে হলে বরপণ ও কুলীনের মর্য্যাদা বলে যা পাবি তাতেই ত তোর ভেসে যাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া বলিল—না না দিদিমা, আমাদের হেডমাষ্টার বলেন যে বিয়ে করে পয়সা নেওয়া বড় খারাপ।

মাধবী বলিলেন—এ ত আর আমরা জোর করে নিচ্ছিনে, তারা নিজে থেকে ইচ্ছে করে দিচ্ছে। সে ত তোর হক্কের পাওনা।

রাখাল জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা আমি অত-শত বুঝিনে, আমি কিছুতেই ঘরজামাই হব না।

মাধবী রাখালকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—তুই ভেবে দেখছিস নে, এখানে থাকলে তোর লেখাপড়া কেমন করে হবে? এখান থেকে মেরে কেটে না হয় এণ্টেন্সটা দিবি। তারপর? আমি যে তোকে এত কষ্ট করে মানুষ করলাম, তুই কি আমাকে একদিনের

তরেও সুখী করবিনে, আমার এই দুঃখু তুই কখনো ঘোচাবিনে?

রাখাল দিদিমার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল তাঁহার চোখ ছলছল করিতেছে। ক্ষণেক নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা দিদিমা, রাজার বাড়ী বিয়ে করলে তোমার দুঃখু কি করে ঘোচাব?

—কেন? সেখানে তুইই ত রাজা হবি। আমি রাজার দিদিমা হব!

—কিন্তু দিদিমা, ভুতো আর নেতো বলছিল ঘর-জামায়ের আদর কতক্ষণ? না, তার বৌ-মনিবটি যতক্ষণ!

—ষাট ষাট! ওকি অলক্ষুণে কথা! তোরা চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকবি।—পোড়ারমুখো ডেকরাদের যেমন কথা! পরের ভালো সহ্য হয় না, সেই জ্বালাতে যা মুখে আসে তাই বলে।—বলিয়া মাধবী রাখালের মাথায় আপনার হাতখানি একবার রাখিয়া চোখ বুজিলেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা ধর, যদি ভুতোর কথা ঠিকই হয়।

মাধবী একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—ঈশ্বর না করুন, যদি তাই হয়, ততদিনে তুই লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হবি, আমাদের দুজনের চলে এমন রোজগার করতে পারবি। গরীব হওয়ার দুঃখু ত দেখছিস, কত গরীবকে তুই অন্ন বস্ত্র বিদ্যে দান করবি। আমি দেখে সুখী হব।

রাখাল আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদিমা, তুমি ঠিক বলছ—আমি রাজার মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার দুঃখ ঘুচবে? তোমার কষ্ট দূর হবে?

মাধবী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—হবে রে হবে। আমার দুঃখ্ ঘুচবে বলেই ত তোকে বলছি।

রাখাল দিদিমার বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মাধবী সমস্ত রাত্রি মা-মরা হাতে-করিয়া-মানুষ-করা নাতি-টিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। যখন ভোর বেলা কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল তখন তিনি অশ্রু মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া "হরিহে দীনবন্ধু" বলিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। অতি সন্তর্পণে রাখালের দাড়িতে হাত দিয়া চুমু খাইয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—সেই ভালো, তুই মনে করে থাক আমার দুঃখ ঘুচবে! তোকে ছেড়ে আমার দুঃখ যে শতগুণ বেড়ে যাবে ভাই!

তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না উছলিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন নারাণদাসী অত ভোরে উঠিয়া বাড়ীর পাটঝাঁট করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—ওকি ঠাকুরঝি, এত ভোরে উঠলে কেন, কাল থেকে উপোষ করে রয়েছ!

মাধবী ম্লান হাসি হাসিয়া মনে মনে বলিলেন—ওরে রাখাল, দেখে যা, আমার দুঃখ এরই মধ্যে ঘুচেছে !

তারপর নারাণদাসীর নিষেধ না মানিয়া তিনি আপনার নিত্যকার অভ্যস্ত গৃহকর্ম্মে নীরব হাসিমুখে লাগিয়া গেলেন।

(৬)

পরদিন বৃদ্ধ কেনারাম বাঁড়ুজ্জে একটা থেলো হুঁকায় লম্বা নল লাগাইয়া টানিতে টানিতে খালি গায়ে খালি পায়ে মাথায় একখানি গামছা পাট করিয়া বসাইয়া বৃন্দাবন গোসাঁইএর বাড়ীতে আসিয়া ডাকিল—বৃন্দাবন ভায়া, বাড়ী আছ ?

বৃন্দাবন রকের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তাড়াতাড়ি হুঁকাটা এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দিয়া বলিলেন—আসুন দাদা। ওরে রাখাল একখানা মাদুর এইখানে পেড়ে দে ত।

রাখাল লজ্জিত মুখে আসিয়া মাদুর পাতিয়া দিল। কেনারাম মুড়ো-করিয়া-ছাঁটা পাকা গোঁফের তলা হইতে হাসিয়া বলিল—কি রে শালা, রাজার জামাই হয়ে গেলি ! আমি ঘটক, বুঝলি ত, বখরা দিতে হবে !

রাখাল সেখান হইতে মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। কি কথা হয় শুনিবার জন্য মাধবী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং নারাণদাসী ঘরের দরজার আড়াল হইতে উঁকি মারিতে লাগিল।

বৃন্দাবন পাঁজি তুলিয়া এ-পাত সে-পাত উল্টাইয়া একটু মুখ বাঁকাইলেন।

কেনারাম বলিল—কি দেখছ?

—দুটো দিন আছে, একটা তিরিশে জ্যেষ্ঠ, আর-একটা তেরই আষাঢ়।

কেনারাম বলিল—তা বেশ, তিরিশে হয়ে না ওঠে তেরই হবে। আমরা এখান থেকে আঠারই উনিশে রওনা হয়ে যাব।

ঘরের মধ্যে চুড়িবালা খুব ঝনঝন করিয়া উঠিল। বৃন্দাবন কথা টানিয়া বলিলেন—আ—চ্ছা দে—খি।

কেনারাম উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—ঠিক্ কর চটপট করে বোলো, তাদের আবার লিখতে জানাতে হবে ত। ওরা হল গিয়ে রাজা, রাজার ঐ এক মেয়ে, তারা রীতিমত উজ্জুগ আয়োজন করবে...তারা আষাঢ় মাস পেরুতে দেবে না, মেয়ে তের চোদ্দ বছরের হয়ে গেছে, চারিদিকে ছেলে খুঁজতে লেগে গেছে।

কেনারাম চৌকাঠ ডিঙাইতে না-ডিঙাইতে নারাণদাসী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিয়া উঠিল—জ্যেষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের পৈতে কি করে হবে? আষাঢ় মাসে মেঘ ডাকবার ভয় আছে। শীতকাল নইলে কি ছেলের পৈতে দ্যায়?

মাধবী কাতর দৃষ্টিতে নারাণদাসীর মুখের দিকে তাকা-

ইয়া করুণ স্বরে বলিলেন—জ্যেষ্ঠি মাসের তের দিন বাদ দিয়ে ত জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে পৈতে হতে পারে বৌ! আর যার তিন কুলে কেউ নেই তার আবার লক্ষণ অলক্ষণ।

নারাণদাসী দরদ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—ষাট ষাট! অমন কথা কি বলতে আছে! আমরা বুঝি পর, আমরা বুঝি ওর কেউ নই? এখন আবার একটা পরের মেয়ের হাত ধরতে যাচ্ছে! আহা তাদের মা-বাপের ঐ একটি!

—বলিয়া নারাণদাসী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

মাধবী তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার আকস্মিক স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া নিরুপায় ভাবে মিনতি করিয়া বলিলেন—তবে না হয় আষাঢ় মাসেই হবে। কিন্তু তাতে আপত্তি কোরো না বৌ।

নারাণদাসী কিছু না বলিয়া বৃন্দাবনের মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনির অর্থ—এইবার তোমার ওজর করিবার পালা।

বৃন্দাবন কোণ হইতে হুঁকাটি উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—এর মধ্যে উজ্জুগ আয়োজন হয়ে উঠবে কেমন করে?

মাধবী বলিলেন—বড় সাধের বিয়ে তার আবার দু পায়ে আলতা! না হলে নয় তাই মাথাটা মুড়িয়ে গলায় তে-দণ্ডি সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া। এর আর কি উজ্জুগ করতে হবে দাদা!

বৃন্দাবন ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে

বলিলেন—আমার নলকাঁপার শিষ্যি নফর কুণ্ডুর বৌ বলেছিল যে এবারকার পাট বিক্রী হলেই রাখালের পৈতে দিয়ে দেবে। তাতে ঘটা করে পৈতেটাও হত, আমাদেরও দু পয়সা ঘরে আসত।

মাধবী কাতর হইয়া বলিলেন—কিন্তু দাদা, কেনা-দাদা বলে গেল রাজারা আর অপিক্ষে করবে না।

বৃন্দাবন গম্ভীর হইয়া হুঁকার মুখ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—তা যদি অপিক্ষে না করে, কি করব বল, রাখালের অদেষ্টে রাজভোগ নেই বুঝতে হবে। আমি এখন কোত্থেকে পৈতের খরচপত্তর করব। আমাদের ত শিষ্যি-সেবকের নিয়েই নাচন-কোঁদন।

মাধবী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—তবে কি হবে দাদা!

—আমি আর কি বলব বল। রাধাকান্ত যা করবেন তাই হবে।—বলিয়া বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিলেন। পিছনে পিছনে নারাণদাসীরও অন্তর্ধান।

ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাধবী ডাকিয়া বলিলেন—দাদা, আমার ত একখানা গহনাপত্তরও নেই যে তাই বাঁধা দিয়ে কি বেচে ওর পৈতেটা দিয়ে দেবো। ওর মায়ের হার আর বালা তোমাদের কাছে ছিল, তাই বেচে ওর পৈতেটা দিয়ে দাও।

নারাণদাসী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ওমা! সে কি কথা ঠাকুরঝি? ভারি ত সে বালা হার, হাল্কা ফঙফঙে,

মরা সোনার,—সে বেচে তিন কুড়ি টাকাও হয়নি। এত-কাল যে রাখালের ইস্কুলের মাইনে গুণলাম, সে কোত্থেকে? আমাদের ত আর বাঁধা হুণ্ডি নেই!

মাধবী অবাক হইয়া খানিকক্ষণ নারাণদাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নারাণদাসী সঙ্কুচিত হইয়া পলায়নের উদ্‌যোগ করিতেছে দেখিয়া নিরুপায়ের কাতরতায় ব্যাকুল হইয়া মাধবী বলিলেন—তবে কি হবে বৌ? শেষকালে কি আমাকে দোরে দোরে ভিক্ষে করে রাখালের পৈতে দিতে হবে?

নারাণদাসী তাহার নথটিতে একটু দোল খাওয়াইয়া মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তির স্বরে বলিল—তোমার যে দেখছি ধনুকভাঙা পণ ঠাকুরঝি! বাবা! একটু তর সয় না! এত-কাল গেল আর এই ক'টা মাস বৈ ত নয়, মাঘ মাসেই নফর কুণ্ডুর বৌ পৈতের খরচ ত দেবে বলেছে!

মাধবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন— সে ত আজ তিন বচ্ছর ধরে শুনে আসছি বৌ! রাখালের এই বিয়ে আমি ফস্কাতে দেবো না। তাতে আমাকে ভিক্ষে করতে হয় তাও স্বীকার!

নারাণদাসী ফর্‌কিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে পরম ঘৃণার ভরে বলিয়া গেল—তা তোমার যেমন পিরবিত্তি।

মাধবী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে দাদা, আমি গাঁয়ের লোকের কাছে ভিক্ষে করিগে?

বৃন্দাবনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁহাদের

মনে বোধ হয় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মাধবী তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিবার ফন্দিতে আছেন। ইহাঁরা যখন কিছুতেই উপুড়-হস্ত করিবেন না, তখন বাধ্য হইয়া মাধবী তাঁহার লুকানো পুঁজি-পাটা বাহির করিবেন। সত্য-সত্য তিনি আর কখনো দাদার মুখ হেঁট করিয়া গাঁয়ের লোকের কাছে ভিক্ষা করিতে যাইতে পারিবেন না। বৃন্দা-বন মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মাধবী যদি নেহাতই নিজের পুঁজি না ভাঙেন তবে তিনি নমোনমঃ করিয়া রাখালের পৈতেটা দিয়া দিবেন। কিন্তু নারাণ-দাসীর সঙ্কল্প ছিল চরম কঠিন—যাহারা অন্নধ্বংস করিতেছে তাহাদের জন্য উপরি বাজে খরচ কিছুতেই নয়; তা মাধবী যদি ভিক্ষা করেন করুন, তাহাতে তাহারা অপমান গায়ে পাতিয়া লইবে না।

মাধবী সেখান হইতে চলিয়া গিয়া পাঠে রত রাখালকে বলিলেন—রাখাল, রান্নাঘরে ভিজে ভাত আছে; আর-কোনো তরকারি পেলাম না ভাই, একটা কাঁচকলা পুড়িয়ে ঢেকে রেখে গেলাম; খেয়ে ইস্কুলে যাস। আমি পৈতের জোগাড় করতে যাচ্ছি।

এতকাল পরে তাহার পৈতা হইবে শুনিয়া রাখালের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তখনো জানে না যে তাহার অমন তেজস্বিনী দিদিমা তাহার ভাবী সুখের জন্য কি দারুণ অপমান স্বীকার করিতে যাইতেছেন।

মাধবী চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বৃন্দাবন একবার রাঙা বৌএর মুখের পানে তাকাইলেন। নারাণদাসী ভাব বুঝিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—যাক গে! বোনের মেয়ে ভাগ্নী, তার ছেলে, বৈ ত নয়। এতে তোমার কিছু অপমান নেই।

বৃন্দাবনের মুখ ফুটিল, একটু কিন্তু-ভাবে বলিলেন—রাখালের বড়লোকের বাড়ী বিয়ে হলে নানারকম পাওনা-থোওনাতে এ খরচটা উঠে যেত। মাধী যদি গাঁ জানিয়ে পৈতে দ্যায়, রাখালের মন চটে থাকবে।

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ভাবো কেন? ওর দিদিমা ত আমাদের এস্তেজারীতেই রইল। দিদিমাকে সুখে রাখবার জন্যে ও আমাদের একেবারে ঠেলে ফেলতে কিছুতেই পারবে না।

বৃন্দাবন সন্দেহাকুল স্বরে বলিলেন—রাখাল যদি তার দিদিমাকে নিজের কাছে নিয়ে যায়?

নারাণদাসী নথ দুলাইয়া বলিল—ভাবো কেন? রাজারা মাওড়া ডোকলা ছেলে খুঁজছে, যে, মেয়ে ছাড়া আর কোনো দিকে জামাইএর টান থাকবে না। তারা জামাইএর দিদিমাকে নিয়ে যেতে দিলে ত? আর যদিই বা নিয়ে যেতে চায়, ঠাকুরঝি যাবে না—এই ভাইএর ভিটেয় উপোষ করে মরবে, তবু নাতির রাজা-শ্বশুরের বাড়ী যাবে না। হয় না-হয়, দেখে নিয়ো।

বৃন্দাবন রাঙা বৌএর কথা সুযুক্তি বলিয়া মানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া হুঁকা ফুঁকিতে লাগিলেন।

(৭)

প্রসাদী স্নান করিয়া নিংড়ানো ভিজা কাপড়ে গামছা-খানি জড়াইয়া বাঁ হাতের তেলোয় রাখিয়া কাঁধের কাছে উঁচু করিয়া ধরিয়া আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। সম্মুখেই মাকে দেখিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল—মা, রাখাল-দা'র পৈতে গাঁ থেকে ভিক্ষে করে হবে; গোসাঁইদাদা পৈতের খরচ দেবে না।

প্রসাদীর মা বলিলেন—দূর, তা আবার কখনো হয়?

প্রসাদী জোর করিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি শুনে এলাম মাধী-ঠাকুরমা বড়গোসাঁইকে বলছে। মাধী-ঠাকুরমা এখনি ফিরবে, তুমি হয় নয় জিজ্ঞাসা কর।

প্রসাদীর মা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা তুই যা, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকগে, মাধী-পিসি এদিক দিয়ে গেলে ডেকে আনবি।

প্রসাদী মাধবীকে ডাকিয়া আনিল।

প্রসাদীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—পিসিমা, সত্যি?

ছলছল চোখে মাধবী বলিলেন—আমার পোড়াকপালে সবই সত্যি হয় বৌমা।

—কি ঠিক হল?

—বড়গোসাঁই আর কেনা-দাদা ভার নিয়েছে, গাঁ থেকে চাঁদা তুলে এই তিরিশে জোষ্টিই পৈতে দিয়ে দেবে।

প্রসাদীর মা কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—পিসিমা, আমি একটা কথা বলব?

মাধবী উৎসুক ও আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি বলবে বৌমা?

প্রসাদীর মা ব্যথিত স্বরে বলিলেন—আমাদের বড় সাধ ছিল, রাখালের সঙ্গে পেসাদীর বিয়ে দেবো। তা যখন হল না, রাখালের পৈতে আমিই দেবো; ভিক্ষে করে ওর পৈতে হতে দেবো না।

মাধবীর অশ্রুসাগরে বান ডাকিল। ধৈর্য্যের সহ্যের বাঁধ ভাঙিয়া অশ্রুর স্রোত বেগে বহিতে লাগিল। এ কান্না বড় দুঃখের, বড় আনন্দের। প্রসাদীর মারও চোখ হইতে জল পড়িতেছিল। তাহাদের দেখাদেখি অবুঝ দুঃখে প্রসাদীর চোখ দুটিও শুষ্ক ছিল না।

মাধবী একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—বৌমা, তুমি রাখালের মা, তুমি রাখালের পরম লজ্জা নিবারণ করলে। রাখাল তোমার। তুমি পেসাদীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও দিও, আমি রাজার মেয়ের লোভ ছেড়ে দিলাম।

প্রসাদীর মাতা প্রসাদীর দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন - পেসাদীর অদৃষ্টে যা আছে হবে; আমরা রাখালের সুখের হন্তারক হব না পিসিমা!

মাধবী অতিশয় সুখে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন—আমি আশীর্ব্বাদ করছি বৌমা, পেসাদী আমাদের রাজরাণী ভাগ্যিমানী হবে।—তারপর প্রসাদীর দাড়িতে হাত দিয়া চুমু খাইলেন।

ছলছল চোখে লজ্জা ভরিয়া প্রসাদী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

প্রসাদীদের বাড়ীতেই রাখালের পৈতা হইল। রাখাল তাহাদেরই বাড়ীর একটা ঘরে বন্ধ আছে। প্রসাদীর দাদা ব্রজ স্কুলে চলিয়া যায়; প্রসাদী সমস্ত দিন রাখালের ঘরে থাকিয়া রাখালের নির্জ্জন বন্দীদশার দুঃখ লাঘব করে।

সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ম্লান অন্ধকারে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া ছটফটে রাখালের মন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল; সে একবার উঠিয়া একদিককার একটা জানালা একটু ফাঁক করিয়া বাহিরের উজ্জ্বল হাসিমুখ দেখিয়া লইল। অমনি প্রসাদী তিরস্কার করিয়া সাবধান করিয়া বলিয়া উঠিল—ও কি রাখাল-দা, সূয্যি দেখা যাবে যে, শুদ্দুরের মুখ দেখে ফেলবে যে!

রাখাল হাসিয়া বলিল—যা যা, তোকে আর গিন্নেমো করতে হবে না।

প্রসাদী খুব ভারিক্কি চালে বলিল—হবে না বৈকি? মা আমায় তোমাকে আগলাতে বলেছে! দাঁড়াও ত মাকে বলে দিচ্ছি!

রাখাল বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, জান্‌লা বন্ধ করে দিচ্ছি, মামীকে কিছু বলিসনে যেন।

প্রসাদী আবার তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া বলিল—মামী বলছ আবার! মা যে তোমার ভিক্ষে-মা!

রাখাল সুখে পূর্ণ হইয়া বলিল—ভিক্ষে-মা নয় পেসাদী; মা তোরও মা, আমারও মা! পেসাদী, তোর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত ত বেশ হত!

প্রসাদী ভ্রূকুটিতে আনন্দ চাপা দিয়া বলিল—যাও রাখাল-দা, অমন করলে আমি চলে যাব বলছি, থাকবে একলাটি এই অন্ধকারে পড়ে!

রাখাল তাহার নরম হাতখানি মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল – না ভাই লক্ষ্মীটি, চলে যাসনে।

রাখাল নিজের মুঠির মধ্যে প্রসাদীর হাতটিতে চলিয়া যাইবার মতন কোনো রকম আকর্ষণ অনুভব না করিয়া হাসিল। সে হাসি প্রসাদীর স্বচ্ছ সুন্দর চোখে মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই তাহাদের মুখের সে হাসি মিলাইয়া গেল। রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আর ক'টা দিনই বা, চলে যেতে হবে। পেসাদী, এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি, দিদিমার কষ্ট ঘুচবে বলেই আমি সেখানে বিয়ে করতে যাচ্ছি, নইলে তোকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতাম না।

—আমি আর কক্‌খনো তোমার ঘরে আসব না।

—বলিয়া প্রসাদী রাখালের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বড় জোরে মল বাজাইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার একখানা কুঁড়ে ঘরও যদি থাকত তবে তোমায় চলে যেতে দিতাম বৈ কি?

প্রসাদী ঘাড় ঘুরাইয়া দৃষ্টিতে তীব্র তিরস্কার হানিয়া চলিয়া গেল।

রাখাল বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল—এই-সমস্ত চেনা লোকদের ছাড়িয়া তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে; সেখানকার লোকেরা কি রকম; সেখানে কাহার সহিত সে খেলা করিবে; তাহাদের সহিত তাহার মন মিলিবে? তাহার মন এই চেনা ছাড়িয়া অজানার সহিত নূতন পরিচয়কে ভয় করিতে লাগিল। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অন্ধকার ঘরে একলাটি বসিয়া এইসব চিন্তা তাহাকে অত্যন্ত উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল।

একটু পরেই প্রসাদী ঘুরিয়া আসিয়া দরজার বাহির হইতে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। অন্যমনস্ক রাখাল তাহাকে দেখিতেছে না দেখিয়া প্রসাদী এ-জানলা হইতে ও-জানলায় বারবার উঁকি মারিয়াও যখন তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না তখন রাগে ঠোঁট ফুলাইয়া মল বাজাইয়া চলিয়া গেল। আবার পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। চিন্তাকুল রাখাল

তবুও কোনো কথা বলিল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া প্রসাদী বলিল—রাখাল-দা, কেমন ! একলা আছ !

রাখাল ম্লান মুখে বলিল—তুই আয়।

রাখালের মুখে স্বরে রঙ্গ রসিকতার কোনো আভাস না পাইয়া প্রসাদী আস্তে আস্তে আবার ঘরে ঢুকিয়া রাখালের কাছে গিয়া বসিল।

তিন দিন এমনি আনন্দেই কাটিয়া গেল। রাখাল মুক্তি পাইয়া বাহির হইল। অমনি গাঁয়ের ভুতো নন্দে ফটকেরা তাহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। নেড়া মাথায় টোপর যে চমৎকার মানাইবে; তাহার মাথা মুড়ানো হইয়াছে, এইবার ঘোল ঢালিয়া গাধার টুপি মাথায় পরাইয়া ভাঙা ঢোল বাজাইয়া তাহাকে জন্মের মতো গাঁয়ের বাহির করিয়া দিলেই হয়; ইত্যাদি বিদ্রূপ তাহারা সুযোগ পাইলেই রাখালকে শুনাইতে লাগিল। রাখাল পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা অনেক লঘু অপরাধে ইহাদিগকে গুরুদণ্ড দিত; ইহারা সকলে মিলিয়াও গায়ের জোরে তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না; সেজন্য, রাখাল যাহা গায়ের জোরে করিত ইহারা দূর হইতে কথার ধূলাকাদা ছুড়িয়া তাহারই প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিত। আজকাল রাখাল ইহাদিগকে কিছুই বলে না দেখিয়া কাপুরুষের দল তাহাকে অধিকতর আঘাত করে, এবং আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে রাখালটার এ হইল কি !

সুভালাভালি রাখালের পৈতা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মাধবীর চিন্তার অন্ত নাই। রাখাল যে বিবাহ করিতে যাইবে, তাহার বরবেশ জোগাড় হইবে কোথা হইতে? দাদার নিকট চাহিতে মাধবীর আর প্রবৃত্তি হইতেছিল না। অপরের কাছে ভিক্ষা করা আরো অপমানের। হায়, মাধবী কি আগে জানিতেন যে রাখালকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে? রাখাল যদি সুখী হয় তবেই এই সুদুঃসহ দুঃখ সার্থক হইবে।

মাধবীর একখানি মাত্র পুরাতন তসরের কাপড় ছিল। সেইখানি তো-করিয়া লইয়া তিনি রাখালের হাতে দিয়া বলিলেন—রাখাল, আজকে একটু সকাল-সকাল ইস্কুলে যা, শিবগঞ্জের বাজারে যে দর্জ্জি আছে তাকে এই কাপড়-খানা দিয়ে তোর গায়ের দুটো জামা করে দিতে বলিস।

রাখাল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন বিলাস-সজ্জা ত তাহার জন্মে কখনো হয় নাই। সে কাপড়খানি হাতে করিয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল—দিদিমা, এ কাপড় তুমি আর পরবে না?

রাখালের মুখে হাসি দেখিয়া মাধবীর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রাখালকে তিনি চিনিতেন, বালক হইলেও কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া সে নিজে সুখ ভোগ করিবে ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই মাধবী

বলিলেন—আমি ত অনেক দিন প'রলাম ; এখন পুরোনো হয়ে গেছে, এবার তুই পর ; আর ত আমি তোকে কিছু পরাতে পাব না ; আমার কাছ থেকে নেবার মতন আর তোর অভাবও কিছুই থাকবে না।

মাধবীর আনন্দ ছাপাইয়া চোখে জল ছলছল করিয়া উঠিল। রাখাল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই আপনার নূতন ঐশ্বর্য্যের আনন্দে তন্ময় হইয়া তসরের কাপড়খানির উপর পরিপূর্ণ মমতায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু দিদিমা, সেলাইয়ের বানি দেবো কোত্থেকে ?

মাধবী চোখের জলে হাসি ঢাকা দিয়া বলিলেন—সে ভাবনা তোর কেন ? তোর দিদিমা কি এতই গরিব ?

রাখাল অপ্রতিভ হইয়া কাপড়খানি লইয়া স্কুলে চলিয়া গেল।

আবদারে দুলের রক্ত-আমাশা হইয়া মরিবার দশা হইলে মাধবী তাহাকে একটি টোটকা ঔষধ দিয়া ভালো করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ চাষা দিদি-গোসাঁইকে তাহার ক্ষেতের ধান ও পাট কিছু উপহার দিয়াছিল। ধান ক'টি হইতে মুড়ির চাল করিয়া রাখালের জলখাবারের সংস্থান হইয়াছিল। এবং পাটগুলি মাধবী অবসর-সময়ে পাকাইয়া পাকাইয়া দড়ি করিয়াছিলেন ; সেই দড়ির কিছু দিয়া গোটা দুই শিকা ভাঙিয়াছিলেন। সেই দড়ি আর শিক্কাগুলি লইয়া গিয়া আবদারে দুলেকে দিয়া মাধবী বলিলেন—

আবদার, তোমাকে আমার এইগুলি দু-এক দিনের মধ্যেই বেচে দিতে হবে ভাই।

আবদার বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি দিদি-গোসাঁই! দরবেরে তুলে ঘরামির কাজ করে, দড়ি সে নেবে 'খন; আর অতিকান্ত রাশুবাবুদের বাড়ী জল তোলে, সে এক-জোড়া শিকে খুঁজছিল, তাকে এই শিকেজোড়াটা গছিয়ে দেবো।

মাধবী বলিলেন—আমার দামটা শিগগির চাই আবদার; রাখালের জামা করতে দিয়েছি, দাম দিতে হবে।

আবদার বলিল—কালকেই আপনাকে আমি পয়সা দিয়ে আসব দিদি-গোসাঁই।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিলেন—এতে কত হতে পারবে আবদার?

আবদার দড়ির নুটিটা হাতে তুলিয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিল—দড়ি সের পাঁচেক হবে—এতে টাকা ডেড়েক; আর শিকের দর ত দশ আনা বাঁধা—তা এ বেশ পোক্ত মজবুত আছে, আমি বারো আনার কমে এ ছাড়ব না। তা হলে হল গিয়ে এক ট্যাকা আট আনা আর বারো আনা—দুট্যাকা চার আনা। এর বেশী হবে ত কম হবে না দিদি-গোসাঁই। আমি যতটা পারি টেনে দেখব!

—তা ত দেখবেই। নইলে এত লোক থাকতে তোমায়

কেন দিলাম ভাই?—বলিয়া মাধবী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

আবদার ডাকিয়া বলিল—আচ্ছা দিদি-গোসাঁই, রাখালের যেখানে বিয়ে হবে তারা শুনছি নাকি রাজা! বাইশটে নাকি হাতী আছে! বাইশ-বাইশটে হাতীর খোরাক জোগায়, সে ত বড় কেউ-কেষ্টা নয়।

মাধবী আনন্দিত হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ ভাই, তারা খুব বড়লোক। তোমরা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ কর রাখাল আমার সুখী হোক।

আবদারে উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—উঃ রাখাল বড্ডি ভালো ছেলে! আমাকে বলে আবদার মামা! রাখাল ত রাজা হবেই! ওর ভালো হবে না ত কি ভালো হবে ননে ভুতো তেতোর? ঝাঁটা মারো অমন সব ছেলের মুয়ে!

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—অমন কথা বলতে নেই আবদার, হাজার হোক ওরা বামুনের ছেলে, দুষ্ট দজ্জাল হলেও আমাদেরই ত আপনার।

আবদার অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আমি কি আর ওনাদেরকে অমন কথা বলতে পারি দিদি-গোসাঁই; ঝাঁটা মারলাম ওনাদের রীতকে, ওনাদের আক্কেলকে।

মাধবী আবার যাইবার উপক্রম করিতেছেন। আবদার বলিল—আচ্ছা দিদি-গোসাঁই, গোসাঁইজুর কেমন আক্কেল!

তারই ত নাতি হাজার হোক! অপর লোকে পৈতে দিয়ে দিলে একটু লাজসরম হল্ না! তারপর বিয়ে করতে যাবে, একটা জামা কাপড় চাই, তাও তুমি গতর খাটিয়ে দড়ি ভেঙে, তাই বেচে, করে কম্মে দেবে, তবে হবে? দেখ দিদি-গোসাঁই, দোজবোরে-গুনোর অমনিই এক ধারা!

মাধবী দাদার নিন্দায় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন—না আবদার। রাখালকে খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করলে কে? সে ত দাদাই। রাখালের ইস্কুলের মাইনে বই জোগাচ্ছে কে? সে ত রাঙা বৌই। এখন দাদার হাতে টাকা নেই, দাদা ত শীতকালে পৈতে দিয়ে দিতই, কিন্তু এই বিয়েটা ফস্কে যায় বলে আমার এত তাড়াতাড়ি। সে ত আমারই দোষ আবদার, আমি ব্যস্ত হয়ে দাদার মুখ হেঁট করেছি!

আবদার গর্ব্বিত ভাবে বলিল—আমাদের হাতে টাকা না থাকলে আমরা কি করতাম দিদি-গোসাঁই জানো? আমরা মহাজনের কাছে তমস্থক কেটে টাকা কর্জ্জ করতাম; বোনকে পরের বাড়ী মাগুতে যেতে দিতাম না!

মাধবী নিরুত্তর। তিনি পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু আবদারের কথার ছিড় আর মরে না।

আবদার তাঁহার গমনে বাধা দিয়া বলিতে লাগিল—তুই গয়লা বলছিল কি দিদি-গোসাঁই, যে, আমাদের দুঃখু বিপদে সবার আগে দিদি-গোসাঁই হামরাই হয়ে বুক দিয়ে

এসে পড়ে ; আমরা ওনাদের সেবক,—সেবক না ছেলে ; আমরা সবাই মিলে চাঁদা করে রাখালকে যতুক দেবো। ধুম্‌সো সেতো গঞ্জের হাটে জামা কাপড় জুতো কিনতে যাবে।

মাধবীর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল। "না না, তুষ্টুকে বলিস তোদের কিছু করতে হবে না। আমি সব জোগাড় করেছি।"—বলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

আবদার অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল দিদি-গোসাঁই দূরে গিয়া মাথার ঘোমটা একটু নামাইয়া দিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

মাধবী বাড়ী আসিয়াই আপনার বেতের-উপর-চামড়া-মোড়া চৌ-আড়ী পুরাতন পেটারীটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া থানকতক কাপড় ও রাখালের জামা উড়ানি বাহির করিলেন ; এগুলি পূজা পার্ব্বণ গচ্ছব নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য তোলা থাকিত। জীর্ণ ছিটের জামাটির দু-এক জায়গায় মচকাইয়া গিয়াছে ; হলদে-পেড়ে কাপড়খানির এক জায়গায় খোঁচ লাগিয়াছে, উড়ানিখানিতে দিস্তা পড়িয়াছে। মাধবী সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া ছেঁড়াগুলি রিফু করিলেন ; নিজের দুখানি থান কাপড়ে ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সেলাই করিয়া লাগাইলেন। তারপর সেগুলিকে ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া গঙ্গা হইতে কাচিয়া আনিয়া শুকাইতে দিলেন।

বৃন্দাবন রকে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া মাধবীর কাণ্ড দেখিতেছিলেন। নারাণদাসী বৃন্দাবনকে মাধবীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—নাতির রাজবেশের জোগাড় হচ্ছে !

স্বপ্নে রাজার হয়েছি রাণী,

ফেলে দে আমার ন্যাকড়া কানি !

বৃন্দাবনের মনে বোধ হয় একটু বেদনা, একটু লজ্জা বোধ হইতেছিল। তিনি মাধবীকে ডাকিয়া বলিলেন—মাধী, কালকে গঞ্জের হাট ; রাখালের জামা কাপড় কি কি চাই বোলো, কাল কিনে আনব।

মাধবী দাদার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দের আগ্রহের সহিত বলিলেন—আমি সব একরকম জোগাড় করেছি দাদা, তুমি শুধু একজোড়া জুতো কিনে দিও।

বৃন্দাবন গম্ভীর হইয়া বলিলেন—রাখাল যেন স্কুলের ছুটির পর হাটে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি উমৃশো কয়ালির আড়তে থাকব।

নারাণদাসী বৃন্দাবনের পিঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল—আর কিছুর যখন দরকার নেই তখন শুধু একজোড়া জুতোই কিনে দিও।

বৃন্দাবন কিছু না বলিয়া, একটুও না নড়িয়া, এক মনে ধীরে ধীরে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় রাখাল হাসিমুখে বাড়ী ফিরিল, দর্জি তাহার জামা কালই দিবে বলিয়াছে। সে-হাসিমুখ আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যখন সে দেখিল তাহার দিদিমা তাহার জন্য কত কাপড় জামা চাদর ধুইয়া পাট করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তারপর যখন শুনিল যে তাহার গোসাঁই-দাদা কাল হাট হইতে জুতা কিনিয়া দিতে চাহিয়াছেন তখন রাখালের মন সুখের ভারে ভাঙিয়া পড়িবার মতন হইল।

আনন্দের নিষ্ঠুর তাড়নায় অস্থির হইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার চোখে ঘুম আসিল না। কখন্ সকাল হইবে, কখন্ সে হাটে যাইবে, এই ঔৎসুক্য তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। সকাল যদি হইল ত স্কুল যাইবার বেলা আর হয় না; স্কুল যদি গেল ত ছুটির ঘণ্টা আর বাজে না।

সুখের প্রতীক্ষারও অন্ত আছে। সন্ধ্যাবেলা রাখাল বড় একটা পোঁটলা হাতে ঝুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল—আজ তাহার আশাতীত আনন্দ! তাহার গোসাঁই-দাদা দু-দুজোড়া ধোয়া ফুলপেড়ে ধুতি কিনিয়া দিয়াছেন; দু-দুটো জামা কিনিয়া দিয়াছেন—তাহার একটা লাল ছিটের, একটা রেশমী; একজোড়া রেশম-পেড়ে উড়ানি কিনিয়া দিয়াছেন; আর কিনিয়া দিয়াছেন এক জোড়া চকচকে বার্ণিশ-করা ঘোরতোলা জুতো! আর দর্জি তসরের জামা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে, তাহারও মজুরী গোসাঁই-দাদা দিয়াছেন, দিদিমার একটা পয়সাও খরচ হয় নাই!

রাখাল পরিপূর্ণ আনন্দে হাসিমুখে বোচকা খুলিয়া আপনার নূতন ঐশ্বর্য্য একটার পর একটা তুলিয়া তুলিয়া দিদিমা ও রাঙা-দিদিমাকে দেখাইতে লাগিল। মাধবীর মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু রাখাল একটার পর একটা জিনিস তুলিয়া তুলিয়া দেখাইতেছিল আর ভিমরতি বুড়ো-মিন্সের এতগুলো বাজে খরচ দেখিয়া নারাণদাসীর গা যে জ্বলিয়া যাইতেছিল তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাহার আড়ষ্ট মুখের উপর যেন এক এক পোঁচ কালি মাড়িয়া দিতেছিল।

এমন সময় ধুমসো সেতো একটা রংচঙা টিনের তোরঙ্গ মাথায় করিয়া বাড়ী ঢুকিল,—তাহার পশ্চাতে এক-একটা ভার কাঁধে করিয়া করিয়া আসিল তুষ্টু গয়লা, আবদার, সোনা কৈবর্ত্ত, আর কেদার্ত্ত দুলে।

সেবক শিষ্যেরা ভেট লইয়া আসিয়াছে দেখিয়া প্রাপ্তির সম্ভাবনায় নারাণদাসীর অন্ধকার মুখ বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—এসব কিরে সাতু? ঐ-ঐঘরের রকে নামাগে।

সাতকড়ি বলিল—রাখালের আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব এনেছি মা-গোসাঁই।

নারাণদাসীর মুখ আবার অন্ধকার হইয়া গেল। সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

তুষ্টু জিজ্ঞাসা করিল—দিদি-গোসাঁই এসব কোথায় নামাব ?

মাধবী নারাণদাসীর ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—ঐ ঘরকে নামাওগে ভাই।

এক ঝুড়ি আম, বড় দুটো কাঁঠাল, এক হাঁড়ি শিবগঞ্জের রসগোল্লা, এক হাঁড়ি দই, এক হাঁড়ি ক্ষীর, একটা চাল ডাল তরকারীর সিধে, একটা ময়দা ঘি চিনির সিধে ভার হইতে বাহির হইল।

মাধবী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোরা কি ক্ষেপেছিস তুষ্টু ? কত খরচ করেছিস ? বাক্সতে আবার কি?

সাতকড়ি ট্যাঁক হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া বাক্সের ডালা খুলিয়া দিয়া কৃতকর্ম্মের আনন্দের তৃপ্তিতে দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইল। আর সকলেও হাসিমুখে মাধবীর মুখের দিকে চাহিল। মাধবী ও রাখাল উৎফুল্ল হইয়া দেখিলেন বাক্সের মধ্যে কাপড় জামা জুতা রহিয়াছে।

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওরে রাখাল, তোর রাঙা কনেকে ডাক, তার ফুলশয্যের জিনিস এসেছে, ঘরে তুলুক!

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—তুমি থাকতে আমাকে কি আর রেখোর মনে ধরবে ঠাকুরঝি ?

মাধবী হাসিয়া বলিলেন—তুমি হলে গিয়ে রাঙা বৌ!

দেখছ না, রাখাল কেমন একদিষ্টে তোমার চাঁদমুখের দিকে চেয়ে আছে! আমার ছুটি হয়ে গেছে রাঙা বৌ!

উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারার মুখে দীর্ঘনিশ্বাস চাপা দিয়া মাধবী হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান, দারুণ শোকের যবনিকার মতন তাহা রাখালের সলজ্জ সুখের হাসি ও নারাণদাসীর আড়ষ্ট কাষ্ঠহাসির মাঝখানে দুলিতে লাগিল।

গাঁয়ের সকল লোকেই একে একে রাখালকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া কাপড় চাদর দিতে লাগিল। চাষাদের দেওয়া রঙিন টিনের তোরঙ্গটি বোঝাই হইয়া উঠিল, রাখালের ঐশ্বর্য্য আর তাহার বুকে ধরে না। মাধবী তুষ্টুদের বলিলেন—দেখ্ তুষ্টু, যে যতই দিক, তোদের যতুক সবার সেরা!

তুষ্টুরা কৃতার্থ হইয়া হাসিয়া বলিল—সে আপনাদের ছিচরনাশীর্ব্বাদে, আপনাদেরই খেয়ে পরে!

রাখাল স্কুল হইতে আসিয়া বলিল—দিদিমা, স্কুলে পর্য্যন্ত খবর পৌছে গেছে। হেডমাষ্টার কত দুঃখু করছিলেন, বলছিলেন, এ বছর তুমি এণ্ট্রান্সে স্কলারশিপ পাবে বলে আমরা কত আশা করে ছিলাম, তুমি কিনা পড়া ছেড়ে বিয়ে করতে চল্লে! তিনি আমাকে বড় ভালো বাসতেন দিদিমা। তিনিও আমাকে জলখাইয়ে ধুতি চাদর দিয়েছেন।

মাধবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—চিরজীবন যেন তুই এমনিধারা সকলের ভালোবাসা পাস।

(৯)

ক্রমে রাখালের যাওয়ার দিন আসিল। আজ সন্ধ্যার সময় সে আজন্মের চেনা দেশ ও জানা লোকদের ছাড়িয়া কোন্ অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে বাস করিতে যাইবে। যে-দেশকে যে-সব লোককে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, জীবনে আর তাহাদের হয়ত সে দেখিতে পাইবে না। রাখালের প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামের যে 'পড়া'য় সে তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে হাডুডুডু খেলিয়াছে, যে পুকুরে এক ঘণ্টা ধরিয়া সাঁতার কাটিত, যে বাগানে গাছে উঠিয়া আম পাড়িয়া খাইত, আজ তাহারা সকলেই যেন বিচ্ছেদের বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বাড়ীর পাশের কৃষ্ণচূড়ার গাছটির তলায় সে প্রসাদীর সহিত বসিয়া গল্প করিত, ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনিতে পাড়ার সকল ছেলেমেয়ে জুটিয়া লুকাচুরি খেলিত,—আজ সেসব জায়গা শূন্য উদাস দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। আজ সকাল হইতে রাখাল গ্রামের পথে পথে ঘুরিতেছে, তরু লতা ঘাট বাট সকলকে জন্মের শোধ যেন দেখিয়া লইতেছে; এতদিনকার পরিচিত তাহারা, তাহাদের কাছে চিরবিদায় চাহিয়া লইতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে পথে দুলে মুচি হাড়ি

কৈবর্ত্ত যাহাকে দেখিতেছে তাহাকেই কান্নাভরা কণ্ঠে বলিতেছে—আজ আমি যাব !—বুকের মধ্যে কান্না ফুলিয়া ফুলিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে ; চাপিয়া রাখা যে আর যায় না !

বিকাল হইয়া আসিল। রাখাল গ্রামের সকল আত্মীয়ের বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া আসিতে লাগিল,—তাহার চোখ দিয়া শুধু জল পড়িতেছিল, মুখে কোনো কথা ছিল না।

অকর্ম্মা ছেলেদের আড্ডায় গিয়া একে একে তাহাদের দুই হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জলে ভাসিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে রাখাল বলিল—আমি ভাই, তোদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। আমাকে আজ ভাই মাপ কর। আমি আর কখনো তোদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসব না। তোদের সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা !

রাখাল উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উহাদের চোখেও আজ জল, মুখে একটি কথা নাই।

সব শেষে রাখাল প্রসাদীদের বাড়ী গেল। দরজার কাছেই ব্রজ দাঁড়াইয়া ছিল, রাখাল দৌড়িয়া গিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইয়া শিশুর মতন কাঁদিতে লাগিল ; ব্রজও কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা দুটিতে যে ছেলেবেলা হইতে একসঙ্গে, রাখাল যে ব্রজকে সকলের চেয়ে বেশী ভালো বাসে, ব্রজও যে সকলের চেয়ে রাখালকে বেশী ভালো

বাসৈ ; আজ তাহাদের জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি! শুধু কান্না, শুধু কান্না! কথায় বলিবার কিছু নাই!

উহাদের কান্নার শব্দ শুনিয়া প্রসাদীর মা আসিয়া দুজনকে দুই হাতের বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিয়া কোলের কাছে করিয়া বসিলেন। তিনিও শুধু কাঁদিলেন, কোনো কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে রাখাল প্রণাম করিয়া উঠিল। প্রসাদীর মা অশ্রুভরা কণ্ঠে বলিলেন—রাজ্যেশ্বর হও বাবা!

রাখাল আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—মা, আমার দিদিমা রইল। তোমরা দেখো।

প্রসাদীর মাও চক্ষে অঞ্চল দিয়া বলিলেন—তা দেখব বৈ কি বাবা। এ আর তোমার বলতে হবে কেন?

রাখাল কাঁদিতে কাঁদিতে একবার যেন কাহাকে দেখিবার আশায় চারিদিকে চকিতে চাহিয়া লইল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিচ্ছা-মন্থর পদে বাড়ীর দিকে চলিল।

রাখাল যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া সকল লজ্জা সঙ্কোচ দমন করিয়া বলিল—মা, পেসাদী কৈ?

মা করুণ দৃষ্টিতে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—ঐ ঘরে।

রাখাল সেইঘরে গিয়া ঢুকিতেই প্রসাদী দুই হাতে আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাখালও নীরবে

দাঁড়াইয়া কাঁদিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সদর দরজায় দুখানা গরুর গাড়ী আসিয়া লাগিল; বর ও বরযাত্রীরা রেল-ষ্টেসনে যাইবে। বরযাত্রী যাইবে ঘটক কেনারাম, বরকর্ত্তা বৃন্দাবন, প্রসাদীর বাবা মথুর, সয়া ভট্‌চাজ আর রাধু নাপিত।

কেনারাম প্রকাণ্ড ভুঁড়ির নীচে একটা চাদর বাঁধিয়াছে, পায়ে একজোড়া নূতন চটি দিয়া অনভ্যাসের জন্য পটাস পটাস শব্দ করিয়া পায়চারি করিতেছে, এবং ডাবা হুঁকায় লম্বা নল লাগাইয়া তামাটে ছাঁটা গোঁফের ভিতর দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে থাকিয়া থাকিয়া চেঁচাইতেছে—ওহে বৃন্দাবন, চটপট করহে, চটপট কর।

মাধবী বুকে পাথর বাঁধিয়া হাসিমুখে সমস্ত রান্নাবান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইলেন। তারপর শুষ্ক চোখে হাসি-মুখে রাখালকে বরবেশে সাজাইলেন। তারপর রাখালের হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে গেলেন।

গ্রামের মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো ভাঙ্গিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কেবল আসে নাই প্রসাদী। রাখাল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া নারাণদাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল—রাঙা-দিদিমা, আমি চল্লাম; আমার দিদিমা রইল দেখো।

এই কথা শুনিয়া ও রাখালের আকুল কান্না দেখিয়া কেহ

স্থির থাকিতে পারিল না। মাধবী রাখালকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাখাল এক এক পা যায় আর এক এক জনকে প্রণাম করে আর অশ্রুজালের ভিতর দিয়া করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে—আমি চল্লাম, তোমরা আমার দিদিমাকে দেখো!

গাড়ীর পাশে গিয়া রাখাল দিদিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বড় কান্নাটাই কাঁদিল। মাধবীর ত আজ সকল সুখ সকল সাধের বিসর্জ্জন। তাঁহার বুক সুদুঃসহ বেদনায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

"আর দেরী নয়, আর দেরী নয়, কনকাঞ্জলি সেরে রাখালকে গাড়ীতে উঠিয়ে দাও।"—চারিদিক হইতে তাগাদা আসিতে লাগিল।

নারাণদাসী আসিয়া রাখালের হাতে পূর্ণপাত্র দিল—থালা-ভরা চাল, তাহার উপর একটা সুপারি, একটা পান ও একটা টাকা। নারাণদাসী বলিল—ঠাকুরঝি, আঁচল পাত।

মাধবী ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—আমাকে আর কেন বৌ, তুমি নাও।

"তা কি হয় কখনো"—বলিয়া নারাণদাসী মাধবীর আঁচল জোর করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া মেলিয়া ধরিল। তারপর মাধবীকে বলিল—বল ঠাকুরঝি।

মাধবী কিছুতেই কথা আর বলিতে পারেনা না। অনেক কষ্টে কান্না সম্বরণ করিয়া যেই কথা বলিতে যান

অমনি কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এতক্ষণ যাহারা তাগাদা করিতেছিল তাহারাও মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে অস্ফুটস্বরে শুধু বলিতেছিল—রাধাকান্ত! রাধাকান্ত!

অনেক কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া মাধবী বলিলেন—রাখাল, কোথায় যাচ্ছিস ভাই?

রাখাল নারাণদাসীর শিক্ষা-মত অস্ফুটস্বরে বলিল—দিদিমা, তোমার দাসী আনতে!

এই কথা নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া সকলেরই কানে ঠেকিল। রাখালের মনে বাজিল। রাখাল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া মুখ ঘুরাইয়া পূর্ণপাত্রটি দিদিমার আঁচলে ফেলিয়া দিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। মাধবী ছুটিয়া বাড়ীতে আসিয়া দাওয়ার উপর উবুড় হইয়া পড়িলেন।

গাড়ী ব্যথিত আর্ত্তনাদে গ্রামের রাস্তা ধ্বনিত করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। পাড়ার লোকে যে যার ঘরে ফিরিয়া গেল। নারাণদাসী বাড়ীতে আসিয়া বলিল—ঠাকুরঝি, উঠে এস, হেঁসেল তোলোসে।

মাধবী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—সকল দুঃখ বুকে বেঁধে যার মুখ চেয়ে তোমার সংসারে খাটতাম বৌ, আজ তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি! আর আমি পারব না! বৌ! একসন্ধ্যে দুটি খেতে দিতে হয় দিও, নয়ত এখানেই পড়ে পড়ে মরে যাব।—এই ঘরে ষোল বচ্ছর আমার রাখাল ছিল! আজ নেই!

(৯)

বিহারের সীমানার ধারেই পাহাড়পুর পরগণার জমিদার রাজা ধনেশ্বর চৌধুরী। তাঁহারা বাঙালী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের চালচলন বাঙালী অপেক্ষা বিহারীদেরই অধিকতর অনুরূপ। এই পরিবারে রাখাল বিবাহ করিয়াছে।

আজন্মের অভ্যস্ত পরিবেষ্টন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু লোকগুলাই যদি অপরিচিত হইত এবং তাহাদের আচার ব্যবহার যদি রাখালের পরিচিত হইত, তাহা হইলে সে সহজেই লোকগুলির সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে হয়ত মিশিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু কিছুই এখানকার তাহার জানা নয় বলিয়া সে প্রতি-পদে টোক্কর খাইয়া খাইয়া কিছুতেই কাহারও সহিত সহজে চলিতে পারিতেছিল না।

সে জন্মিয়া বড় হইয়াছিল কুঁড়ে ঘরে; এখানে এই প্রকাণ্ড নয় মহল বাড়ীর অরণ্যের মধ্যে তাহাকে আরব্য-উপন্যাসের কোন্ দৈত্য রাতারাতি আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া গেল? সে আজন্ম যে ভাষা তাহার চারিদিকে শুনিয়া আসিয়াছে, যে ভাষায় সে ষোল সতর বৎসর কথা কহিয়া অভ্যস্ত, সে ভাষা এখানকার লোকেরা বলে না, সে ভাষা ইহারা বুঝে না। সে আজন্ম বৈষ্ণব গোস্বামীর ঘরে মানুষ, সে-বাড়ীতে কাটা বলিতে নাই, বলিতে হয় বনানো.

ঝোল বলিতে নাই, বলিতে হয় রসা; আর ইহারা বামা-চারী শাক্ত, এ বাড়ীতে বিবিধ পশুপক্ষীর প্রাণহনন ও মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি নিত্য দুবেলা চলিতেছে; দেখিয়া দেখিয়া রাখালের মনে হয় তাহার জন্মগ্রামখানি শান্ত অহিংসা-পরায়ণ মায়ের কোলের মতন ছিল, এ যেন তাহাকে কসাইখানায় আনিয়া বন্দী করিয়াছে। মদ্য তাহার কাছে অপেয় অগ্রাহ্য, কিন্তু মদ্য ইহাদের পূজার অঙ্গ। এখান-কার পুরুষেরা ঢিলা পাজামা ইজের চাপকান পরে, মাথায় পাগড়ী বাঁধে; আর স্ত্রীলোকেরা ঘাগরার মতন করিয়া কোঁচা দিয়া চুনট করিয়া চুনারি কাপড় পরে; অসঙ্কোচে সকলের সামনে বসিয়া বাঁধানো হুঁকায়, রূপা সোনার গড়গড়া ফরসীতে জরি-জড়ানো লম্বা শটকা নল লাগাইয়া গদিয়ান চালে তামাক খায়। উপকথার রাজপুত্র রাক্ষসের পুরীতে গিয়া যেমন বোধ করিয়াছিল, রাখালের তেমনি বোধ হয়,—চারিদিকের সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা প্রকাণ্ড বীভৎস অশুচি কাণ্ড।

বিবাহের কিছুদিন পরেই একদিন রাজা ধনেশ্বর ও তাঁহার রাণী জগদ্ধাত্রী দেবী পালঙ্কে সাটিনের গদির উপর কিংখাবের বড় বড় তাকিয়া ঠেসান দিয়া বড় বড় রূপার গুড়গুড়িতে তাওয়া-দেওয়া অম্বুরী তামাক খাইতেছিলেন; তাঁহাদের একমাত্র কন্যা মণিমালা কতকগুলি গুড়িয়া অর্থাৎ পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল; এমন সময় রাখাল

খালি পায়ে খালি গায়ে কোঁচার কাপড় কোমরে বাঁধিয়া সেই ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল। ধনেশ্বর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ডাকিলেন—এই চাষার বেটা, শুনে যাও।

রাখাল লজ্জিত স্মিতমুখে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার জামা জুতো নেই? তোষাখানার ছোট দেওয়ান দীনদয়ালকে বলগে জবু দর্জিকে ডেকে জামা চাপকান ইজের তোয়ের করিয়ে দেবে; আর ভাণ্ডার থেকে তোমার পায়ের মাপের চার জোড়া জুতো বার করে দেবে।

রাখাল বলিল—আমার জামা জুতো আছে, এখন আর চাইনে।

ধনেশ্বর বলিলেন—তোমার খানসামা কুকুরাকে বল তোমার বাক্স নিয়ে আসবে, আমি দেখব তোমার কি আছে না-আছে।

কুকুরা খানসামা সেই ভুট্টু গয়লাদের দেওয়া পটপটে টিনের তোরঙ্গটি আনিয়া ধনেশ্বরের সম্মুখে সন্তর্পণে রাখিল।

ধনেশ্বর ঠাট্টার স্বরে বলিলেন—বাঃ! বহুৎ খুবসুরৎ মজবুত বাক্স আছে! খোল্ ত কুকুরা, ওর মধ্যে কি আছে দেখি!

বাক্সর ডালা উদ্‌ঘাটিত হইতেই ধনেশ্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, রাণী জগদ্ধাত্রী মুখে অঞ্চল দিয়া খুলখুল খুলখুল শব্দ করিতে লাগিলেন, মণিমালা বালুচরী চেলীর

ঘোমটার ভিতর হইতে লজ্জিত স্মিতমুখে রাখালের দিকে একবার চুরি করিয়া চাহিয়া মাথা নত করিল, কুকুরা মুখ ফিরাইয়া একবার কাশিয়া হাসি দমন করিল, রাখাল মুখ লাল করিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর হাসিয়া হাসিয়া বাক্স হইতে এক-একটা জিনিষ তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং পরম বিস্ময়ের ভান করিয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন—বাঃ !......বাঃ ! ......তোফা !......

রাখালের চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার মতন হইতেছিল, কিন্তু সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সবলে আপনাকে সামলাইয়া রাখিল—এইসব হৃদয়হীন ধনগর্ব্বিত বর্ব্বরদের কাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া খাটো হওয়া কিছুতেই নয়।

রাখাল যথাসাধ্য ধীর স্বরে বলিল—দেখা ত হল, এখন রেখে দিন।

ধনেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—কুকুরা, ঘিসু খানসামাকে বল্ জামাইবাবুকে একটা কর্পূরকাঠের বাক্সয় করে কাপড় জামা জুতো ভাণ্ডার থেকে এনে দেবে। আর এ সব গন্ধুয়া মেথরকে ডেকে বকশিশ করে দিগে যা।

কুকুরা বাক্স তুলিতে যাইতেছিল। রাখাল সিংহের মতন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—খবরদার! এসব আমার দিদিমার দেওয়া, এসব আমার থাকবে।

তারপর রাখাল কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া

আপনি সেই বাক্সটি উঠাইয়া লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কুকুরা খানসামা পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল—জামাইবাবু, আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি......আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।—কিন্তু রাখাল সে কথা কানে না তুলিয়া একেবারে আপনার ঘরে আসিয়া তবে থামিল। মেঝেতে বাক্স নামাইয়া রাখাল একখানা কৌচের উপর বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ধনেশ্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—হাঁ জাত্-সাপের বাচ্চা বটে! মা মণি, তোমাকে একটু সমঝে চলতে হবে!

মণিমালা সলজ্জ স্মিতমুখখানি নত করিল।

ক্ষণেক পরেই ঘিসুখানসামা দুই হাতে দুটা বড় বড় বাক্স ঝুলাইয়া ও গুরুয়া ভাণ্ডারীর মাথায় একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক চাপাইয়া রাখালের ঘরে আনিয়া নামাইল। রাখাল তাড়াতাড়ি দুই হাতে চোখের জল একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল—সিন্দুকটি কর্পূরকাঠের, তিন-তলা; একতলায় অনেকগুলি কোঁচানো কাপড় ও চাদর গোলাপের রুঃ দিয়া সুগন্ধি করা; দ্বিতীয় তলায় বিবিধপ্রকারের জামা, মেরজাই, পিরাণ, রুমাল, তোয়ালে, গামছা; নীচের তলায়, চাপকান চোগা ইজের জোব্বা আচকান প্রভৃতি কত কি, চক্‌চকে ঝকঝকে, ভুরির,

রেশমের, যাহা কস্মিনকালেও রাখাল চক্ষে দেখে নাই, নামও শুনে নাই। একটা বাক্সর মধ্যে নানান আকারের পাগড়ী, আমামা, মুরেসা, টুপি, তাজ; অপরটিতে নানানপ্রকারের জুতা—জরির দিল্লিওয়াল, বিলাতী বুট, শু, চটি।

খানসামারা আলমারীতে দেরাজে বাক্সে আন্লায় তেপায়ায় টুলে চৌকীতে যেখানে যাহার স্থান একে একে সমস্ত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাখাল একটা কৌচের উপর আড়ষ্ট নির্বাক হইয়া বসিয়া বসিয়া দেখিল। দিদিমার ছেঁড়া তসরের জামাটুটি পাইয়া তাহার যে আনন্দ হইয়াছিল, তুষ্টু গয়লাদের দেওয়া ছোটো জিনিসগুলি পাইয়া তাহার যে উল্লাস হইয়াছিল, এই রাজ-সজ্জা পাইয়া তাহার তেমন কোনো খুসীর লক্ষণ দেখা পড়িল না।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া রাখাল উঠিল। পরণের কাপড়খানি ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া কাপড় পরিল। ছাড়া কাপড়খানি সযত্নে পাট করিয়া আপনার টিনের বাক্সটিতে ভরিয়া চাবি বন্ধ করিল। তারপর প্রকাণ্ড সিন্দুকটার নীচের তলার সমস্ত জিনিস টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া সেখানে টিনের বাক্সটি লুকাইয়া রাখিল। সিন্দুক বন্ধ করিতে করিতে সে এমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল যেন অতীত জীবনের সমস্ত স্নেহ

ভালবাসার স্মৃতিচিহ্নকে কবর দিয়া তাহার উপর মাটি চাপা দিতেছে। যে জিনিসগুলাকে টানিয়া বাহির করিয়াছিল, সেগুলাকে দেরাজে আলমারীতে চাপাইয়া রাখিয়া দিল।

রাখাল ফকিরে পোষাক ছাড়িয়া রাজবাড়ীর যোগ্য পোষাক পরিয়াছে দেখিয়া রাজারাণী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকায়দায় অভ্যস্ত চাকর দাসী পর্য্যন্ত সকলেই সুখী হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কেবল মণিমালা দেখিল তাহার স্বামীর বিষণ্ণ মুখ আরও বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে স্বামীর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কাঁধে হাত রাখিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার সে বাক্সটি কোথায় গেল?

রাখাল আহত সিংহের মতো উগ্র হইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া রূঢ় কর্কশ স্বরে বলিল—কেন? ফেলে দেবার হুকুম হবে নাকি?

মণিমালা কুণ্ঠিতকণ্ঠে সান্ত্বনা ও মিনতি ভরিয়া ধীরে ধীরে বলিল—ঐসব কাপড় জামা তুমি রাত্তিরে আমার কাছে পোরো।

রাখালের রূঢ় দৃষ্টি কোমল হইয়া গেল, মণিমালার ম্লান ব্যথিত মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে কোমল দৃষ্টি তরল হইয়া চোখের জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রাখালের মনে হইতে লাগিল প্রমদা হইলে এমনি করিয়াই বুঝি তাহাকে সান্ত্বনা দিত। তাহার আজন্মের সকল প্রিয়জনের প্রিয় স্থানের

যে নিদারুণ বিচ্ছেদ-বেদনা তাহার মনের মধ্যে জমা হইয়া দুর্যোগ পাকাইতেছিল তাহা কোনো দিন হয়ত কাহারও রূঢ় আঘাতে বিষম ঝড়ে ভাঙিয়া চুরিয়া বাহির হইত, তাহা আজ এই কিশোরীর স্নেহকোমল শীতলস্পর্শে জল হইয়া গলিয়া পড়িল; সে জুড়াইল, বিশ্বসংসার বাঁচিয়া গেল। মণিমালা স্বামীর মাথাটি বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাথার কোঁকড়া চুলগুলির মধ্যে আঙুল বুলাইতে লাগিল। এতটুকু মেয়েকে এতখানি যত্ন করিতে কে শিখাইল? "আজ রাখালের মনে প্রসাদীর পাশে মণিমালা একটুখানি জায়গা করিয়া লইল।"

রাখালকে শান্ত করিয়া মণিমালা বলিল—তুমি যাও, একটু বাইরে বেড়িয়ে এস; রাতদিন ঘরের মধ্যে বসে থেকে থেকে তোমার আরো মন খারাপ হচ্ছে।

রাখাল কাতর দৃষ্টিতে মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—আমি কোথায় যাব মণি? আমার কি কোথাও যাবার জো আছে, না যেয়ে সোয়াস্তি আছে? ঘর থেকে বেরিয়ে সাত দেউড়ি পার হয়ে যদি বা খোলা জায়গায় পৌঁছাতে পারি তবু কি নিশ্চিন্ত হবার জো আছে? আমাকে দেখলেই লোকে তটস্থ হয়ে ওঠে; দুধারি লোকেদের কোমর নুয়ে পড়ে, সেলাম, প্রণাম, নমস্কার কুড়ুতে কুড়ুতে আমার মন হাঁপিয়ে ওঠে; যারা আমার সমবয়সী তারাও মুখ কাচুমাচু

করে দাঁড়ায়, পালাতে পারলে বাঁচে! আমাকেও তোমাদের মর্য্যাদার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়! এখানে আমি জামাইবাবু, আমি মানুষ নই! আর আমার দিদিমার কাছে যখন থাকতাম তখন আমার কোনো বাধাই ছিল না;—কুঁড়ে ঘরখানিতে শুয়ে শুয়ে ছেঁড়া খড়ের ফাঁক দিয়ে তারার চোখ মটকানি দেখতে পেতাম, চাঁদের হাসি আমার মুখে এসে পড়ত, মেঘের হাসি-কান্নার খবর আমি ঘরে বসেই পেতাম; ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেই ব্রজ এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, খোলা মাঠের মধ্যে খোলা প্রাণ নিয়ে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে জুটে আমরা যা খুসী তাই করে বেড়াতাম। সেখানে এক প্রধান অবলম্বন ছিল লেখাপড়া, এখানে এসে ত সে পাঠ তুলেই দিয়েছি।

মণিমালা বলিল—তুমি একবার বাবাকে বল না কেন? এখানেও ত ফিরিঙ্গিবাজারে স্কুল আছে।

রাখাল বলিল—হ্যাঁ, বলব ঠিক করেছি।

মণিমালা স্বামীকে একটু অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত করিবার জন্য বলিল—তাই যাও, কাছারীতে বাবা গেছেন, বাবাকে বলগে।

(১১)

পাহাড়পুরের রাজবাড়ীর একেবারে সদরে কাছারী-বাড়ী—তাহার দুধারে দুটি খুব বড় পুকুর, পুকুর-পাড়েই দুটি ফুলের বাগান বিচিত্র কেয়ারীতে ফোয়ারাতে সজ্জি-

ঘরে সজ্জিত। কাছারী-বাড়ীর ঘরে ঘরে জমানবিশ সেহানবিশ তৌজিনবিশ মহাফেজ খাজাঞ্চি ও তাহাদের কর্ম্মচারীরা কেহ ঠিক দিতেছে, কেহ কানে কলম গুঁজিয়া নথি উল্টাইতেছে, কেহ সমাগত প্রজার উপর তম্বি করিতেছে;—মহারাজ কাছারীতে আসিয়াছেন, সকলেই আপনাদিগকে কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া বহু প্রজা আসিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে একএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল করিয়া বলির পশুর মতন সভয়ে অপেক্ষা করিতেছে।

রাজা ধনেশ্বর কাছারীর দরবারঘরে মসলন্দের উপর কিংখাবের তাকিয়া ঠেসান দিয়া সোনার গুড়গুড়িতে জরির শটকা নল লাগাইয়া মৃগনাভি-গন্ধী অম্বুরী তামাক খাইতেছেন; পারিষদ দেওয়ান মোসাহেব মৌলভী মুন্সী মুসলমানী দরবারী কায়দায় হাঁটু মুড়িয়া বীরাসনে তটস্থ হইয়া সম্মুখে বসিয়া আছে; পেশকার একে একে জরুরী আরজী দাখিল করিতেছে। দ্বারে দ্বারে আসা-বরদার দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে; মহারাজের ঠিক পশ্চাতে দুজন রক্ষী তরোয়াল খুলিয়া সটান দাঁড়াইয়া আছে; দুই পাশে দুজন উর্দ্দিপরা আরদালি হুকুম অনুসারে কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এমন সময় সমস্ত দরবারের ছন্দ যতি ভঙ্গ করিয়া রাখাল কাছারীতে গিয়া বিনা ভূমিকায় ধনেশ্বরকে বলিল—আমি

এবার এণ্ট্রান্স এগজামিন দেবো; আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিন।

ধনেশ্বর এ কথার কিছুমাত্র মূল্য আছে মনে না করিয়া বলিলেন—তোমার আর পড়ার দরকার কি? তোমায় ত আর চাকরী করে খেতে হবে না? তুমি এখন মণিমায়ের কাছে-কাছেই থাকবে।

রাখাল গোঁ ধরিয়া বলিল—আমি পড়ব।

তাহার মনে পড়িয়া গেল ভুতো ও তেতো তাহাকে বলিয়াছিল—

ঘর-জামায়ের আদর কতক্ষণ?
না, তার বৌ-মনিবটি যতক্ষণ।

তারপর মনে পড়িল তাহার দিদিমার কথা, যে, যদি বৌ মরিয়াই যায় তবে সে লেখাপড়া শিখিলে আপনার উপায় আপনি করিয়া লইতে পারিবে। তাই সে জোর করিয়া গোঁ ধরিয়া বলিল—আমি পড়ব।

ধনেশ্বরও জোর দিয়া বলিলেন—না, তোমায় পড়তে হবে না। অনর্থক পণ্ডশ্রম!

রাখালের চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, দিদিমা যে বলিয়াছিলেন রাজার বাড়ী বিবাহ হইলে তাহার পড়ার স্থবিধা হইবে, এই কি সেই স্থবিধা! সে যে কত যত্নে প্রাণপণে লেখাপড়া করিত, তাহার সব বন্ধ! যে ভুতো নেনে তেতো ফটকেকে সে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা

করিত, এখন সে তাহাই হইয়া তাহাদেরই দলের একজন হইয়া উঠিবে! সে কি এখন ক্রীতদাসেরও অধম! মণি-মালার সে কেনা গোলাম মাত্র!

রাখালের চোখে জল পড়িতেছে দেখিয়া ধনেশ্বর বলিলেন—আচ্ছা একগুঁয়ে ছেলে ত তুমি! কি কথায় কেঁদে জিতবে! আচ্ছা, নিতান্তই যদি পড়তে চাও ত ফার্সী পড়বে; ইংরিজি নয়, ইংরিজি পড়লে লোকে খিষ্টান হয়ে যায়।......মুন্সি নওলকিশোর, আজ থেকে আপনি রাখালকে পড়াবেন।

মুন্সি নওলকিশোর "যো হুকুম হজুর" বলিয়া সামনে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। পাছে এও বন্ধ হইয়া যায় এই ভয়ে ও মন্দের ভালো হইল মনে করিয়া রাখাল আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না; এই অধিক বয়সে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া একটা নূতন ভাষা আয়ত্ত করিতে সে দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গেল।

(১২)

অনেক বেলা পর্য্যন্ত পড়িয়া স্নান করিবার জন্য রাখাল অন্দর মহলে আসিতেই রাণী জগদ্ধাত্রী একটু কড়া হুকুমের স্বরে বলিলেন—রাখাল, আমাদের বাড়ীতে এগারটার সময় খাওয়া-দাওয়া নিবড়ে যায়; তুমি রোজ রোজ এত বেলা করলে ত চলবে না; কে তোমার জন্যে হেঁসেল কোলে করে বসে থাকবে? রাজা কখন খেয়ে কাছারী চলে

গেছেন, তোমার আর আসাই হয় না। যাও চট করে নেয়ে নিয়ে এসে খেতে বস।

তারপর জগদ্ধাত্রী অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—ঘুঁটে কুড়ুনির ছেলে হঠাৎ নবাব!

কথাটা রাখালের কানে পৌঁছিল।

রাখাল আসিয়া অবধি বাড়ীতেই তোলা জলে নাহিত। আজ সে গামছা কাঁধে ফেলিয়া পুকুরে নাহিতে চলিয়া গেল। বাড়ীর সকলে অবাক আকাট! রাজার জামাই যে-সে লোকের মতন পুকুরে নাহিতে গেল! তৎক্ষণাৎ সাতটা খানসামা কেহ বা রাখালের সঙ্গে, কেহ বা মহারাজকে খবর দিতে ছুটিল।

পুকুরে ঘণ্টাখানেক সাঁতার কাটিয়া মনের সমস্তখানি গরম ঠাণ্ডা করিয়া রাখাল যখন স্নান শেষ করিয়া উঠিল তখন দেখিল পুকুরপাড় দিয়া দুজন পাইক একজন প্রজাকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া আসিতেছে এবং সে কাঁদিয়া মিনতি করিয়া প্রতি পদে পিছাইয়া যাইতে চাহিতেছে। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—এই, কি হয়েছে?

সেই প্রজাটি হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি জামাইবাবুর পাখা টানতাম। আমার ছেলের ওলাউঠা হয়েছে; ছোট দেওয়ানজীর কাছে ছুটি চাইলাম, দেওয়ানজী ছুটি দিলে না; আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। তাই এরা আমায় মারতে মারতে ধরে নিয়ে এসেছে।

আমার ছেলে ত আজকেই মরে যাবে ; আমি কাল এসে কাজে হাজির হতাম।

রাখালকে কে যেন চাবুক মারিল। তাহার মনে হইল বিলাসিতা এমনিতর হৃদয়হীন বর্ব্বরতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ! বাবুয়ানির মূল্য এত কঠিন, এমন মর্ম্মান্তিক ! সে আরামে রাজভোগে উদর পূর্ণ করিয়া কোমল শয্যায় শুইয়া হাওয়া খায়, আর এই বেচারা অনাহারে বা স্বল্পাহারে দারুণ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অথবা রাত্রিতে জাগিয়া বসিয়া তাহার সুখের জন্য ভারী পাখা ক্রমাগত টানিতে থাকে ! তাহার সুখের জন্য বেচারার নিজের দুঃখ অসুবিধার দিকে তাকাইবারও অধিকার নাই। ছেলে মরিয়া গেলেও উহাকে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া না থামিয়া ক্রমাগত অবিরাম পাখা টানিতে হইবে, নতুবা জামাইবাবুর একটু গরম বোধ হইতে পারে !

রাখাল মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমিই সেই জামাইবাবু ! আমি তোমাকে ছুটি দিলাম ; তুমি বাড়ী যাও !

সে লোকটি কাঁদিয়া রাখালের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল ; দুই-পা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে ধুইয়া দিতে লাগিল। পাইক দুজন শুষ্কমুখে বলিল—দেওয়ানজীকে কি বলব ?

রাখাল সেই লোকটিকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইয়া

পাইকদের বলিল—বোলো, জামাইবাবু ছুটি দিয়েছেন; আজ থেকে জামাইবাবু টানাপাখার হাওয়া আর খাবেন না!

পাইক দুজন ভয়ে ভয়ে বলিল—এর কাছ থেকে আমাদের খোরাকী এখনো আদায় করা হয়নি।

রাখাল বলিল—বিকেলে আমি যখন বেড়াতে বেরুব, তখন আমার সঙ্গে দেখা কোরো, তোমাদের খোরাকী আমি দেবো!

পাইকরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর পাখা-টানা লোকটি, পাছে পাইকেরা আবার ধরে এই ভাবিয়াই হউক অথবা মরণাপন্ন পুত্রের পার্শ্বে শীঘ্র পৌঁছিবার জন্যই হউক, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। রাখাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীতে ফিরিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া রাখাল দেখিল রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন। রাখাল কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভাত খাইয়া আপনার ঘরে গেল।

কুকুরা খানসামা পানের ডিবে আনিয়া মার্ব্বেল পাথরের টেবিলের উপর রাখিল। রাখাল দেখিয়া বলিল—তোকে রোজ পান আনতে বারণ করি, তবু পান আনিস কেন? আমি কি পান খাই?

কুকুরা বলিল—আমি কি করব বলুন, রাণীমার হুকুম। রাণীমা বলেন, তামাক খাবে না, পানও খাবে না? যা পান নিয়ে যা।

রাখাল একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কুকুরা, টানা-পাখার দড়িটা খুলে ফেল ত ?

কুকুরা কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না ; অবাক হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রাখালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রাখাল বলিল—আমি আর টানা-পাখার হাওয়া খাব না, তুই দড়ি খুলে ফেল।

কুকুরা সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—হাওয়া না হলে দিদিমণির যে ঘুম হবে না !

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল—তোদের দিদিমণির ঘুম না হয়, দিদিমণি অন্য ঘরে শোবে ; কিন্তু আমার ঘরে আর পাখা চলবে না।

তবুও কুকুরা নড়েনা দেখিয়া রাখাল কড়া স্বরে বলিল —খোল্ দড়ি।

কুকুরা বলিল—আমি মহারাজের হুকুম না হলে খুলতে পারব না।

রাখালের ধৈর্য্যের অতিরিক্ত হইল। সে নিজেই তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া দেরাজ হইতে বড় একটা ছোরা বাহির করিল, এবং হিড়হিড় করিয়া মার্ব্বেল পাথরের টেবিলটা ঘরের মাঝখানে টানিয়া আনিয়া তাহার উপর লাফাইয়া উঠিয়া কড়ি হইতে যে দড়িতে টানাপাখা টাঙানো ছিল একবারে সেই দড়িগুলি কাটিয়া ফেলিতে লাগিল।

টানাপাখার দড়ি কাটা হইলে মেঝেতে পড়িয়া গিয়া টানা-পাখা ত ভাঙিবেই, সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের আরো অনেক আসবাব-পত্র ভাঙিবে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কুকুরা আসিয়া টানাপাখা-টাকে ধরিল এবং দড়ি কাটা হইলে আস্তে আস্তে ঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া অবাক আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ ঘর হইতে চলিয়া গেল।

(১৩)

খানিকক্ষণ পরেই মিস্থ খানসামা আসিয়া রাখালকে সংবাদ দিল মহারাজ তাহাকে ডাকিতেছেন।

রাখাল প্রস্তুত হইয়াই ছিল, তৎক্ষণাৎ মহারাজের খাস কামরায় খুব জোরে পা ফেলিয়া গিয়া প্রবেশ করিল।

রাজা ধনেশ্বর সাটিনের ঢিলা ইজের চাপকান পরিয়া কিংখাবের গদিতে বসিয়া সোনার গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন; মাথার উপর টানাপাখার সাটিনের টক-টকে লাল ঝালর বিচিত্র লীলায় দোল খাইতেছিল। রাণী জগদ্ধাত্রী তাঁহার স্থুল দেহখানিকে বেনারসী শাড়ীতে জড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গে মোটা মোটা গহনা পরিয়া একখানি কৌচের উপর মুখ ভার করিয়া বসিয়া ছিলেন; তাঁহার পায়ের কাছে ঘরের মেঝের গালিচার উপর মণিমালা ঘোমটা টানিয়া বসিয়া মায়ের পায়ের গুর্জ্জরীপঞ্চমের ঘুঙুরগুলিকে আঙুল দিয়া তাড়না করিয়া করিয়া বাজাইতে-ছিল।

রাখাল ঘরে আসিয়া রাজা ও রাণীর মধ্যে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই চুপচাপ। ক্ষণেক পরে ধনেশ্বর বলিলেন—রাখাল, তোমার ব্যাপার কি? এ সব কি আরম্ভ করেছ?

রাখাল মাথা উঁচু করিয়া কহিল—কি করছি?

—আজকাল রোজ তোমার খেতে দেরী হচ্ছে; তোমার একার জন্যে বাড়ীর সকলের অসুবিধা হয় জানো।

—আমার এই-রকম দেরীই হবে; আমার খাবার ঢেকে রেখে সকলকে খেয়ে নিতে আমি কতদিন বলেছি।

—না, ওরকম একগুঁয়েমি এখানে চলবে না; তোমাকে ঠিক সময়ে এসে খেতে হবে; সময়ে খেয়ে-দেয়ে তোমার যা খুসী তুমি কোরো।...

রাখালকে কোনো উত্তর করিবার অবসর না দিয়াই ধনেশ্বর বলিতে লাগিলেন—তোমার যা খুসী তাই করাটা কিন্তু বড্ড বেড়ে উঠেছে। আজকে ঘরের পাখা কেটে ফেলেছ কেন?

রাখাল দৃঢ় স্বরে বলিল—আমার ঘরে পাখার দরকার নেই বলে।

—তোমার ঘর? ও ত আমার ঘর! তোমাকে থাকতে দিয়েছি। ঘরের আসবাবপত্তর যেমন আছে তেমনি থাকবে, তুমি শুধু ব্যবহার করবে; তুমি ব্যবস্থা উল্‌টে দেবার

কে? তোমার টানা-পাখার হাওয়া খাওয়া অভ্যাস ছিল না, তোমার চলতে পারে; কিন্তু মণিমায়ের তো চলবে না।

রাখাল বলিল—না চলে, মণির ঘর মণিরই থাক। আমাকে যদি এখানে রাখতে হয় তা হলে আমাকে এমন একটা ঘর দিন যে ঘরের মালিক হব আমিই।

ধনেশ্বর অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঐ প্রসঙ্গ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—রোজ রোজ তুমি নাকি কাশী মাষ্টারের বাড়ী যাও?

—হাঁ যাই।

—আর যাবে না। সে আমার প্রজা; ফিরিঙ্গিগঞ্জের ইস্কুলের ইংরেজি-পড়াবার মাষ্টার, বৈ ত নয়; তার বাড়ীতে তুমি আমার জামাই হয়ে যাও কোন্ আক্কেলে? ওতে আমার অপমান হয়, জানো?

—না, তা জানতাম না। আমি কাশীবাবুর কাছে পড়তে যেতাম। আপনার অপমান হয় জানলে যেতাম না।

ধনেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আচ্ছা আমি কাশী মাষ্টারকে ডেকে বলে দেবো সে যতদিন বাড়ীতে থাকবে রোজ তোমাকে তোষাখানায় এসে পড়িয়ে যাবে।

যে কাজ রাখাল লুকাইয়া লুকাইয়া করিতেছিল, তাহা প্রকাশ্যে করিবার অনুমতি ও সুযোগ পাইয়া রাখালের মন খুসী হইয়া গেল।

রাখালের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ধনেশ্বরও প্রীত হইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—যাও, আর পাগলামি কোরো না। মনে রেখো তুমি রাজার জামাই, রাজ-কায়দায় চলতে হবে।......মা মণি, এই পাগলটাকে চটপট একটু শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম করে নিস।—বলিয়া ধনেশ্বর হাসিতে লাগিলেন। রাণী জগদ্ধাত্রীও ঠোঁট চাপিয়া হাসি ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন। মণিমালার মাথা মায়ের পায়ের উপর অত্যন্ত নত হইয়া পড়িল। রাখাল ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

(১৪)

রাখালকে বিদায় দিয়া মাধবী শয্যা লইয়াছেন। কোনো দিন বা উঠিয়া একবার ভাতে বসেন, কোনো দিন বা অমনিই যায়। রাখাল যে-বালিশটি মাথায় দিয়া ভাঙা তক্তপোষের উপর ছেঁড়া কাঁথার যে দিকটিতে শুইত, মাধবী সেই দিকটিতে সেই বালিশটি বুকে করিয়া পড়িয়া থাকেন—সেই বিছানা বালিশে তাঁহার রাখালের গায়ের গন্ধ আজও যে লাগিয়া আছে। রাখাল "তোমরা আমার দিদিমাকে দেখো" বলিয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রসাদী ব্রজ ও তাহাদের মা প্রত্যহ আসিয়া মাধবীকে জোর করিয়া তুলিয়া তেল মাখাইয়া নাওয়াইয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দিয়া খাওয়াইয়া যাইত; প্রায়ই নিজেদের বাড়ী হইতে কিছু-না-কিছু খাবার করিয়া আনিত

একদিন নারাণদাসী নথ ঘুরাইয়া জনান্তিকে বলিল—মায়ের চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান! নাতি ত আর মরে নি, তবে অত শোকের ধ্যান কেন? আর বলিহারি যাই পাড়ার লোকদের যারা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে আসে! পাড়া বয়ে আত্তি জানাতে আসা, তার মানে, লোককে জানানো বাড়ীর লোকে কেউ কিচ্ছু করে না, ভাগ্যিস যাই আমরা ছিলাম!

ইহার পর প্রসাদীদের মাধবীর যত্ন করা দুষ্কর হইয়া উঠিল এবং মাধবীর দুঃখ দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল।

একদিন খুব ঘটা করিয়া তিলক-সেবা করিয়া ভাত জল খাইয়া ভুঁড়িটি ফুলাইয়া বৃন্দাবন রকে বসিয়া তামাক খাইতেছেন; নাকে সূক্ষ্ম রসকলি কাটিয়া নারাণদাসী পাশে বসিয়া পান সাজিতেছে; এমন সময়ে অঘোর পিয়ন আসিয়া একখানা মনিঅর্ডার দিল—এক শত টাকার। রাখাল পাঠাইয়াছে; পঞ্চাশ টাকা গোসাঁই-দাদাকে লইতে লিখিয়াছে এবং বাকী পঞ্চাশ টাকা ব্রত-নিয়ম করিবার জন্য দিদিমাকে দিতে লিখিয়াছে। বৃন্দাবন সই করিয়া টাকা লইয়া নারাণদাসীর দিকে আটখানি নোট বাড়াইয়া ধরিয়া স্নেহ-গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন—দাসু, তুলে রাখ গে।

নারাণদাসী চুন-খয়েরের হাত গামছায় চট করিয়া মুছিয়া নোট কখানি বৃন্দাবনের হাত হইতে লইল। গুণিতে

গণিতে বলিল—এত টাকা কে পাঠালে ? জামগাঁয়ের নন্দীরা বুঝি ? ও টাকা যে বাইরে রাখলে, অত টাকা কি হবে ?

বৃন্দাবন তাহার কোনো জবাব না দিয়া ডাকিলেন—মাধবী, রাখালের চিঠি এসেছে। রাখাল টাকা পাঠিয়েছে।

ইহা শুনিয়াই নারাণদাসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে গিয়া নোট কখানি বাক্সর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া আসিয়া আবার একাগ্র মনে পান সাজিতে বসিল।

বৃন্দাবনের ডাক শুনিয়া মাধবী দারুণ দুঃখের উপর আনন্দের হাসি মাখাইয়া ধুকিতে ধুকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন—রাখাল আমার চিঠি দিয়েছে! ভালো আছে দাদা ? রাখালের নিজের হাতের লেখা ত ? কই দেখি দাদা, একবার দেখি। হ্যাঁ রাখালের নিজের হাতের লেখা! কি লিখেছে দাদা একবার পড় ত! কত টাকা পাঠিয়েছে ? রাখাল আমার রাজরাজেশ্বর হয়েছে!

মাধবীর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। চোখ দিয়া দরদরধারে জল পড়িতেছিল।

বৃন্দাবন মনিঅর্ডারের কুপনে লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠিটুকু পড়িয়া শুনাইলেন; কেবল পঞ্চাশ টাকার স্থানে পড়িলেন কুড়ি টাকা এবং রাখাল তাঁহাকে যে কিছু দিয়াছে সে কথার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

মাধবী নোট দুখানি হাতে করিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদিগকে চুম্বন করিলেন—সে চুম্বন যেন তাঁহার রাখালকেই। এ টাকা ত রাখালেরই স্নেহের নিদর্শন। নোট দুখানিকে ঠোঁটে ঠেকাইয়া বুকে চাপিয়া ক্ষণেক কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া মাধবী বলিলেন—এত টাকা নিয়ে আমি করব কি? বৌ একখানা নিক, আমি একখানা নি।—এই বলিয়া একখানি নোট নারাণদাসীর দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—এই নাও বৌ, আমিও যেমন, রাখালের তুমিও তেমনি!

নারাণদাসী কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাধবীর হাত হইতে নোটখানি লইয়া ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া ছোট্ট করিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিল।

মাধবী বৃন্দাবনকে বলিলেন—দাদা, রাখালের চিঠিটা আমাকে দাও, আমি সকলকে দেখাব। ও চিঠি ত নয়, আমার বুকের নিধি!

বৃন্দাবন গম্ভীর হইয়া বলিলেন—রাখালকে টাকা পাওয়ার খবর দিতে হবে। চিঠিতে রাখালের ঠিকানা আছে। চিঠি এখন আমার কাছে থাক। নইলে রাখাল ভাববে যে।

মাধবী তাড়াতাড়ি বলিলেন—না না, দাদা, রাখাল আমার যেন না ভাবে, তুমি আজই চিঠি লিখে দাও। ও চিঠি তোমার কাছেই থাক এখন, চিঠি-লেখা হলে আমায় দিয়ো।

রাখাল যাওয়ার এতদিন পরে আজ মাধবী পাড়ায় বাহির হইলেন। সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া জানাইতে লাগিলেন—তাঁহার রাখাল রাজ্যেশ্বর হইয়া তাহার দিদিমাকে দু-দুখানা নোট পাঠাইয়া দিয়াছে!

মাধবী বাড়ী হইতে বাহির হইতেই বৃন্দাবন মনিঅর্ডারের কুপনখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

(১৫)

রাখাল যে মনিঅর্ডার করিয়াছিল তাহার রসিদ ফিরিয়া আসিল। রাজার খাস চিঠির সঙ্গে সে রসিদও রাজার কাছে কাছারীতে বিলি হইল। ধনেশ্বর মনিঅর্ডারের রসিদ দেখিয়াই ডাক-ঘণ্টার চাবি টিপিলেন; ঘণ্টা কিড়িং-কিড়িং করিয়া উঠিল।

চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর বলিলেন—জামাই-বাবুকে ডাক।

চাপরাসী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

রাখাল আসিয়া দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর মনিঅর্ডারের রসিদখানা রাখালের সামনে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—এ কি?

—মনিঅর্ডারের রসিদ।

—তা আমি জানি। আমি বলছি কি, দাদামশায়কে টাকা পাঠানো হয়েছিল কেন? পিছটান আছে যার এমন জামাই ত আমি চাইনি। টাকা পেলে কোথায়?

—আমার হাতখরচের জন্যে যে টাকা দেওয়া হয় তাই আমি পাঠিয়েছি।

—সে টাকা ত তোমাকে দেওয়া হয়েছিল; তোমার দাদামশায়কে ত দেওয়া হয়নি।

—আমাকে খরচ করতে দেওয়া হয়েছিল; আমি এই রকমে খরচ করেছি।

—এ রকম করে তুমি সে টাকা খরচ করতে পারবে না। আমি চাইনা যে এ বাড়ীর সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার যোগ থাকে।

রাখাল দৃপ্তস্বরে বলিল—যে যোগ জন্ম দিয়ে ভগবান করে দিয়েছিলেন সে যোগ মানুষের হুকুমে ত আর বন্ধ হবে না। তবে যে-টাকায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার নেই সে টাকা পাঠিয়ে আমার আপনার লোক কাউকে আমি আর অপমান করব না; আর সে রকম টাকাও আমার চাইনে।—বলিয়া রাখাল শ্বশুরের আর কোনো কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

আবার ডাক-ঘণ্টার চাবিতে মোচড় পড়িল, আবার ঘণ্টা ডাকিল, চাপরাসী আসিয়া যথারীতি সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

ধনেশ্বর বলিলেন—ডাকমুন্সিকে তলব কর।

কিছুক্ষণ পরে পোষ্টমাষ্টার বেচারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া প্রণাম করিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

রাজার হুকুম হইল, জামাই-বাবুর নামের চিঠিপত্র যা-কিছু আসিবে তাহার সমস্তই যেন তাঁহাকে না দেখাইয়া জামাইবাবুকে বিলি করা না হয়; এবং জামাইবাবুও যে-সমস্ত চিঠিপত্র ডাকে দিবে তাহা যেন ডাকে রওনা করিবার আগে তাঁহাকে দেখাইয়া লওয়া হয়।

পোষ্টমাষ্টার "যে আজ্ঞে" বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া পলায়ন করিল।

রাজা-শ্বশুরের এ হুকুম রাখালের অজানা রহিল না। রাখাল চিঠিপত্র লেখা একেবারে বন্ধ করিল।

খাজাঞ্চি মহারাজকে এত্তেলা করিয়া রাখিল—জামাই-বাবু হাতখরচের তন্‌খা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

রাজা খানিকক্ষণ ভাবিয়া হুকুম লিখিলেন—সে টাকাটা মণি-মায়ের তন্‌খার সামিল করিয়া মণি-মায়ের কাছে যেন দেওয়া হয়।

ধনেশ্বর কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবুর-বেটার রাগ হয়েছে; তন্‌খার টাকা নেওয়া হয়নি; তোমার কাছে সেই টাকা আসবে; ওর দরকার-মত ওকে দিও।

মণিমালা মাথা নত করিয়া শুনিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৬)

মণিমালা নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল রাখাল দুই হাতের মধ্যে মাথা ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

মণিমালা ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাহার স্বামীর হাত দুখানি দুই হাতে ধরিয়া মাথা হইতে নামাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। সে হাসির প্রতিবিম্ব রাখালের মুখে পড়িল না। দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মণিমালার হাসিমুখও ম্লান হইয়া উঠিল। সে স্বামীর মাথাটি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কথায় আদর ঢালিয়া বলিল—লক্ষ্মী আমার, বাবা-মা'র কথায় রাগ কোরো না! বাবা-মা বুঝতে পারছেন না যে তোমার হাত পা বেঁধে আমার পায়ের কাছে এনে ফেললেই তুমি অমনি আমার আপনার হয়ে যাবে না। এতে তোমার মন আমার ওপর বিষ হয়ে উঠছে। ঘিসু খানসামা একদিন বলছিল 'যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ!' আমার হয়েছে তাই। জোর করে ভালো বাসাতে গিয়ে বাবা মা আমারই কপালে ভালো করে আগুন ধরিয়ে তুলছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে তোমার যাতে মনে ব্যথা লাগছে সেটা আমাকেও কতখানি বাজছে, আমাকে সেটা কতখানি অপমান করছে। আমি ত বাবা-মাকে এসব কথা বলতে পারি না, আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাচ্ছি, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না। মা-বাবার কথা তুমি গায়ে মেখো না।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া মণিমালার সমস্ত কথা শুনিল। তারপর আস্তে আস্তে বাঁ হাতে তাহাকে বেষ্টন

করিয়া ধরিয়া রাখাল স্নেহমুগ্ধ স্বরে বলিল—তোমার জন্যেই আমি এ বাড়ীতে এখনো টিকে আছি মণি। কতদিন মনে হয়েছে ছুটে পালিয়ে গিয়ে আমাদের সেই কুঁড়েঘর-খানিতে দিদিমার কোলের মধ্যে আশ্রয় নি। কিন্তু পেরে উঠিনা শুধু তোমার জন্যে।

মণিমালা ব্যথিত হইয়া সহানুভূতিভরা স্বরে বলিল—কিন্তু গোসাঁইগঞ্জেও ত তুমি সুখে ছিলে না বল।

—সেখানেও সুখে ছিলাম না মণি। সেখানকার দানও এমনি অহঙ্কারে ভরা, এমনি তাচ্ছিল্যের ; সেখান-কার ব্যবহারও এমনি কঠোর। তবে কি জানো, সেখানকার জিনিসে একটা জন্মগত অধিকার ছিল। তাই সে জায়গাটা এর চেয়ে কতক সহ্য হয়। এখানে আমার কিসের অধিকার মণি ?

মণিমালা লজ্জিত স্মিতমুখ নত করিয়া বলিল—আমি যে তোমার, সেই অধিকার।

রাখাল মণিমালাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল। সুখাবেশে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তুমিই আমার, এ-বাড়ীর আর কিছু আমার নয়।

মণিমালা বলিল—আমি যদি তোমার তবে আমার যা-কিছু তোমারই ত।

রাখাল আর কিছু কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

স্বামীকে একটুখানি প্রফুল্ল করিয়া তুলিবার জন্য

মণিমালা বলিল—আমি গাড়ী আনতে বলি, চল একটু বেড়িয়ে আসি। চল পিসিমাদের বাড়ী যাই।

রাখাল শুনিয়াছিল তাহার পিস্‌শ্বশুর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাঁহার দেশ হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার পৈতৃক বাসগ্রাম বাণেশ্বরপুর গোসাঁইগঞ্জের পার্শ্ববর্ত্তী। তাঁহার কাছে গোসাঁইগঞ্জের, বিশেষ করিয়া দিদিমার, খবর পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া রাখাল সহজেই যাইতে রাজি হইল। বলিল—তোমার সঙ্গে বন্ধ গাড়ীতে যাওয়া বড় কষ্টকর; তুমি গাড়ীতে চল; আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ায় যাব।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—বন্ধ গাড়ীতে যেতে তোমাদের কষ্ট হয়; আমাদের কিচ্ছু কষ্ট হয় না, না?

রাখালও হাসিল, বলিল—তুমিও তাহলে ঘোড়ায় চল।

—ঘোড়া কেন, খোলা গাড়ীতে ত যেতে পারি।

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—তুমি কেবলমাত্র আমার স্ত্রী হলে নিয়ে যেতাম। কিন্তু তুমি যে আগে রাজার মেয়ে। রাজবাড়ীর আব্রু নষ্ট করবার সাহস আমার আর নেই।

মণিমালা দেখিল আবার অপ্রিয় প্রসঙ্গ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য ডাকিল—ইচ্ছা-নানি, এগে ইচ্ছা-নানি।

বৃদ্ধা দাসী ইচ্ছা আসিয়া বলিল—কেনে গে মায়ো?

—দেউড়িতে জমাদারকে বলে আয়, আমার জন্যে একটা গাড়ী, আর জামাইবাবুর ঘোড়া তোয়ের করে নিয়ে আসুক, আমরা বাঁশতলীতে পিসিমার বাড়ী যাব।

পাহাড়পুর হইতে মাইল-দুই দূরে বাঁশতলী মৌজা। বিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই তালুক যৌতুক পাইয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে পাহাড়পুর রাজবাড়ী ছাড়িয়া নিজের তালুকে নিজের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছেন।

মণিমালা গাড়ীতে চড়িল; ইচ্ছাদাসী সঙ্গে চলিল; একজন আরদালি গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিল। রাখাল ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে একবার মণি-মালার জানলার কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল—আমি রাজকুমারীর তুরুকসোয়ার।

মণিমালা ভ্রূ শানাইয়া শাসাইয়া হাসিয়া বলিল—চল না বাড়ী, মজা দেখাব।

এমনি আনন্দে তাহারা পথ চলিতেছে। পাহাড়ে-দেশের খোলা মাঠের বুকের উপর দিয়া বাঁধা লাল রাস্তা—যেন সিঁদুর-পরা সিঁথির মতো চলিয়া গিয়া দূর দিগন্তে মিশিয়াছে। সন্ধ্যা হব-হব; চারিদিকের লালের উপর অস্তসূর্য্যের লাল আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আজ যেন ধরণীর কুশণ্ডিকা, তাহার বর সূর্য্য তাহার লজ্জারক্ত মুখ-খানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার সীমন্তে সিন্দূর দান করিতেছে। প্রান্তরের মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে দূরে দূরে দুএকটা

গাছ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; মাঝে মাঝে সারি বাঁধিয়া পাখী উড়িয়া আসিয়া তাহাদের পত্রকুঞ্জে রাত্রির আশ্রয় খুঁজিয়া লইতেছে। মাঝে মাঝে রাখালেরা গরু মহিষ তাড়াইয়া লইয়া, হাটুরে লোকেরা হাটের বেসাতি ঘোড়া-গোরুর পিঠে চাপাইয়া বা মাথায় বহিয়া লইয়া সেই পথ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছে; মজুরেরা সমস্ত দিনের পর ঝুড়ি কোদাল বাশ কুড়ুল কাঁধে করিয়া আসিতেছে যাইতেছে। রাখাল ও মণিমালা মনের আনন্দে সেই সব দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল; মণিমালার হুকুমে গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। এমন সময় একজন ভিক্ষুক তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়িতে দৌড়িতে রাখালের কাছে একটি পয়সা চাহিতে লাগিল। রাখাল ব্যথিত অভিমানের স্বরে মণি-মালাকে শুনাইয়া ভিক্ষুককে বলিল—আমার এক পয়সাও সম্বল নেই, ভাই; থাকলে দিতাম।

ভিক্ষুক বলিল—আপনি ত রাজা, আপনার হাত ঝাড়লে আমাদের পর্ব্বত।

রাখাল বলিল—আমার পোষাক পরিচ্ছদ রাজার মতন দেখতে বটে কারণ আমি রাজকন্যার বর। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ভাই, আসলে আমি তোমার চেয়েও গরীব। তোমার নিজের বলতে একটা কুঁড়ে কি একটা গাছতলাও আছে, আমার তাও নেই।

ভিক্ষুক এ-কথার কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্রমাগত

কাকুতি মিনতি করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল; আরদালি ধমকাইল; কোচমান চাবুক উঁচাইল; তবু সে নিবৃত্ত হইল না।

মণিমালা উহাকে কিছু দিবে কি না ঠিক করিতে পারিতেছিল না; দিলে যদি তাহার স্বামী নিজেকে অপমানিত মনে করে। কিন্তু ভিক্ষুকটা কিছুতেই যায় না দেখিয়া সে গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক দিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল। সে কুড়াইয়া লইয়া হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

মণিমালার মন ম্লান হইয়া রহিল। স্বামীকে যে সে কিছুতেই সুখী করিতে পারিতেছে না সেই বেদনা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

বাঁশতলীতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা হইলে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—পিসেমশায়, আপনি ত বাড়ী গিয়েছিলেন, আমাদের গোসাঁইগঞ্জের খবর জানেন কি?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হ্যাঁ জানি বৈ কি। আমি ত রোজই প্রায় বৃন্দাবন জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তোমার দিদিমা বোধ হয় আর বাঁচেন না। আহা বুড়ি 'হা-রাখাল জো-রাখাল' করে একেবারে শয্যে নিয়েছে; তোমার মাথার বালিশটিকে অষ্টপ্রহর বুকে করে থাকে, বলে এতে আমার রাখালের গায়ের গন্ধ লেগে আছে!

রাখালের চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে

লাগিল। ক্ষণেক পরে বলিয়া উঠিল—দিদিমার দুঃখ ঘুচবে বলে রাজার বাড়ীতে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর সকল দুঃখ ঘুচিয়েছি! মরবার সময় সেবা করা দূরে থাক, একবার দেখ্‌তেও পাব না! চিঠি লিখে খবর নেবারও হুকুম নেই!

রাখালের চোখ দিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিল। কিন্তু তখনও সে বর্ষা কালের গিরিশিখরের ন্যায় স্তব্ধ গম্ভীর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মাধবী-পিসির সেবা যত্নের ত্রুটি হচ্ছে না, মথুরের স্ত্রী আর মেয়ে প্রসাদী দুজনে খুব সেবা করছে। কিন্তু চিকিৎসা পথ্য ঠিক হচ্ছে না। এ সময় তুমি যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও ত ভালো হয়।

রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—টাকা! টাকা কোথায় পাব পিসেমশায়! আমার নিজের এক পয়সা নেই! দুঃখ ঘুচবে বলে দিদিমা আমার এখানে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরের ধনে পোদ্দারী করবার অতিলোভের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের এখন করতে হবেই।

শ্রীকৃষ্ণ রাখালের কথার মানে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মণিমালার মুখের দিকে চাহিলেন। মণিমালা ঘোমটার ভিতর হইতে দুটি অশ্রুপ্লাবিত চোখ তুলিয়া পিসে-মহাশয়ের জিজ্ঞাসার নীরব উত্তর দিল।

রাখাল ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ের আর-সব খবর কি? প্রসাদীর বিয়ে হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আহা! প্রসাদীর বড় দুর্ভাগ্য বিয়ের পরই বিধবা হয়েছে। ব্রজটিও মারা গেছে। এইসব শোক পেয়ে মথুর কেমন জবুথবু হয়ে গেছে, সেও আর বেশীদিন বাঁচবে না।

রাখাল জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কথায় জোর দিয়া বলিল—এ সমস্তই আমাকে সুখী করবার ফল!

মণিমালা যেজন্য পিসিমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল তাহার বিপরীত ফল হইল দেখিয়া সে বিরক্ত ও ক্ষুন্ন হইল। সে রাখালকে লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়াই রাখাল তাহার নিজের টিনের তোরঙ্গটি সিন্দুক হইতে বাহির করিল। তাহার মধ্য হইতে দিদিমার পরণের তসর-কাটা জামা দুটি বাহির করিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। তাহার দিদিমা তাহার জন্য মরিতে বসিয়াছেন; সে নিজে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া আছে, আর অর্থাভাবে তাহার দিদিমার ঔষধ পথ্য জুটিতেছে না; তাহার জন্য প্রসাদী বিধবা হইয়াছে; সে বাঁচিয়া থাকিয়াও প্রসাদীর পিতামাতাকে বুঝাইতে পারিতেছে না যে ব্রজ মরিয়াছে তবু তাঁহারা অপুত্রক হন নাই; একবারে এতগুলো দারুণ দুঃখের আঘাত রাখালের চিত্ত বিমথিত করিয়া ফেলিতেছিল।

মণিমালা দেরাজ খুলিয়া পাঁচশত টাকা বাহির করিয়া রাখালের সামনে রাখিয়া তাহার পিঠের উপর স্নেহের

ও মমতার স্রোতে বেণুশাখার মতো লতাইয়া পড়িয়া বলিল—এই টাকা দিদিমাকে পাঠিয়ে দাও, লিখে দাও চিকিৎসার কোনো ত্রুটি যেন না হয়।

রাখাল জোর দিয়া বলিল—ও টাকা আমি নিতে পারব না।

মণিমালা দুহাতে স্বামীর পা ধরিয়া বলিল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কথা শোনো। এ টাকা তোমার।... আমার টাকাও ত তুমি নিতে পার।...টাকা না নাও আমার গহনা নাও, সেই শুদ্ধু ত বাবা আমায় তোমাকে দান করেছেন।...

এই বলিয়া মণিমালা উঠিয়া গিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া রাখালের পায়ের কাছে গহনাগুলি ঢালিয়া দিয়া দাঁড়াইল। বলিতে লাগিল—আমি মেয়েমানুষ, কেমন করে টাকা পাঠাতে হয় আমি জানিনে; নইলে আমিই পাঠিয়ে দিতাম। তুমি আমার হয়ে পাঠিয়ে দাও!

মণিমালার কাতর সহৃদয়তা দেখিয়া রাখালের জেদ খুব নরম হইয়া আসিয়াছিল; দিদিমার শেষ অবস্থায় তাঁহাকে একটুও সুখী করিতে পারার সুযোগ ফস্কাইতে না দিবারও প্রলোভন খুবই হইতেছিল। কিন্তু রাখাল হতাশ হইয়া বলিল—টাকা নিলেই বা কি হবে মণি; টাকা পাঠাবার উপায় নেই। আমার চিঠিপত্র পাঠানো পোষ্ট-আপিসে বারণ আছে।

মণিমালা একটু ভাবিয়া বলিল—তবে এই টাকা নিয়ে তুমি নিজে গোসাঁইগঞ্জে চলে যাও।

রাখাল বিস্মিত হইয়া মণিমালার মুখের দিকে তাকাইল। মণিমালার মুখ হইতে সে এই কথা শুনিয়াছে তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

রাখালও এতক্ষণ এই কথাই ভাবিতেছিল—সে কি কোনো রকমে এই কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পারে না? তাহার বিষম বন্ধন মণিমালা। পলাইয়া যাওয়া মানে এবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক উচ্ছেদ। কিন্তু মণিমালাকে ত্যাগ করিবে সে কি বলিয়া, কেমন করিয়া?

যাহার জন্য রাখালের দ্বিধা সেই মণিমালাই প্রস্তাব করিতেছে তাহার যাইবার কথা! রাখাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তারপর?

মণিমালা সহজ ভাবেই বলিতে লাগিল—তুমি চলে গেলে বাবা খুব রাগ করবেন। কিন্তু সে রাগ আর ক'দিন থাকবে? যদি শিগগির রাগ না পড়ে, তিনি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারবেন না।

রাখাল উৎফুল্ল হইয়াও হতাশভাবে বলিল—এখান থেকে রেল-ষ্টেসন অনেক দূর, আমি এতখানি পথ যাব কেমন করে? রাজার ভয়ে ত কোনো গরুর-গাড়ী আমায় নিয়ে যেতে চাইবে না।

মণিমালা ক্ষণকাল চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল—

আপাতত চুপিচুপি টাকাগুলো নিয়ে গিয়ে পিসে-মশায়কে দিয়ে এসো। তিনি গোসাঁইগঞ্জে পাঠিয়ে দেবেন। এদিকে আমি তোমার যাবার জোগাড় দেখছি।

রাখাল শূন্যদৃষ্টিতে মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল—চুরি! শেষকালে চুরি করতে হবে মণি! দাও টাকা, দিদিমার জন্যে আমি চুরিও করব!

রাখাল আবার কাঁদিতে লাগিল। তারপর সে টাকার তোড়াটি জামার তলে কোমরে বেশ করিয়া লুকাইয়া বাঁধিয়া লইয়া আবার ঘোড়ায় চড়িয়া বাঁশতলীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

(১৭)

মাধবী রাখালকে বিদায় দিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যে রাখাল যে "কুড়ি" টাকা পাঠাইয়াছিল সেই সূত্রে রাখালের সুখ কল্পনা করিয়া ও তাহার নিজের হাতের লেখায় তাহার কুশল-সংবাদ পাইয়া তিনি আবার বুকে বল করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যে উত্তেজনা তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার আর পুনরাবৃত্তি না হওয়াতে মাধবী আবার ভাঙিয়া পড়িয়াছেন এবং উত্তেজনার পর অবসাদ দ্বিগুণ হইয়াছে। তাঁহার এতদিনকার দুঃখ-শোকে-ক্লিষ্ট দেহ অনাহারে চিন্তায়

একেবারে জীর্ণ হইয়াই ছিল; এখন রোজ ঘুষঘুষে জ্বর হয়। এক-একদিন জ্বর প্রবল হইয়া উঠে। সেদিন আর জ্ঞান থাকে না। সঙ্গে-সঙ্গে কাসি আছে, তাহাতে বুকে পিঠে বেদনা হইয়াছে। ডাকের সময় হইলে নিত্য তিনি একবার জিজ্ঞাসা করেন, রাখালের চিঠি আসিল কি না। চিঠি আসে নাই শুনিয়া হতাশ হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকেন। ইহার উপর প্রসাদী বিধবা হওয়া অবধি তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণ হইয়াছে; তিনি থাকেন থাকেন কাঁদিয়া বলেন—আমার পাপেই এই দুধের বাছাকে দুঃখ সইতে হল; এমন সোনার প্রতিমার এমন দুর্দ্দশা চক্ষে দেখতে হল। কেন বৌমা তুমি তখন জোর করে জেদ করে আমার রাখালের সঙ্গে পেসাদীর বিয়ে দিলে না? তা হলে রাখাল আমার কাছেই থাকত, আর পেসাদীর ও এমন দশা হত না!

আজ মাধবীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটের হইয়া উঠিয়াছে; এই একটু জ্ঞান হইতেছে, এই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন। হাতপা নাড়িবারও আর শক্তি নাই; কথা জড়াইয়া অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে; ঘন ঘন জোরে জোরে শ্বাস বহিতেছে; মাঝে মাঝে হেঁচকিও উঠিতেছে। সকাল হইতে প্রসাদীরা মায়ে ঝিয়ে আসিয়া সেবা করিতেছে। মাঝে মাঝে নারাণদাসীও আসিয়া ঘরে এক-একবার উঁকি মারিয়া প্রশ্ন করিয়া অবস্থা জানিয়া

যাইতেছে। বৃন্দাবন ঘরের দাওয়ায় দুই হাতের মধ্যে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছেন আর দুই চোখের জলে তাঁহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। জন্মিয়া অবধি যে ভগিনী এক-দিনও বাড়ী ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীও যায় নাই, সেই ভগিনী আজ বুঝি একেবারেই যাইতেছে, এই মনে করিয়া ভাইএর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ মাধবী চোখ মেলিয়া শূন্য ঘোলাটে দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। প্রসাদীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—পিসিমা, কি খুঁজছ ?

মাধবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—রাখালকে।

প্রসাদী ও তাহার মাতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাঁহাদের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া মাধবী বলিলেন—ঐ দেখ বৌমা, আমার ভীমরতি ধরেছে ; আমি রাখালকে খুঁজছি। দাদাকে ডাক, জিজ্ঞেস করি রাখালের চিঠি এল কি না...

বৃন্দাবন আসিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে ও মুখে কথা নাই দেখিয়া মাধবীর নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—পেসাদী, রাখালের মাথার বালিশটা আমার বুকে দে ত ভাই...

প্রসাদী বালিশটি তুলিয়া আস্তে আস্তে বুকের উপর

রাখিয়া স্পর্শ মাত্র করাইয়া ধরিয়া রহিল, পাছে বালিশের চাপে স্বল্প-অবশিষ্ট শ্বাসটুকুও রুদ্ধ হইয়া যায়।

বালিশের স্পর্শ বুকে অনুভব করিয়া মাধবী বলিলেন—আঃ! রাখাল আমার সুখে আছে! আমি পোড়াকপালী শুধু-শুধু ভেবে মরি!

মাধবীর চোখ দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তারপর চোখ বুজিয়া আসিল। খুব ঘন ঘন হেঁচকি উঠিতে-উঠিতে হঠাৎ সকল স্পন্দন থামিয়া গেল।

প্রসাদী ও তাহার মা উচ্ছ্বাসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃন্দাবন কাঁদিতে কাঁদিতে দাওয়ায় আসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিলেন। নারাণদাসীও একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো ঠাকুরঝি গো, আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে গো! ওরে রাখাল, তুই ত মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে সব ভুলে রয়েছিস, এখানে যে মা-যশোদার মতন কেঁদে-কেঁদে তোর দিদিমার প্রাণ গেল রে, ওরে রাখাল!...

নারাণদাসীর চীৎকার শুনিয়া একে একে পাড়ার বহু পুরুষ ও স্ত্রী আসিয়া জুটিল। অকেজো ছেলের দল কোমরে গামছা বাঁধিয়া বাঁশ কাটিয়া মেচকো বাঁধিতে কাঠ ফাড়িতে লাগিয়া গেল; চার পাঁচ জনে ধরাধরি করিয়া মাধবীর দেহ বাহিরে আনিয়া তুলসী-তলায় শুয়াইয়া দিল; রাখালের বালিশটি তাঁহার বুক হইতে কেহ নামাইল না।

এমন সময় অঘোর পিয়ন পাঁচ-শত টাকার একখানি মনি-অর্ডার আনিয়া বৃন্দাবনকে দিল। শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইয়াছেন। চিঠিতে লিখিয়াছেন এ টাকা রাখাল তাহার দিদিমার চিকিৎসা পথ্যের জন্য দিয়াছে। বৃন্দাবন চিঠি আর মনি-অর্ডার হাতে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—সেইত চিঠি এল, আর একটু আগে এল না! মাধবী একবার জেনে যেতে পারলে না যে তার রাখাল তার জন্যে কত ব্যস্ত হয়েছে! এ টাকা আমি এখন নিয়ে আর করব কি? অঘোর, এ টাকা তুমি ফিরিয়ে দিয়ো।

নারাণদাসী দোয়াত কলম আনিয়া বৃন্দাবনের পাশে রাখিয়া আধ-ঘোমটার ভিতর হইতে ফিস-ফিস করিয়া বলিল—টাকা নিয়ে রাখ, শ্রাদ্ধে খরচ হবে।

সমবেত লোকেরা সেই কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ শ্রাদ্ধতে খরচ করলেই ত হবে। পরকালের পিণ্ডিটা রাখালের টাকা হতে পেলেও বুড়ীর কতকটা তৃপ্তি হবে। ও টাকা সই করে নিয়ে রাখ।...টাকা কি কখনো হাতছাড়া করে হে...

বৃন্দাবন মনিঅর্ডার সই করিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিলেন। নারাণদাসী টাকা গণিয়া লইয়া সিন্দুকে তুলিতে গেল। তখন মাধবীর শব কাঁধে তুলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—বল হরি হরিবোল!

রাখাল টাকা পাঠাইয়া দিয়া দিদিমার কাছে পলাইয়া

যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছে। যাইবার সুযোগ যতদিন না হইতেছিল ততদিন দিদিমার খবরের জন্য ব্যস্ত হইয়া রোজই সে বাঁশতলীতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যায়।

এতকাল পরে রাখালকে নিত্য পোষাক পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইতে দেখিয়া রাজা ধনেশ্বর মনে মনে খুব খুসী হইতেছিলেন—যাক! এতকাল পরে বন্য জামাইটা একটু পোষ মানিয়া সায়েস্তা হইয়া আসিতেছে।

রাখাল প্রত্যহ বেড়াইতে বাহির হয় দেখিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীও খুসী হইয়াছিলেন। যে জামাই পান-তামাক খায় না, একটু নেশা-ভাঙ করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে জানে না, তাহার সামনে পুরুষালি ধরণে তামাক টানিতে রাণী জগদ্ধাত্রীর নিতান্তই লজ্জা বোধ করিত, বাধবাধ ঠেকিত—তাঁহাকে তামাক, দোক্তা, সিদ্ধি প্রভৃতি নেশার দ্রব্য খাইতে দেখিলেই রাখাল যে-রকম নাক সিঁটকাইয়া মুখে অসন্তোষ ফুটাইয়া তুলিত তাহাতে তাহাকে সমীহ না করিয়া রাণী পারিতেন না; তাঁহাকে এখন জামাইএর ভয়ে লুকাইয়া চুরাইয়া নেশা করিতে হইত। এবং সেই জামাই এখন বেশীক্ষণ অন্দরে না থাকাতে রাণী জগদ্ধাত্রী বিশেষ আরাম অনুভব করিতেছিলেন।

চাকরদাসীরা পর্য্যন্ত খুসী হইয়াছিল, কারণ তাহারা

পাগলা জামাইবাবুর খেয়াল কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। যেদিন লুচির ব্যবস্থা হইয়াছে সেদিন সে বলিত ভাত খাইব, যেদিন ভাতের ব্যবস্থা হইত সেদিন সে বলিত লুচি খাইব; সে যেন সংসারের বাঁধা ব্যবস্থা উল্টা-পাল্টা করিয়া দিবার জন্যই আছে, তাহার খেয়ালের অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া চাকরদাসীদের পক্ষে ভার হইয়া উঠিয়াছিল। এবং তাহাতে যে রাজা-রাণীর মনও অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া উঠে নাই তাহা নহে।

মণিমালা একদিন রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, তুমি অমন কর কেন?

রাখাল হাসিয়া বলিল—আমি যে নিতান্ত পরাধীন দাস নই, আমারও যে একটু স্বাধীনতা আছে, তাই জানবার জন্যে নিজের চারিদিকে একটু একটু চিমটি কেটে দেখি!

মণিমালা ম্লানমুখে বলিল—আমি তা বুঝেছি; কিন্তু লোকে না বুঝে তোমায় পাগল, গোঁয়ার, কত কি বলে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—তা বলুকগে। তুমি আমাকে বুঝতে পারলেই হল।

মণিমালা বলিল—কিন্তু তাতে আমার যে বড় কষ্ট হয়। আমি কাউকে কিছু বলতেও পারি না, সইতেও পারি না।

রাখাল তেমনি হাসিয়া বলিল—আর বেশী দিন সইতে হবে না; তোমার বাবা মা আমাকে শিগগিরই দূর করে

দেবেন—তাঁদের কাছে আমি অসহ্য হয়ে উঠেছি। এমনি করলেই আমি এখান থেকে শিগগির যেতে পাব !

মণিমালার চোখ দিয়া মুক্তার মালা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রাখাল অপ্রস্তুত ও ব্যথিত হইয়া স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—ছি মণি, কাঁদছ ? তুমিই ত আমাকে যেতে বলেছ। তুমি কাঁদলে যে আমি দিদিমাকে দেখতে যেতে পারব না।

মণিমালা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল—না, আমি কাঁদব না। কিন্তু লোকে তোমায় তাড়িয়ে দেবে সে আমি দেখতে পারব না, তার আগে আমিই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু আমি যে তোমার যাবার কোনো ব্যবস্থাই করে উঠতে পারছিনে।

রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সবই আমার অদৃষ্ট মণি।

মণিমালার অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, কিন্তু সে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল—তুমি পিসে-মশায়কে গিয়ে বল, তিনি যদি কোনো রকমে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

রাখাল বাহিরে-বাহিরে বেড়ায় দেখিয়া বাড়ীর লোকে যে পরিমাণ আরাম বোধ করিতেছিল, মণিমালা ঠিক ততখানি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সকলের অগোচরে

পুষ্পপুটে কীটের মতো একটি কঠিন দুঃখ তাহার অন্তর জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু তাহাকে সকলের কাছে সেই বেদনা হাসি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইত এবং ইহাই তাহার আরো অসহ্য। তাহার দুঃখ, যে, তাহার স্বামী সুখী নয়; তাহার দুঃখ, যে, সে স্বামীর দুঃখ দূর করিতে পারিতেছে না! এ তাহার নিজের প্রতি ধিক্কারের দুঃখ, এ তাহার নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখ।

রাখাল যখন দিনের পর দিন দিদমার সংবাদ বা পলায়নের উপায় না পাইয়া নিরাশ হইয়া শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখন তাহার প্রাণ যে কি তীব্র বেদনায় পীড়িত হইতেছে, তাহা বাড়ীর কেহ বুঝে না, মণিমালা বুঝে। সে বুঝে বলিয়া তাহার কষ্ট; বাড়ীর আর-কেহ বুঝে না বলিয়া তাহার কষ্ট! সে-ই ত তাহার স্বামীর বন্ধন, সে-ই তাহার স্বামীর বন্দীশালার পায়ের বেড়ি! সে আপনাকে শত টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া স্বামীকে মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু সে যে তাহার স্বামীকে বড় ভালো বাসে! স্বামীও যে শুধু তাহারই মুখ চাহিয়া এই বন্দীদশার দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন—নহিলে তিনি ত বীর, তিনি অনায়াসে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল যখন হতাশ ভাবে বলে—মণি, আজও কোনো

খবর পেলাম না; হয়ত আমার দিদিমা বেঁচে নেই!—
তখন মণিমালা সান্ত্বনার কোনো কথা খুঁজিয়া পায় না,
ছলছল চোখে সমবেদনা ভরিয়া শুধু তাহার মুখের দিকে
চাহিয়া থাকে।

তারপর রাখাল যখন অতি গোপন লুকানো স্থান
হইতে অতি সন্তর্পণে অতি-লজ্জার অতি-আদরের ধন
টিনের তোরঙ্গটি বাহির করিয়া তাহার দিদিমার পরণের
পুরানো ছেঁড়া তসরের জামা দুটিকে একবার মাথায় রাখে
একবার বুকে মুখে চাপিয়া ধরে, তখন মণিমালার বুক
ফাটিয়া যাইবার মতন হয়।

(১৯)

একদিন ধনেশ্বর ডাকে-আসা চিঠির মধ্যে রাখালের
নামে এক চিঠি দেখিলেন। দ্বিধামাত্র না করিয়া তাহা
খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন—বৃন্দাবন গোসাঁই রাখালকে
খবর দিয়াছেন, তাহার দিদিমা মারা গিয়াছেন, তাহার
প্রেরিত পাঁচ শত টাকায় তাঁহার শ্রাদ্ধ হইবে।

রাখাল যে তাঁহাকে ঠকাইয়া আবার ধূর্ত্তামি করিয়া
শ্রীকৃষ্ণের মারফতে তাহার দিদিমাকে টাকা পাঠাইয়াছিল
তাহাতে ধনেশ্বরের মন রাখাল ও শ্রীকৃষ্ণের উপর অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই তাঁহার সে রাগ পড়িয়া
গেল এই ভাবিয়া, যে, গর্ব্বিত রাখালের পরাজয় হইয়াছে
—সে তনখার টাকা লইবে না বলিয়াছিল, তাহাকে তাহা

লইতে হইয়াছে ; এবং তাহার একটা যে পিছটানের কারণ ছিল সেটা একেবারে দূর হইয়াছে—এখন দিদিমার মৃত্যুর পর রাখাল নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইয়া থাকিবে।

রাজা ধনেশ্বর খুসী হইয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান খিদ্ খানসামাকে রাখালকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

রাখাল আসিয়া দাঁড়াইল। ধনেশ্বর হাসিতে হাসিতে তাহার হাতে চিঠি দিলেন।

তাহার নামের চিঠি, খোলা ; দেখিয়াই রাখালের ত আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, তাহার উপর শ্বশুরের মুখে একটা ক্রূর নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি! রাখাল চিঠি পড়িয়া খুব জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—যাক, এতদিনে ভাবনা ঘুচল! দিদিমা রাজার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দুঃখ ঘুচবে বলে ; এতদিনে ঘুচল!

রাখাল মাথা ঘুরাইয়া সিংহের কেশরের মতো বড় বড় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি ফুলাইয়া দুলাইয়া দৃপ্ত ভাবে জোর করিয়া পা ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ধনেশ্বর অবাক হইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া রহিলেন, তিনি তাঁহার জামাইকে বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না।

রাখাল নিজের ঘরে গিয়া টান মারিয়া জামা জুতো ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—

মণি, সব ভাবনা ঘুচে গেল, দিদিমার আমার সকল দুঃখ ঘুচেছে !—

এইবার তাহার রুদ্ধ ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া তাহাকে তোলপাড় করিতে লাগিল। মণিমালা তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিয়া তাহারই মতন কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে ভয়ে, পাছে তাহার কান্না কেহ দেখিতে পায়—ঘরজামায়ে স্বামীর কোনো আত্মীয়ের জন্য রাজ-কন্যার যে কাঁদিতে নাই! তাহার কান্না স্বামীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতেও পারে চাই কি!

রাখাল পড়িয়া-পড়িয়া কাঁদিতেছে, কুকুরা খানসামা আসিয়া ডাকিল—জামাই-বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে।

রাখাল কোনো উত্তর দিল না। কুকুরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল—জামাই-বাবু, মহারাজ আপনার জন্যে বসে আছেন, খেতে চলুন।

রাখালের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কুকুরা চলিয়া গেল।

ঘিসু খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল মহারাজ ডাকিতে-ছেন। রাখাল তাহাকেও কোনো জবাব দিল না। মহারাজের ডাক অমান্য হইয়া ফিরিয়া যায় আজ এই নূতন দেখিয়া এবং জামাইবাবুর বুকের পাটা দেখিয়া বাড়ীর চাকরদাসীরা স্তম্ভিত হইয়া সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল—না জানি এই পাগলাটার কপালে কি দুর্গতি আছে।

মণিমালা ভয়ে এতটুকু হইয়া মিনতি করিয়া বলিল—লক্ষ্মীটি ওঠ, খেতে চল ; অনেক রাত হল…

রাখাল রুদ্ধ স্বরে বলিল—আজ আর আমি কিছু খাব না মণি। আমার অশৌচ হয়েছে ; কাল স্নান করে হবিষ্যি রেঁধে খাব।

—তবে তাই মাকে বলিগে ?—বলিয়া মণিমালা তাড়াতাড়ি রাজরোষ শান্ত করিতে চলিয়া গেল।

রাণী জগদ্ধাত্রী সর্ব্বাঙ্গের গহনায় আর চেলীর কাপড়ে মহা কলরব তুলিয়া হনহন করিয়া রাখালের ঘরে আসিয়া তীব্র কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—রাখাল, তোমার যে দেখছি সব অনাছিষ্টি, সকল বাড়াবাড়ি। দিদিমা মরলে আবার অশুচ হয় নাকি ? দিদিমা হলগে ভিন্ন গোত্তর !…ওঠ, খাবে এস। মহরাজ এসে আসনে বসে রয়েছেন।

রাখাল চোখ মুছিয়া বলিল—মা, আমাকে মাপ করুন, আমি আজ আর খেতে পারব না। দিদিমা যে গোত্রেরই হোন, আমি জানি তিনি আমার বড় আপনার, আমার মায়ের মা, তাঁর অশৌচ আমাকে নিতেই হবে।

রাণী জগদ্ধাত্রী হনহন করিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন—তখনি বলেছিলাম মহারাজকে যে দক্ষিণদেশী ছেলের সঙ্গে মণির বিয়ে দিয়ো না ; তা ত শুনলেন না ; এখন ভুগুন। জ্বালাতন ! মণির কপালে এত দুঃখও ছিল !

যাহা কখনো কেহ দেখে নাই আজ তাহাও হইল। রাজা ধনেশ্বর স্বয়ং ডাকিতে আসিলেন। রাখাল মিনতি করিয়া তাঁহার আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করিল। রাজরোষ উগ্র হইয়া উঠিল; কিন্তু হুকুমে লোককে পীড়ন করা চলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কাজ করানো যায় না। সমস্ত বাড়ীভরা লোকের মাঝে আজ রাজা ধনেশ্বর হুকুম করিয়া বিফল অমান্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন! বাড়ীর সকল লোক ভয়ে আকাট, বাড়ীতে টুঁ শব্দটি নাই, আজ না জানি কার কপালে কি আছে, কোথাকার রাগ না জানি কাহার উপর গিয়া পড়িবে এই ভয়ে সকলে তটস্থ আড়ষ্ট!

রাখাল সারা রাত্রি মেঝের গালিচার উপরই পড়িয়া রহিল, বিছানায় শুইল না; কাজেকাজেই মণিমালাকেও সেইরূপই করিতে হইল। রাখালের ভাগ্য ভালো যে রাজকন্যাকে কুটকুটে কম্বলের উপর শোয়াইয়া রাখার অপরাধটা তাহাদের স্বামীস্ত্রীর গোপনমন্দিরে আড়ি পাতিয়া দেখিয়া গিয়া কেহ রাজ-দরবারে নালিশ রুজু করে নাই।

প্রভাতে উঠিয়া রাখাল খালি পায়ে, খালি গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়াইয়া বাহিরে মুন্সিজীর কাছে পড়িতে চলিল, দেখিয়া ত সকলে অবাক! রাজার জামাইএর এ কী ফকিরী বেশ!

রাণী জগদ্ধাত্রী দেখিয়া রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

আচ্ছা রাখাল, তুমি পাগল না কি? এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু অসহ্য বাপু।

রাখাল একবার শুধু তাঁহার দিকে তাকাইল, কিছু বলিল না, যেমন যাইতেছিল তেমনি যাইতে লাগিল।

জগদ্ধাত্রী আবার ডাকিয়া বলিলেন—আজ খাবে দাবে কি না বলে যাও।

রাখাল বলিল—আমি নেয়ে এসে নিজে হবিষ্যি রেঁধে খাব।

জগদ্ধাত্রী তীব্র ঝাঁঝের সহিত বলিয়া উঠিলেন—না না, ওসব পাগলামি কোরো না বলছি।···বরজহাটির দিদির ত নিরামিষ রান্না হয়ই, সেই সঙ্গে খেয়ো না হয়।

রাখাল বিনীতভাবে জোর দিয়া বলিল—আমি হবিষ্যিই করব মা।

রাখাল চলিয়া গেল। জগদ্ধাত্রী বকিতে লাগিলেন—ভালো এক জ্বালাতন হয়েছে বাপু! কড়ির বিষ!—ফেলবারও জো নেই, গেলবারও জো নেই!

অমনি বরজহাটির দিদি ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আহা! রাজার মেয়ে মণি! তার কপালে এত দুঃখুও ছিল! মোমের পুতুল আগুন-আঁচে পড়েছে! আহা বাছারে!

অমনি সকলের সমবেদনা-ভরা করুণ দৃষ্টি মণিমালার মুখের উপরে পড়িল। চারিদিকের এই 'আহা'র জ্বালায়

মণিমালা অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার দুঃখটা যে কি তাহা সে নিজে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

অনেক বেলায় রাখাল একেবারে স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিল। রাজার জামাই স্নান করিয়া আসিল — কিন্তু না গামছা লইয়া গিয়াছিল, আর না তেল মাখিয়াছিল—ইহা দেখিয়া ত সকলের চক্ষু স্থির। কিন্তু কেহ কোনো কথা বলিল না। কেবল ঘরে আসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মণিমালা বলিল—এত বেলা করে এলে?

রাখাল বিমর্ষমুখে বলিল—এক বেলাই ত খাব, তাই একটু বেলা পড়িয়েই এলাম।

মণিমালা মিনতি করিয়া বলিল—তুমি হুকুম কর আমি হবিষ্যি রেঁধে দি।

রাখাল স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে নিষেধ করিয়া বলিল—না মণি, তোমার কষ্ট হবে। তোমার অভ্যেস নেই, আমার অভ্যেস আছে; সেখানে দিদিমার অসুখ হলে কতদিন আমাকে রাঁধতে হত।

মণিমালা বলিল—না, আমার কিছু কষ্ট হবে না; তুমি বস, আমি চট করে রেঁধে নিয়ে আসছি।

খাওয়ার পর রাঁধিয়া দিলে সে রান্নায় হবিষ্য হয় না; রাখাল ভাবিয়া পাইতেছিল না এই রূঢ় কথাটা মণিমালাকে সে কেমন করিয়া বলিবে যে তুমি খাইয়াছ, তোমার হাতের রান্নায় আমার হবিষ্য হইবে না। সে ইতস্তত করিতেছে।

এমন সময় ইচ্ছা ঝি আসিয়া কড়া স্বরে বলিল—নাতিন-জামাই, তোমার কেমন আক্কেল, খেতে-দেতে হবে না? বাড়ীর সকলের খাওয়া হয়ে গেল, শুধু তোমার জন্যে এই দুধের ছেলে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত ঠায় উপোষ করে রয়েছে!

রাখাল মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার সুন্দর টুলটুলে মুখখানি রৌদ্রতাপে ফুলের মতন শুকাইয়া আমলিয়া পড়িয়াছে। সুখী ও ব্যথিত হইয়া রাখাল বলিল—তুমি এখনো খাওনি মণি!

মণিমালা ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল—তুমি এখনো খাওনি, আর আমি খেয়ে বসে থাকব! তোমার দিদিমা, আমার কি তিনি কেউ নন!

রাখালের মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল—তবে চল, আমরা দুজনে রাঁধিগে। স্বর্গ থেকে দেখে দিদিমা আজ সুখী হবেন।

রাখালের বিবাহের গাঁটছড়া ক্রমশই কঠিন করিয়া কষিয়া বাঁধা হইতেছিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না যে তাহার জন্য মণিমালাকে কতখানি বেদনা নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইতেছে।

আজ মণিমালা খায় নাই বলিয়া মায়ের কাছে তাহাকে কত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। রাণী জগদ্ধাত্রী হুকুম করিয়া, ধমকাইয়া, মিনতি করিয়া, আদর করিয়া, কিছু-

তেই যখন তাহাকে খাওয়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি রাজার কাছে নালিশ করিলেন। রাজা গম্ভীর হইয়া মুখ দারুণ অন্ধকার করিলেন, কিন্তু কন্যাকে কিছু বলিলেন না। মণিমালা বুঝিল যে তাহার পিতার দারুণ রাগ হইয়াছে, তাহা প্রকাশেরও অতীত। রাণীও রাগে গনগন করিতেছিলেন। ক্রোধ দুঃখ অভিমান মিশাইয়া তিনি বলিলেন—

ঘি দিয়ে মল
আর তেল দিয়ে ডল
কুকুরের ন্যাজ ব্যাঁকা
আর মোষের শিং ব্যাঁকা
কিন্তু যুঝবার বেলা একা!

মেয়ে কি কখনো আপন হয়? পেটে যদি একটা ছেলে ধরতাম ত সে কখনো আমার কথা ঠেলতে পারত না। কথায় বলে—বাপ পিতামর নাম গেল, হিদে জোলার নাতি!—মণির হয়েছে তাই।

মণিমালা মা-বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে শুধু চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কঠিন মন ভিজিল না।

মা রাগ করিয়া খাইয়া-দাইয়া ঘরে গিয়া শুইলেন; রাজারাণীর হুকুমে বাড়ীর চাকর দাসী সকলের খাওয়া হইয়া গেল; কেহ আর খোঁজ লইল না রাজকন্যার খাওয়ার কি হইবে বা রাজার জামাই কি খাইবে।

স্বামীর প্রতি মমতা জানাইতে গিয়া মণিমালা নিজের বাড়ীর সকলের যেন পর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বাপ-মায়ের সহিত তাহার আর কোনো সম্পর্ক নাই, তাহাকে দেখিলে তাঁহারা মুখ ঘুরাইয়া লন, কথা বলেন না, খুব হাসি-গল্পের মধ্যে তাহাকে দেখিলে তাঁহাদের মুখ অন্ধকার হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। সে যতই সকলের নিকট হইতে দূর হইতে লাগিল ততই সে স্বামীর নিকট হইতেছিল। তাহারা দুজনে পরমানন্দে সকলের উপেক্ষা উপেক্ষা করিয়া অশৌচের কয়দিন হবিষ্য রাঁধিয়া খাইল; তারপর দুজনে মিলিয়া দিদিমার শ্রাদ্ধের জোগাড় করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। এতদিনে তাহাদের যেন নিজের একটি স্বতন্ত্র সংসার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরের বাড়ীতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকা বড় বিশ্রী দেখায়। মণিমালার মাঝে-মাঝে মনে হইত একেবারে অন্যত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারিলে বেশ হইত। কিন্তু তাহার স্বামী একেবারে নিঃস্ব চাল-চুলা-হীন; তাহাকে দুঃখে ফেলা হইবে বলিয়া মণিমালা কোনো দিন তাহার মনের কথা মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলিতে পারিত না। রাজবাড়ীর কেহ আর তাহাকে ঘাঁটাইত না বলিয়া রাখাল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দেই ছিল; শ্বশুর-বাড়ীর পরাধীনতার গ্লানি তাহার আর বড় একটা মনে পড়িত না। তাহার দিনগুলা জলের মতন সহজেই আজকাল

গড়াইয়া চলিতেছিল। হঠাৎ সামনে আবার একটা বাধা পড়িয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল।

ইচ্ছা দাসী এক-মুখ হাসি লইয়া আসিয়া রাখালকে বলিল—নাতিন্-জামাই, নাতিন্ যে পোয়াতি! আমি খবর দিলাম, বকশিশ দাও।

রাখালের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া তখনি ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। রাখাল মণিমালার লজ্জানত স্মিত মুখের দিকে একবার চাহিয়া ইচ্ছাকে বলিল—ইচ্ছা-নানি, আমার এক কড়ারও সম্বল নেই, তোকে কি বকশিশ দেবো। জামা কাপড় মনে করছিস আমার? কিছু আমার না। হাতীর ঝুল, ঘোড়ার চারজামা, পেয়াদা-পাইকের উর্দ্দি যেমন তাদের নয়, রাজার ঐশ্বর্য্যের, তেমনি এ-সব রাজার জামাইএর উর্দ্দি, এ-সব আমার নিজের কিছু নয়।

ইচ্ছা দাসী রাখালের কথা কিছু বুঝিতে পারিল না। হাসিতে-হাসিতে বলিল—আচ্ছা দিও না, চললাম আমি মহারাজের কাছে, দুনা আদায় করতে......

ইচ্ছা দাসী চলিয়া গেল। মণিমালা স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—আবার দুষ্টুমি করছ!

রাখাল পরম প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—মণি, সত্যি?

মণিমালা স্বামীর কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল—যাও, আমি কিছু জানিনে।

মণিমালা জানে না। বলিল বলিয়াই রাখালের যাহা জানিবার তাহা আর অজানা রহিল না।

সকলের আগে খবর দিতে পারিলে প্রচুর বকশিশ পাইবে বলিয়া ইচ্ছা দাসী ছুটাছুটি রাণীর মহলে গেল। যে মণিকে সে হইতে দেখিয়াছে, যাহাকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার ছেলে হইবে; অতি পুরাতন দাসী ইচ্ছার আর আনন্দ ধরে না। রাজারাণীর এক সন্তান মণিমালার ছেলে হইবে শুনিয়া তাঁহাদেরও আনন্দের অবধি থাকিবে না। বকশিশটা প্রচুর লাভ হইবে। সে সেই বকশিশ দেখাইয়া বাড়ীতে এই খবর ছড়াইয়া দিয়া এই কয় দিনের নিঃঝুম নিরানন্দ বাড়ী আবার সরগরম করিয়া তুলিবে।

ইচ্ছা বুড়ি তাড়াতাড়ি গিয়া রাণীমাকে খবর দিল। রাণীমা মুখ অন্ধকার করিয়া সে ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ইচ্ছা মনে করিল রাণীমা বকশিশ আনিতে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ভাবিল—রাণীমার আসিতে বিলম্ব হইতেছে; বকশিশ পরে লইলেও চলিবে, যাই মহারাজকে গিয়া খবরটা দিয়া আসি।

মহারাজ সুসজ্জিত কক্ষে মখমলের গদি-আঁটা হাতীর দাঁতের চেয়ারে বসিয়া মার্বেল পাথরের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া সোনার দোয়াত কলম দিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন; সোনার গুড়গুড়িতে মৃগনাভিগন্ধী অম্বুরি তামাক সাজিয়া

ঘিসু খানসামা সোনার মুখনল হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় ইচ্ছা দাসী আসিয়া খবর দিল। রাজা ধনেশ্বর চিঠি লেখা ছাড়িয়া আর-একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া তাহাতে কি লিখিয়া ইচ্ছার হাতে দিলেন; তালুক-মুলুক দানের হুকুমনামা পরোয়ানা মনে করিয়া ইচ্ছা আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া হাসিতে-হাসিতে তাহা দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। বুড়িটা একটা খুব জবর রকমের দাও মারিল দেখিয়া ঘিসুর মন ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। ধনেশ্বর সহজ শান্তস্বরে বলিলেন—খাজাঞ্চিকে দিগে, তোর মাইনে চুকিয়ে দেবে, আজ থেকে তোর জবাব হল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল দেখিয়া ইচ্ছা বুড়ি হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া রাজার পায়ে পড়িল, সে বকশিশ চায় না; তাহার পাঁচসিকা মাহিনার চাকরীটি বজায় থাকুক; এই বুড়া বয়সে তাহার চাকরী গেলে সে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে।

রাজা অবিচলিত ধীর কণ্ঠে বলিলেন—ঘিসু, বুড়িটেকে লাথি মেরে ঘর থেকে দূর করে দে ত।

বুড়ি পা ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতে-যাইতে ক্রন্দন-কোলাহলে জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিয়া গেল—চাকরী করে এই বাড়ীতে বুড়ো হয়ে গেলাম। বুড়ো বয়সে বকশিশ হল এই অপমান! হা ভগবান্!

রাজা ধনেশ্বর তেমনি নিশ্চিন্তভাবে চিঠি লিখিতে

লাগিলেন। ঘিসু খানসামা পুত্তলিকার মতো স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার আর নিশ্বাস ফেলিতেও সাহস হইতেছিল না।

ইচ্ছাদাসী রাখাল ও মণিমালার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

রাখাল সমস্ত শুনিয়া বলিল—ঠিক হয়েছে! এ অপমান ত তোকে নয় ইচ্ছানানি, এ অপমান আমার। তোর তবু একটা আপনার বলবার মতন কুঁড়ে ঘরও আছে, সেখানে গিয়ে তুই স্বচ্ছন্দে থাকবি; আমার তাও নেই, আমাকে এইখানে পড়ে পড়ে লাথি খেতে হচ্ছে। আমার এক কড়ার সম্বল নেই যে তোর ক্ষতিপূরণ করব। তোর ভাত মারার কারণ হয়ে এ বাড়ীর ভাতের গ্রাস আমার বিষ বলে মনে হবে ইচ্ছা-নানি। তোর সঙ্গে-সঙ্গে এ বাড়ী থেকে আমিও বেরুবো। এই রাজভোগে থাকার চেয়ে গাছতলায় থেকে মুটেগিরি করে খাওয়াও ঢের সম্মানের, ঢের গৌরবের।

ইচ্ছা-নানির কোলে মণিমালা এত-বড়টি হইয়াছে; সেই বুড়িকে এমন ভাবে তাহাদেরই জন্য অপমানিত হইয়া চাকরী খোআইয়া যাইতে হইতেছে দেখিয়া মণিমালার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। মণিমালা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দুখানা চেলির কাপড়, দুখানা বাজু আর দুই শত টাকা বাহির করিয়া ইচ্ছার হাতে দিয়া বলিল—এই বাজু আর চেলি

তোর নাত্নি আকালী আর পব্নীকে দিস ; আর এই টাকা তুই রাখিস। তোর নাতি পাতামুকে মাসে মাসে পাঠিয়ে দিস, আমি তোকে কিছু কিছু তন্খা দেবো। তুই বুড়ো হয়েছিস, আর কতকাল দাসপনা করবি ? এখন বাড়ী বসে থাকগে যা।

বুড়ির ও রাখালের মন মণিমালার কথায় ও ব্যবহারে অনেকখানি খুসী হইয়া উঠিল। তবু বুড়ি কাঁদিয়া কাটিয়া দুঃখ করিয়া গেল যে সে মণির ছেলেকে হাতে কোলে করিয়া দেখিয়া যাইতে পাইল না।

মণিমালার নূতন ঝি হইল রক্ষা। কঠিন দজ্জাল ঝগড়াস্তে বলিয়া রাজবাড়ীতে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

(২১)

সঞ্চিত ক্রোধের বজ্র ইচ্ছা দাসীর উপর খরচ হইয়া যাওয়াতে রাজা ও রাণীর মনের দুর্য্যোগ ও মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল। তাঁহারা নাতির মুখ দেখিবার সম্ভাবনায় অল্পে অল্পে উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন ; এবং রাণী এত দিনে মণিমালাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে আদর করিলেন। রাজা ধনেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—মায়ের এইবার নিজের ছেলে হবে, সৎমায়ের আদর আমাদের ভাগ্যে আর একটুও জুটবে না !

মণিমালা সুখে আনন্দে পূর্ণ হইয়া মাথা নত করিয়া শুধু হাসিল ; যে অনাগত শিশু পিতামাতার স্নেহের রাজ্য

তাহাদের ফিরাইয়া দিল তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া ভাবী মাতার মন মমতায় ভরিয়া উঠিল।

মণিমালার আদরযত্নের আর সীমা নাই; মা চোখে-চোখে রাখিয়া ফিরেন। ছোঁয়াচ নজর বাও বাতাস না লাগে ইহার জন্য তুকতাক মাদুলি তাগা যে যাহা জানে এবং যে যাহা বলে তাহাই করা হয়; মণিমালার গলা যেন আন্‌লা হইয়া উঠিল। দেবালয়ে দেবালয়ে পূজা পাঠানো হয়; গণপতি, কেশব ও সারদানাথ ভট্টাচার্য্য নিত্য বাড়ীতে নারায়ণকে তুলসী দিতেছেন, হোম করিয়া খুব খাটি ঘি ভস্মে ঢালিতেছেন, চণ্ডী পড়িতেছেন। শুভদিন দেখিয়া-দেখিয়া আজ সীমন্তোন্নয়ন, কাল পঞ্চামৃত, পরশু সাধভক্ষণ হইতেছে; বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহলের অন্ত নাই, উৎসব-ব্যস্ততার সীমা নাই। রাজা প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন মণিমালার কোনো অসুখ অভাব আছে কি না; তাহার মন বেশ প্রফুল্ল আছে কি না।

তাহার মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য নানাবিধ দুর্লভ সামগ্রী—বেনারসী কাপড়, আগরার ঘাগরা, দিল্লির ওড়না, ঢাকাই গহনা, হাতীর দাঁতের বাক্স, বিলাতী ঘাগরা-পরা পুতুল প্রভৃতি—নানা দেশ হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল; নিত্য নূতন সুন্দর ও মূল্যবান উপহারে মণিমালার ঘর ও মন বোঝাই হইয়া উঠিতে লাগিল।

নয় মাসে পড়িতেই দেশের মধ্যে সবচেয়ে যে নাম-করা

ভালো দাই তাহাকে আনিয়া বাড়ীতেই রাখা হইল। রক্ষা দাসীর উপর কড়া হুকুম জারি হইল রাত-বিরেতে প্রসব-বেদনা একটু টের পাইলেই যেন রাণী ও রাজাকে খবর দেওয়া হয়। মণিমালাকে পাহারা দিবার জন্য আরো পাঁচ জন দাসী নিযুক্ত হইল, তাহারা পালা করিয়া সর্ব্বদা একজন মণিমালার কাছে থাকিবে; রাত্রে জাগিয়া বসিয়া পাহারা দিবে।

বাড়ীর চাকর দাসীরা হলুদে ছোবানো কাপড় বকশিশ পাইয়া চারিদিকে আনন্দের রং লাগাইয়া দিয়াছে। সকলের মুখেই হাসি।

এইসব উৎসব আনন্দের মধ্যে রাখালকে সকলে ভুলিয়া বসিয়াছিল। মণিমালাকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত। ইহাতে রাখাল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল; সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর আনন্দ-উৎসবটাও রক্ষা পাইতেছিল। কিন্তু রাখালের মন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না; সে সর্ব্বদা ভাবে কেমন করিয়া সে এখান থেকে পলায়ন করিয়া আপন পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে; আগে সে ও তাহার স্ত্রী ছিল, এখন আবার পরিবার বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে; বিলম্ব করা আর চলে না, ক্রমশো ভার ও দায়িত্ব বেশী ও তাহা বহনের উপায় কঠিন হইয়া আসিতেছে।

যথাসময়ে মণিমালার একটি ছেলে হইল। দেউড়িতে দেউড়িতে নহবৎ বসিল, দরজায় দরজায় কলার গাছের

কোলে পূর্ণঘটের মুখে নারিকেল বসিল, চৌকাঠে চৌকাঠে আম্রপল্লবের মালা দুলিল। রুপার গামলায় করিয়া বিবিধ মিষ্টান্ন গ্রামের ঘরে-ঘরে বিলি হইল। দাই বেনারসী শাড়ী, পাঁচ মোহর, রুপার থালা ও এক জোড়া যশম বিদায় পাইয়া খুসী হইয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। দাসীরা সোনার হাঁসুলি ও চাকরেরা গলার মালায় গাঁথা সোনার কণ্ঠী বকশিশ পাইয়া পরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাজার বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারী দৌহিত্র হইয়াছে, বোম বন্দুকের শব্দে কাক বেচারারা উদ্বাস্ত হইয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

গরিব রাখালের ছেলে হইলেও রাজা তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী দৌহিত্রের নাম রাখিলেন ভূপাল।

ভূপালের জন্য নিপুণ মালাকর লাল রঙের বিচিত্র সুন্দর সোলার ঝারা তৈয়ার করিয়া দিল; ভূপাল সোনার বাটি হইতে সোনার ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইয়া, সোনার কাজল-লতা হইতে কাজল পরিয়া, হাতীর দাঁতে খচিত দোলনায় সাটিন কিংখাবের বিছানায় শুইয়া সেই ঝারা দেখিয়া খেলা করে; একটু কাঁদিয়া উঠিলে পাঁচজন দাসী সোনার ঝুমঝুমি আর গালার রং-করা হাতীর-দাঁতের চুষিকাঠি লইয়া সান্ত্বনা করিতে ছুটিয়া আসে; সকাল বিকাল ঠেলা গাড়ীতে চড়াইয়া হরিয়া খানসামা ভূপালকে হাওয়া খাওয়াইয়া আনে, দুধের বোতল লইয়া ঝুনকিয়া দাসী ও মোটা মোটা

লাঠি লইয়া কোমরে তরোয়াল বাঁধিয়া ইনাম সিং জমাদার আর বরকন্দাজ বরকতআলী সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভূপাল এমনি আদরে রাজারাণীর কোলে-কোলে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

মণিমালা একএকবার সোনায় রূপায় জরিতে সাটিনে মোড়া ভূপালকে আনিয়া রাখালের কোলে দিয়া পরম সুখে হাসিত। রাখাল হাসিয়া বলিত—রাজার নাতিকে কোলে করবার জন্যে ত পাঁচ শ চাকর রয়েছে; আমাকে দিয়ে আর পাঁচ শ এক কর কেন!

মুক্তামালা কৌতুকসুখের কৃত্রিমকোপে চোখ রাঙাইত। রাখাল ভূপালকে বুকে করিয়া পরাধীনতার সকল গ্লানি ভুলিয়া সুখে হাসিত।

(২২)

এমনি সুখের একটানায় জীবনের দিনগুলি হুহু করিয়া গড়াইয়া চলিতেছিল।

রাজার উত্তরাধিকারীর জন্ম হওয়াতে পরম শাক্ত রাজার বাড়ীতে দুর্গোৎসবের বিশেষ-রকম আনন্দ-উল্লাস না মিটিতে-মিটিতেই আবার কালীপূজা আসিয়া উপস্থিত হইল। মানসিক করিয়া শিশুর দীর্ঘজীবনের কামনায় নিষ্ঠুরভাবে পশুহননের তামসিক আনন্দ গোসাঁই-বাড়ীতে পালিত বৈষ্ণবপ্রাণ রাখালের চক্ষে বীভৎস বোধ হইতেছিল; চারি-

দিকে ছাগ মেষ মহিষের কাতর আর্ত্তনাদ ও রক্তপিপাসু লোকগুলার বিকট মা মা রবে চীৎকার রাখালকে বিক্ষুব্ধ পীড়িত করিতেছিল ; রাখালের মন মূক পশুর দুঃখে ও মত্ত মানবের ব্যবহার দেখিয়া বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে আপনাকে সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে একটি ঘরে গোপন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাড়ীর লোকেও এই আনন্দ-সঙ্গতের তাল কাটিয়া যাইবার ভয়ে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবারও চেষ্টা করিতেছিল না।

কালীপূজার রাত্রি। বাড়ীতে ছাদের আলিসায় আলিসায় দীপমালা জ্বলিতেছে, আকাশের নিবিড় অন্ধকারে নক্ষত্রমালা জ্বলিতেছে, উভয়ের মাঝখানে বাজির ফুৎকার ও লোকের চীৎকার উঠিতেছে, এবং রাজবাড়ীর লোকদের চক্ষু মদ্যমাংসের প্রচুর পরিবেষণে আনন্দে জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

রাণী জগদ্ধাত্রী স্বচ্ছ শ্বেত পাথরের গেলাসে পিঙ্গলবর্ণের মৃদুবীর্য্য স্বাদু মদ ঢালিয়া স্খলিত কণ্ঠে মণিমালার দিকে অগ্রসর করিয়া ধরিয়া বলিলেন—মণি, তুই একটু খা।

মণিমালার মুখ শুকাইয়া গেল। সে শুষ্ক মুখে বলিল—না মা, আমি খাব না।

রাণী জগদ্ধাত্রী জেদ করিয়া বলিলেন—খাবিনে কি ? আজকে মা-কালীর পেসাদ একটু মুখে দিতে হয়।

মণিমালার বলিতে ইচ্ছা ছিল না, তবু না বলিয়া পারিল না। ভয়ে ভয়ে বলিল—না মা, মদ খেলে উনি রাগ করবেন। বিজয়াদশমীর দিন সিদ্ধি খেয়েছিলাম বলে কত রাগ করছিলেন।

রাণী জগদ্ধাত্রী হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—রাখাল! রাখাল রাগ করবে এই ভয়ে তুই খাবিনে? এই ষোল বচ্ছর খেয়ে এলি, গেল বছরও ত খেয়েছিলি, আর আজকে হল রাখালের ভয়! রাখাল কি তোকে ধমকায় নাকি? এত বড় আস্পর্দ্ধা। এই, কে আছিস, ডেকে আন ত রাখালকে...

মণিমালা তাড়াতাড়ি মায়ের হাত হইতে গেলাস লইয়া বলিল—মা, মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি ওঁকে কিচ্ছু বোলো না, আমি খাচ্ছি!

মণিমালা স্বামীকে অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজের হাতে তুলিয়া সমস্ত বিষটুকু পান করিল।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন—লক্ষ্মী মেয়ে। যাও এখন শোওগে যাও।

মণিমালা ম্লান মুখে বলিল—যাব 'খন, তোমাদের খাওয়া দাওয়া হোক।

যখন সকলে যে যার ঘরে গিয়া বিছানায় পড়িল তখন গভীর রাত্রে অনেক দেরী করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া রাখাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে আশা করিয়া মা-কালীর নাম

জপিতে-জপিতে মণিমালা আপনার ঘরে গেল। ঘরে ঢুকিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল বলিল—এত রাত্তির করে এলে, আমি তোমার জন্যে এখনো জেগে রয়েছি। এস...

রাখাল মণিমালাকে বুকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল। মণিমালার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; রাখালের এই সাদর আহ্বান অগ্নিপরীক্ষার ন্যায় অতি নিদারুণ ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইল। মণিমালা স্তম্ভিত নির্ব্বাক আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল আবার বলিল—এস। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

মণিমালার মাথা ঘুরিতেছিল, সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

—কি! অমন করছ কেন। অসুখ করছে না কি?—বলিতে বলিতে রাখাল খাট হইতে তড়াক করিয়া লাফাইয়া নামিয়া আসিয়া নত হইয়া মণিমালাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—তোমার মুখে ও কিসের গন্ধ? মদ খেয়েছ? মাতাল হয়ে আমার কাছে এসেছ?

মণিমালা কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—আমি অপরাধ করেছি, আমাকে মাপ কর!

রাখাল গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—মাতালকে আমি মাপ

করিনে, তুমি দূর হও। একদিন সিদ্ধি খেয়েছিলে, মাপ করেছিলাম; আজ আবার মদ খেয়ে এসেছ! তোমাকে আর বিশ্বাস নেই। তুমি বেরোও।

মণিমালা স্বামীর দুই পা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আজকে আমায় ক্ষমা কর; এমন অপরাধ আর কখনো করব না, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

রাখাল আর কিছু না বলিয়া মণিমালার হাত ধরিয়া তুলিয়া জোর করিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

উত্তেজনার মুখে রাখাল হয়ত একটু উঁচু গলায় চড়া কথা বলিয়াছিল। সেই গোলমাল শুনিয়া একদিক হইতে বরজহাটির দিদি ও অপর দিক হইতে রাণী জগদ্ধাত্রী এবং তাঁহাদের সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলি দাসী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখাল মণিমালাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল দেখিয়া বরজহাটির দিদি বলিয়া উঠিলেন—একটা গোঁয়ার চাষার হাতে রাজকন্যার খোয়ার দেখলে গা জ্বলে যায়। রাজার যেমন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই, বাঁদরের গলায় দিলেন মুক্তার মালা! মানুষ হলে সে মাথায় করে রাখত, বাঁদর তাকে দাঁতে কাটছে! মণি যদি শক্ত হত ত উঠতে বসতে পায়ে ধরতে হত।

রাখালের মন গুণটানা ধনুকের মতো চড়া হইয়া উঠিয়াছিল; বরজহাটির দিদির কথার আঘাতে ক্রোধের

বাণ ছিটকাইয়া গেল। রাখাল বলিয়া উঠিল—বরজহাটির দিদি, জুতোর দাম লাখটাকা হলেও সে পায়ে থাকে; তোমাদের কাছে মণিমালা রাজকন্যা, তোমরা তাকে ভয় করতে পার; আমি তাকে লাথি মারতে পারি।

রাখালের পা হঠাৎ ছুটিয়া মণিমালার গায়ে বাজিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী অমনি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কী! আমরা কি এতকাল দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছিলাম! আমার সামনে আমার মেয়েকে অপমান! আজকে একটু মুখে দিতে হয় বলে আমিই জেদ করে এতটুকু মা-কালীর পেসাদ খাইয়েছিলাম, নইলে গোঁয়ার স্বামী বকবার ভয়ে ও ত খেতে চাচ্ছিল না! এ লাথি ত মণিকে মারা নয়, এ আমাকে মারা হয়েছে!

মণিমালা তাড়াতাড়ি গিয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতি জেদ ও তিরস্কার মিশাইয়া বলিল—মা, তুমি শুতে যাও। আমাদের একটু ঝগড়া হয়েছে কি না-হয়েছে তাতে তোমরা ছুটে এলে কেন?

রাখাল ক্রোধের উত্তেজনায় জ্ঞান হারাইয়া হঠাৎ যে গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার লজ্জায় ও অনুতাপে কাতর হইয়া সে ঘরে লুকাইতে যাইতেছিল; দংশন করিয়া সাপ গর্ত্তে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—ঝুনকিয়া, ইনাম সিং জমাদারকে ডাক ত, বেইমান চাষাটাকে ঘাড় ধরে বা'র করে দিক।

রাখাল উদ্ধত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কি বলিতে যাইতেছিল। মণিমালা ছুটিয়া গিয়া রাখালের দুইপা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি একটিও কথা কয়ো না ; ফুঁ দিয়ে আগুন উস্কে তুলো না ; তুমি ঘরে যাও, আমাকে হুকুম কর আমিও ঘরে যাই। যা দণ্ড দিতে হয় তুমি দিয়ো, এত লোককে দিয়ে আমায় অপমান করিয়ো না।

রাখাল মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেল। মণিমালাও তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সমবেত লোকেদের নাকের সামনে ঝনাং করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া খিল লাগাইয়া দিল।

রাণী হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধ দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী বরজহাটির দিদির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

বরজহাটির দিদি গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া মুখে শব্দ করিলেন—প্‌ছ্‌!

(২৩)

রাখাল উদ্বেগ উত্তেজনায় পীড়িত হইয়া আর শুইতে পারিল না ; কৌচের উপর জাগিয়া বসিয়া রহিল। মণি-মালা নীরবে আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে ক্ষমার প্রতীক্ষা

করিয়া বসিল; তারপর বসিয়া-বসিয়া ক্লান্ত হইয়া সেই মেঝের গালিচার উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাখাল লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় তাহার দিকে তাকাইতেও পারিতেছিল না। কাহার অপরাধ বেশী, কে কাহাকে ক্ষমা করিবে তাহাই সে বসিয়া ভাবিতেছিল। 'আর তাহার কানের কাছে রাণী জগদ্ধাত্রীর একটি কথা অনুক্ষণ বাজিতেছিল—গোঁয়ার স্বামীর বকবার ভয়ে ও ত খেতে চাচ্ছিল না!

প্রায় দেড় বৎসর হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, এতকাল রাখাল মণিমালাকে লইয়া অবিচ্ছেদে ঘর করিতেছে, এতদিনে মণিমালাকে তাহার চিনিতে পারা উচিত ছিল। মণিমালা যে তাহারই ইচ্ছানুগত হইয়া চলিতে চায় তাহার পরিচয় ত সে বারবার পাইয়াছে। তবে সে দারুণ রাগের বশবর্ত্তী হইয়া এমন অন্যায় ভুল করিয়া বসিল কেন? একদিন ভাঙ খাওয়াতে সে তাহার স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া নিষেধ করিয়াছিল এবং মণিমালাও ত তাহার শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল যে সে জীবনে আর কখনো মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না; তৎসত্ত্বেও মণিমালা আজ যে মদ খাইয়া আসিল তাহাতে রাখালের রাগ না করিয়া ইহাই বুঝা উচিত ছিল যে এ বাড়ীর হাওয়া এমন দূষিত, সংসর্গ এমন কলুষিত যাহাতে মণিমালা বাধ্য হইয়া আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় এ

কাজ করিতে পারে না।—এই কথা মনে হওয়াতে রাখালের অন্তর আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল এই পাপসংসর্গে তাহার স্ত্রীকে রাখা আর কিছুতেই উচিত নয়, তাহারও থাকা অনুচিত হইতেছে অনেক দিন হইতেই। কিন্তু সে যে নিঃস্ব, আশ্রয়হীন; রাজার মেয়েকে লইয়া গিয়া কোথায় রাখিবে, কেমন করিয়া রাখিবে? মণিমালাই কি এই রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে যাইতে রাজি হইবে? মণিমালা তাহাকে যেরূপ ভালো বাসিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাতে সে যাইতে রাজি হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে রাজি হইলে এখান হইতে চলিয়া যাইবারই বা উপায় কি, চলিয়া গিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতি-পালনেরই বা উপায় কি? আর মণিমালা যদি স্বেচ্ছায় না যাইতে চাহে তবে তাহার স্ত্রীকে নিরাপদ করিবারই বা কি উপায় সে করিতে পারে।—ইহা ভাবিতে ভাবিতে রাখাল আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাথার মধ্যে চিন্তার শত আবর্ত্ত তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতে লাগিল। এই বিষম জটিল গোলকধাঁধা হইতে পথ কোথায়, মুক্তির উপায় কি, তাহাই ভাবিয়া রাখালের সমস্ত অন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

অনেক বেলা হইয়া গেল। দুঃখের অবসাদে আচ্ছন্ন মণিমালার ঘুম তখনো ভাঙে নাই। সমস্ত রাত্রির বিক্ষুব্ধ জাগরণে রাখালেরও চেহারা মাতালের মতন হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল ঠায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে।

ঘিসু খানসামা বাহিরে গলা খাঁখারি দিয়া ডাকিল—জামাইবাবু, মহারাজ আপনাকে ডাকছেন।

রাখাল বলিল—যাচ্ছি চল।

মণিমালার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া রাখালের পা ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল—আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ, বাবার বকুনির তুমি একটি উত্তর দিতে পারবে না। আমরা দোষ করেছি। তাঁদের শাসন সহ্য করতে হবে। বল, করবে?

রাখাল মণিমালাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া গম্ভীর ভাবে শুধু বলিল—করব মণি, আজ আমি সব সহ্য করব।

মণিমালা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুঝিল, তাহার স্বামীর মনে কাল রাত্রে কি ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

রাজা ধনেশ্বর চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন। রাখাল অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিত ধীর পদে আসিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত সমস্ত নিস্তব্ধ।

রাজা ধনেশ্বর শান্ত ধীর কণ্ঠে অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—দেওয়ানজীকে বলেছি; তিনি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন; তুমি নেয়ে খেয়ে নিয়ে তোমার দেশে ফিরে যাও। আমরা মনে করব মণিমা বিধবা হয়েছে। তুমি যে-সমস্ত জিনিস ব্যবহার করতে, সে সমস্তই তোমার, তুমি ইচ্ছা করলে নিয়ে যেতে পার।

রাখাল একবার শুধু মুখ তুলিয়া রাজার দিকে চাহিল

তারপর শ্বশুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যেমন নীরবে গিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। ফিরিবার পথে রাণীর ঘরে গিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তারপর নিঃশব্দে আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল।

মণিমালা উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

রাখাল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—ছুটি পেয়েছি মণি। আমার রাজার জামাই সাজার পালা শেষ হয়েছে; এখন জাত্রার পালা শেষ করে যাত্রার জোগাড় করতে হবে!

রাখাল ছলছল চোখে অগ্রসর হইয়া মণিমালার ছুই হাত ধরিয়া বলিল—যাবার আগে তোমার কাছে আমি হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। আমার সকল অত্যাচার সকল রূঢ়তা ভুলে যেয়ো, যদি কিছু ভালো বাসার পরিচয় পেয়ে থাক শুধু সেইটুকু মনে রেখো। তুমি জানো আমি তোমায় লাথি মারতে পারি না; তোমার চারদিকে ঐশ্বর্যের যে অহঙ্কার জড়িয়ে থেকে আমাদের মিলনকে ক্রমাগত বাধা দিচ্ছিল, আমি তাকেই লাথি মেরে ভাঙতে গিয়েছিলাম। তাতে তোমাকেও ছুঃখ পেতে হয়েছে, আমাকেও আমি বাঁচাতে পারিনি। আমাদের মিলনের বাধা ভাঙতে গিয়ে মিলনের বন্ধনও ছিঁড়ে গেল মণি! তবু এ আমার মুক্তি! ভূপাল তোমার কাছে রইল; আমার কেউ রইল না; দিদিমাও আমার আজ বেঁচে

নেই। ভূপালের কাছে আমার নাম কেউ করবে না; যদি বা করে, তাতে ভূপালের মনে হবে তার বাবা ছিল একটা দানব কি রাক্ষস। তার কাছে তার বাবার যথার্থ পরিচয় তুমি দিয়ো।

রাখালের শোকে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইল না। সে শান্ত ধীর ভাবে একে একে অশ্রুমুখী পত্নীকে ও হাস্যমুখ পুত্রকে চুম্বন করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে মুক্ত গগনের স্বাধীন বিহঙ্গ সোনার পিঞ্জর হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার আনন্দও হইতেছিল, আবার পিছনে যাহাদের ফেলিয়া যাইবে তাহাদের জন্য বেদনাও বোধ করিতেছিল। রাখাল এখন বুঝিতে পারিতেছিল এই দেড় বৎসরেই তাহার শ্বশুরবাড়ী তাহার কত আপনার হইয়া উঠিয়াছিল; আজন্মের পরিচিত দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে আবার নূতন করিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে। তাহার এই দ্বিতীয় নির্ব্বাসন!

অনেকক্ষণ কান্নার পর মণিমালা প্রথম কথা বলিতে পারিয়াই দৃঢ়স্বরে রাখালকে বলিল—তোমার সঙ্গে আমিও যাব।

রাখাল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আমার সঙ্গে কোথায় যাবে মণি? আমার বলে—

চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি!

আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখব?

—যেখানে তুমি থাকবে।

—সে কুঁড়েঘরে তুমি থাকতে পারবে কেন? সেখানে দাসদাসী নেই, কে তোমার সেবা করবে? এ অসম্ভব মণি।

মণিমালা দৃঢ়স্বরে বলিল—তোমার সঙ্গে আমি গাছ-তলাতেও সুখে থাকব; তোমায় ছেড়ে আমি এবাড়ীতে থাকতে পারব না।

রাখাল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মণিমালার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহা সঙ্কল্পে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল উচ্ছ্বসিত আনন্দ যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল—বেশ করে ভেবে দেখো মণি। তোমাদের গোয়াল-ঘরের চেয়েও খারাপ মেটে বাড়ী, বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা, কেঁচো জোঁক কিলকিল করছে; ঘরের কানাচে শেয়াল ডাকে; গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নাইতে হবে, কাঁখে কলসী করে জল তুলতে হবে, গোবর দিয়ে ঘর নিকোতে হবে, রাঁধতে হবে, বাসন মাজতে হবে। এ সব সইতে পারবে?

মণিমালা দৃঢ় স্বরে বলিল—পারব।

রাখাল আনন্দিত হইয়া বলিল—তবে যাও, বাপ-মায়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এস। আমরা মনের সুখে সকল ক্ষতি পূরিয়ে নিয়ে কুঁড়ে ঘরে স্বর্গ রচনা করব মণি!

মণিমালা স্বামীর সম্মতি পাইয়া তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে তাহার বাবাও গম্ভীর

হইয়া বসিয়া আছেন। তাহার উৎফুল্ল মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রাজা ধনেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—কি গো মা ?

মণিমালা তাড়াতাড়ি আগ্রহের সহিত বলিল—বাবা, আমিও যাব।

বিস্মিত হইয়া রাজা ও রাণী বলিয়া উঠিলেন—কোথায় রে ?

মণিমালা মাথা নত করিয়া বলিল—ওঁর সঙ্গে।

—সেখানে তুই কোথায় যাবি ? ওর না আছে বাড়ী ঘর, না আছে চাকর দাসী। ওর সঙ্গে যাবি কি বল্ ?

মণিমালা স্পষ্ট স্বরে বলিল—ওঁর সঙ্গেই তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছ। ওঁর সঙ্গেই আমি যাব !

রাণী জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা

বেটি মাটি ঘর, হাত বদলালেই পর !

রাজা ধনেশ্বর তীব্র দৃষ্টিতে একবার মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ঝাঁকিয়া বসিয়া আছে। তিনি বলিলেন—তোমরা মনে করেছ—তুমি যেতে চাইলেই আমি রাখালকে থাকতে বলব ? তোমার বাবাকে তুমি তা হলে চেনো নি।

মণিমালা দৃঢ়স্বরে বলিল—তাঁকে একদণ্ডও এ বাড়ীতে আমি থাকতে বলতে পারিনে। তাঁর যাওয়াই উচিত,

তাঁর যাবার উপায় আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম। এখন তিনি যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আমিও যাব।

রাজা ধনেশ্বর রূঢ়স্বরে বলিলেন—যাবে যাও, গহনা-পত্তর বেচে খেয়ে, যখন উপোষ করতে হবে তখন ফিরে এসো। সোনাউল্লা জমাদারকে পাঁচ টাকা মাইনে আর খোরাকি দিতে চাইলাম; সে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্লে—নেহি রহেগা! তারপর কিছুদিন বাদে এসে বল্লে—মহারাজ, দরমাহাসে কাম নেই, খালি খোরাকি মিলনেসেই রহেগা!

ধনেশ্বরের সূক্ষ্ম সৌখীন গোঁপের তলে একটি মৃদু হাস্য-রেখা ঈষৎ ফুটিয়া মিলাইয়া গেল।

তাহা দেখিয়া ও বাবার উপমাযুক্ত কথা শুনিয়া মণি-মালার অসহ্য বোধ হইল; সে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ধনেশ্বর ডাকিয়া বলিলেন—ভূপালের জামা-কাপড়গুলো বার করে রক্ষার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে যেয়ো...

মণিমালা যাইতে-যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল—ভূপালও আমাদের সঙ্গেই যাবে।

রাজারাণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের সব গেল, রহিল শুধু জেদ আর জমিদারী চাল।

দাবানলের মতো সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল যে রাজার মেয়ে জামাই নাতি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। গুমটের দিনে যেমন একটি পাতা নড়ে না, সমস্ত দেশটা

তেমনি স্তম্ভিত হইয়া গেল। রাখালের কিন্তু স্ফূর্তি ধরিতে-ছিল না—তাহার মুক্তি, অথচ মণিমালাকে তাহার হারা-ইতে হইল না।

শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মণিমালার পিসি কমলাকে সঙ্গে করিয়া পাহাড়পুরে আসিয়া পড়িলেন; দুজনে মিলিয়া রাজার রাগ যদি শান্ত করিতে পারেন। কিন্তু রাজা-রাণীর সহিত তাঁহাদের দেখা হইল না; রাজা-রাণী এই কতকক্ষণ আগে তাঁহাদের বড়গাছিয়ার বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হতাশ হইলেন, এ রাগ তবে শীঘ্র পড়িবার নয়।

রাখাল ও মণিমালা হাসিয়া কাঁদিয়া সকলের কাছে বিদায় লইল। আজ পাগলা জামাই-বাবুর জন্যও চাকর দাসী সকলেই চোখের জল ফেলিল। সকলকে বেশী করিয়া কাঁদাইল ভূপালের অবিশ্রাম হাসি।

(২৪)

রাখাল গোসাঁইগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে গোসাঁইগঞ্জ সে দেড় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছিল এ যেন সে গোসাঁইগঞ্জ নয়। যেখানটিতে তাহার সহিত গোসাঁইগঞ্জের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, ঠিক সেই জায়গাটিতে আসিয়া সে মিলিতে পারিল না; তাহার অল্প কয়েক মাসের অনুপস্থিতিতেই বিচ্ছেদের ভাঙন এতদূর বেশী হইয়াছে যে জোড়া লাগিবার আর কোনো সম্ভাবনাই নাই।

তাহার দিদিমা নাই, ব্রজ নাই, ব্রজর বাবা মথুর নাই, আরো কত চেনা মুখ আজ গ্রামে নাই—কেহ মরিয়াছে, কেহ বিদেশে চাকরী করিতে গিয়াছে; কত মেয়ের বিবাহ হইয়া যাওয়াতে তাহারা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কত নূতন বৌ, নূতন শিশু গ্রামে আসিয়াছে, তাহারা রাখালকে কখনো দেখে নাই, হয়ত নামও শোনে নাই, তাই তাহারা রাখালকে চেনে না; রাখালও তাহাদিগকে চেনে না। তাহার পূর্ব্বপরিচিতদের মধ্যে আছে শুধু পূর্ণযৌবনা বিধবা প্রসাদী ও শোকজীর্ণ তাহার মা, আর গ্রামের সেই সব অকর্ম্মা ছেলেদের দুচারজন—তাহাদের দলেও মরণের আঘাতে ভাঙন ধরিয়াছে, যে দুচারজন আছে তাহারাও ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট, উল্লাসশূন্য ও স্ফূর্ত্তিহীন। প্রসাদীর ম্লান সুন্দর মুখের দিকে চাহিতে চোখে জল আসে, তাহার সহিত কথা বলা আর সহজ নয়। রাখাল বড়লোকের বাড়ীতে কয়েক বৎসর থাকিয়া ও লেখাপড়া শিখিয়া আদবকায়দায় চালচলনে সভ্যভব্য শহুরে রকমের হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে আবার সে রাজার জামাই, গ্রামের লোক তাহাকে এখন সমীহ করিয়া চলে, তাহাকে দেখিয়া সম্ভ্রমে তটস্থ হয়; রাখাল এই গ্রামের কাহারও আর আপনার লোক নয়।

মণিমালাও এই যেখানে আসিয়াছে তাহা তাহার কাছে সকল রকমেই অপরিচিত। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর

উঠানে কাদা, ঘাস; বাড়ীর বাহির হইলেই জঙ্গল। এখানকার বাড়ীতে পায়খানা নাই, খিড়কিতেই পুকুর নাই, পুরুষদের সামনে দিয়া আধক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গায় কাপড় কাচিতে যাইতে হয়; এখানে প্রতিদিন ধোপা আসে না, আপনার কাপড় আপনি ক্ষারে কাচিয়া লইতে হয়। এখানে যে-রকম মোটা চালের ভাত হয়, সে-রকম চাল তাহার বাপের বাড়ীতে হাতী ও গোরুর দানা ছিল; এখানকার ভাতের সঙ্গে যে একমাত্র ডাল ও তরকারী থাকে, কমিয়া যাইবে বলিয়া তাহার ভালো করিয়া খোসা ফেলা হয় না; তৈলের সহিত সম্পর্ক অল্পই থাকে, ঘৃত চোখেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মণিমালা এতদিন রাজার বাড়ীর মেয়ে ছিল, এখন সে গরিব কৃপণ গৃহস্থের বাড়ীর বৌ হইয়াছে। রাখাল হঠাৎ এই বাড়ী হইতে রাজার বাড়ীতে বদলি হইয়া আদবকায়দার বাঁধাবাঁধিতে যে অসুবিধা ও অস্বস্তি বোধ করিয়াছিল, মণি-মালা ঐশ্বর্য্যের কোল হইতে একেবারে এই রিক্ত দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া পড়াতে তাহার অপেক্ষাও অধিক পীড়া অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সে হাসিমুখেই সমস্ত অনভ্যস্ত দুঃখকে অতি সহজে বরণ করিয়া লইতেছিল—পাছে তাহার স্বামীর সম্মানের এতটুকু হানি হয়, পাছে তাহার স্বামীর মনে দুঃখের এতটুকু আঁচ লাগে।

রাজার মেয়েকে দেখিবার জন্য গাঁয়ের মেয়ে ছেলে

বৌ ঝি সকলে বৃন্দাবন গোসাঁইএর বাড়ীতে ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল রাজার মেয়ে তাহাদেরই মতন নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ে—তাহার সর্ব্বাঙ্গে হীরা মুক্তা ঝলমল করিতেছে না, তাহার দুপাশে দুজন সুন্দরী দাসী চামর ঢুলাইতেছে না, সে সোনার সিংহাসনেও বসিয়া নাই। গ্রামবাসিনীরা হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া অবাক হইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল দশ বছরের ছেলে হাবুল তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, রাজকন্যা কৈ ?'—তাহার মা মণিমালাকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল—'ঐ ত !'—হাবুল অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—'দূর ! ও ত মানুষ !'— হাবুলকে অপ্রতিভ করিয়া সকলে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। কাঙালীর মেয়ে কাত্যায়নী এতটুকু ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। সে নাক সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠিল—পোড়াকপাল এমন রাজার মেয়ের ! ডাইনে বাঁয়ে দাসী নেই, সোনার খাটে গা গড়ায় না, রূপোর খাটে পা থোয় না, আগে পিছে মোহর ছড়ায় না—রূপকথার রাজকন্যেরা এর চেয়ে ঢের ভালো !

কাত্যায়নীর কথা শুনিয়া সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। অতটুকু মেয়ের কথার বাঁধুনি শুনিয়া মণিমালা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল—বাবা ! কী পাকা ঝুনো মেয়ে !

রাখালের বিবাহ দিতে গিয়া বৃন্দাবন গোসাঁই মণি-

মাল্লার বাবার ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাই তিনি রাজার মেয়েকে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি আহ্লাদে গর্ব্বে গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া সকলকে শুনাইয়া-শুনাইয়া কেবলি বলিতেছেন—

যার বাপের দুয়োরে বাইশ-বাইশটে হাতী বাঁধা, একখানা গাঁ জুড়ে যার বাড়ী, পাঁচ শ যার চাকর দাসী, সে এসেছে আমার এই কুঁড়েঘরে! আমার এ যে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, এ যে গরিবের দুয়োরে হাতীর পাড়া!

তাঁহার গৌরব-ঘোষণায় মণিমালা কুণ্ঠিত হইতেছিল। সে যে নিঃসম্বলে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, সে যে রাজার মেয়ে তাহার সেই নাম ছাড়া আর কোনো পরিচয় ত সে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে নাই; একজন সামান্য গৃহস্থ ভদ্রলোক যেমন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া তাহার মেয়েকে ঘর করিতে পাঠায়, তাহার রাজা বাবা যে তাহাকে তেমনও কিছু দ্যায় নাই। শুধু ভুয়া নামের পরিচয়ে লজ্জা ছাড়া ত আর কিছু লাভ নাই, অতএব তাহার বাপের বাড়ীর কথা না তোলাই ভালো। মণিমালা এখন আর রাজার মেয়ে বলিয়া নয়, এই বাড়ীর বৌ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলেই বর্ত্তিয়া যায়, তাহার সকল লজ্জা ঢাকা পড়ে।

রাজার মেয়ে বাড়ীতে আসিতেছে, নারাণদাসী মনে করিয়াছিল এইবার তাহাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে,—তাহাদের কুঁড়েঘর বালাখানা হইবে, ঘরসংসার সোনাদানায়

ভরিয়া যাইবে, দেউড়িতে নগদী ও অন্দরে দাসী চাকর গিশগিশ করিবে, নারাণদাসীকে আর নড়িয়া বসিতে হইবে না। তাই রাখাল ও মণিমালা তাহার বাড়ীতে আসিলে সেও তাহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল; আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিয়াছিল—বেশ করেছে রাখাল বৌ নিয়ে চলে এসেছে; আপনার বাড়ী ঘর আপ্ত জন থাকতে সে কোন্ দুঃখে পরের বাড়ী পড়ে থাকবে।

কিন্তু দুদিনেই সে দেখিল যে এ নামে তালপুকুর, তাহাতে ঘটী ডোবে না। তাহার লাভের মধ্যে এই হইয়াছে যে তাহার বাড়ীতে অসীম ধন দৌলত আসিয়াছে ভাবিয়া গ্রামের চোরেরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া নিত্য রাত্রে তাহার বাড়ীতে আনাগোনা আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার সংসারে তিন জন লোক বাড়াতে খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে নারাণদাসীর টিকলো নাকটা খড়্গের ন্যায় উপর দিকে অনেকখানি বাঁকা হইয়া উঠিয়াছিল। এবং সে কথায়-কথায় মণিমালাকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিত—গো ভাগ্যি নেই, এঁটুলি-ভাগ্যি খুব আছে!

নারাণদাসীর একটি ছেলে ছিল তাহার নাম গৌর। সে ভূপালের সহিত খেলা করিতে-করিতে খুনসুটি করিয়া কাঁদিলে বা কাঁদাইলে নারাণদাসীর সমস্ত সঞ্চিত ক্রোধটা সেই অবোধ শিশুর উপরে গিয়া পড়িত; তাহাকে দুড়দাড় করিয়া ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে চীৎকার

করিতে থাকিত—হতভাগা ছেলে! জানিসনে ও রাজার নাতি, নেহাল করতে এসেছে! গরিবের ছেলে তুই, এক পাশে আড়ষ্ট হয়ে থাক, তোর এত আস্পদ্দা কেন?

মণিমালা ভয়ে ও কুণ্ঠায় চুপ করিয়া থাকিত, একটিও কথা বলিত না। রাখাল নিষ্ফল দুঃখে পীড়িত হইয়া গৌরকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা করিত, ব্যথিত মণিমালাকে বলিত—মণি, দুদিন কষ্ট সয়ে থাকো, আমার একটা চাকরী হোক, তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব।

কিন্তু সে না শিখিয়াছে ভালো করিয়া ইংরেজি, আর না শিখিয়াছে ভাল করিয়া ফার্সী; তাহার যে কোথায় কি চাকরি জুটিবে তাহা সে ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

(২৫)

একদিন বৃন্দাবন মণিমালার সমবয়সী দুটি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া মণিমালাকে বলিলেন—নাতবৌ, এরা সব তোমার সমবয়সী, এদের কাছে লজ্জা কোরো না, তুমি এদের সঙ্গে আলাপ কর।

তাহাদিগকে মণিমালার কাছে বসাইয়া দিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন।

গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া অবধি এত বৌঝি এই কয়দিন তাহাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকিতেছিল যে মণিমালা তাহাদের কাহাকেও আলাদা করিয়া চিনিবার অবসরই পায় নাই।

আজ দুজনকে একান্তে পাইয়া মণিমালা দেখিল তাহাদের একজন বিধবা, তাহার মুখখানি ভারি সুন্দর, একটি শান্ত শ্রীতে মণ্ডিত, শ্রাবণ-রজনীর জ্যোৎস্নার মতো তাহাতে বিষাদ-করুণ ম্লানিমা যেন অশ্রুতে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে চাহিতেছে। আর-একটি মেয়ে কালো, কিন্তু তাহার সুন্দর নিটোল দেহে যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাসির চঞ্চলতা ঝলমল করিতেছে। ইহার হাতে কাচের সরু-সরু সবুজ চুড়ি, পরণে চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী, কপালে খয়েরের টিপ, নাকে ছোট্ট একটি সুন্দর রসকলি, মুখে পান, পায়ে আলতা, কিন্তু সধবার লক্ষণ মাথায় সিঁদুর কিংবা বাঁ-হাতে লোহা নাই।

মণিমালা তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা বিধবা তরুণীর হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি কি ভাই প্রসাদী ঠাকুরঝি?

তরুণীর ক্ষীণ হাসি অধরপ্রান্তে একটু উঁকি মারিয়া গেল; সে লজ্জিত মৃদু স্বরে বলিল—হ্যাঁ। তুমি কেমন করে চিনলে বৌ?

মণিমালা হাসিয়া বলিল—আমি ওঁর কাছে এতবার তোমার কথা শুনেছি যে আমার মনে তোমার একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেই ছবির সঙ্গে তোমার চেহারা ঠিক মিলে গেল।

প্রসাদীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া হাসিল।

মণিমালা প্রসাদীর হাতখানি ধরিয়া-থাকিয়াই বলিল—তোমাকে ভাই ঠাকুরঝি বলে আমার মন ভরবে না; তুমি আমার আরো আপনার; তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক পাতাব ভাই?

সুন্দর কালো মেয়েটি অমনি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—ওর সঙ্গে সতিন পাতাও ভাই; ওরও মনটা খুসী হয়ে যাবে, তোমারও খুব আপনার হবে।

তারপর সে সুন্দর করিয়া মিহি গলায় গাহিল—

শোনো ঠাকুরঝি লো তোমায় বলি,
আমি রাই রাজনন্দিনী,
তুমি শ্যামের চন্দ্রাবলী!

প্রসাদী তাহাকে এক চড় কষাইয়া দিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল—দূর পোড়ারমুখী!

কালো মেয়েটি আবার গান ধরিল—

আমি বটেই পোড়ারমুখী
ওগো বটেই পোড়ারমুখী!
তোমার মনের-মধ্যে সুখের হাসি
ওই যে মেরে যাচ্ছে উঁকি,
আমি বটেই পোড়ারমুখী!

বিব্রত প্রসাদীকে বাঁচাইয়া মণিমালা সেই রঙ্গিনীকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার এত রঙ্গ, তুমি কে ভাই?

রঙ্গরসিকা গাহিয়া জবাব দিল—

আমি রঙ্গময়ী রসবতী হাসির বেসাত করি,
মনের মানুষ পাইনি খুঁজে তাইতে দেশান্তরী।
মাথায় নিয়ে হাসির ডালা
লুকিয়ে বুকে অশ্রুমালা
স্বয়ম্বরের বরকে খুঁজে ঘুরে-ঘুরেই মরি !

মণিমালা হাসিতে-হাসিতে বলিল—তা ত তোমার রকম দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমায় ডাকব কি বলে ?

রঙ্গিনী গান ধরিল—

ওলো রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণপ্রেমের জোঁক,
তুমি চিনতে নার লোক ?
ওলো রাই রাজনন্দিনী ওলো ঠ্যাকারী,
আমি প্রেমের ব্যাপারী !
ওলো রাই রাজনন্দিনী, তোমার পায়ের দাসী,
বৃন্দে আমায় বলে লোকে, ব্যবসা আমার হাসি।

তারপর সে হাসিয়া গদ্য কথায় মধু মাখাইয়া বলিল—আমার নাম ভাই বিন্দি, আমার বাবা ছিলেন ডাকসাইটে কবিওলা, কীর্ত্তন-গাইয়ে; বাবা আমায় লেখাপড়া শেখাতেন, গান শেখাতেন, মুখে-মুখে ছড়া বাঁধতে শেখাতেন; কখনো আমার বিয়ের কথাও মুখে আনতেন না। বড় হয়ে উঠলাম, বাবা মারা গেলেন। এখন মায়ের মুখে শুনি আমার নাকি খুব ছোটবেলায় একটা

বিয়ে হয়েছিল। আমার বরটি ছিল পরম ভক্ত, তাই চট করে কেষ্ট পেলে! আমরা জাতে বষ্টম,—অনেক মিন্সে তিলক-ছাপার ফাঁদ পেতে কণ্ঠী বদল করে আমায় আবার ধরতে চায়; আমি ভাই ধরা দিইনে, কোন্ ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়ে আমার এমন হাসি বেঘোরে মাঠে মারা যাবে! আমি লোকের কাছে শুধুই হাসি; আর কান্না যেটুকু আছে তা রাধাকান্তর জন্যে লুকিয়ে রেখেছি, পাছে দেবতার জিনিসে মানুষের নজর লাগে!"

বিন্দির কণ্ঠস্বরে এমন একটা করুণ কান্নার সুর বাজিয়া গেল যে প্রসাদী ও মণিমালার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া বিন্দি হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

কিসের লেগে কাঁদব আমি, কাঁদব কিসের লেগে?
নিজের হাসি না জোটে ত আনব ভিক্ষে মেগে!
হাসির ফুলে জগৎ আলো
নাইক কোথাও কান্না কালো,
হৃদয় মেলে ধরলে পরেই আঁধার যাবে ভেগে।
আমি কাঁদব কিসের লেগে!

এ গান শুনিয়াও শ্রোত্রীদের মুখ প্রফুল্ল হইল না দেখিয়া বিন্দি উঠিয়া নাচিতে-নাচিতে গাহিতে লাগিল—

চরকী-বাজি হাসির আমি, হাসির ফুল্‌কি ছুটাই,
আনন্দেতে নৃত্য করে মনের আঁধার মিটাই।

তাহার রঙ্গ দেখিয়া মণিমালা ও প্রসাদী হাসিয়া কুটিকুটি

হইতে লাগিল। মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিন্দি ঠাকুরঝি, এত রঙ্গ তুমি শিখলে কোথায় ?

বিন্দি মণিমালার পাশে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

আমার মনটি শাদা, নাই যে বাধা,
তাইতে এমন রং ধরেছে ;
যে আসে, মোর সবাই আপন,
রঙ্গ্‌রাজ তাই মন ভরেছে।

মণিমালা এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটিকে দেখিয়া সবিস্ময় আনন্দে হাসিতেছিল। নারাণদাসী মহাপ্রসাদের বাড়ী হইতে তাস খেলিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো ও বড়মানুষের ঝি, অত হাসি কিসের ? বিন্দি পোড়ারমুখী এসে জুটেছিস বুঝি ?

বিন্দি হাসিয়া বলিল—হাঁ রাঙা-দিদি,

বিনা নিমন্ত্রণে আমি এসে জুটেছি,
আনন্দেরি ভোজে হাসি দেদার লুটেছি !

রাঙা বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আ মরণ !

বিন্দি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

মরণ আমার সতিন—বুড়ো যম-রাজার রাণী,
বরের ভাগ নিয়ে মোদের নিত্যি টানাটানি !

নারাণদাসী তর্জ্জন করিয়া মণিমালাকে বলিল—ওগো ও বড়মানুষের ঝি, তোমার রাজা বাবা ত দশটা দাসী

চাকর দ্যায়নি যে বসে বসে বিন্দি ছুঁড়ির রঙ্গ দেখলে চলবে? একটু গতর নাড়, একখান কুটো ভেঙে দুখান কর.........

মণিমালা হাসিমুখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করতে হবে রাঙা-দিদি?

নারাণদাসী তীব্র স্বরে বলিল—তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? বিধি কপালের ওপর দুটো চোখ দিয়েছিল কেন? দেখে শুনে করতে কম্মাতে পার না?... খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে আছ, রান্নাঘরটা নিকোতে হবে না, বাসনগুলো মাজতে হবে না?

—বাড়ীতে যত সব কুড়ে নবাবের বাথান হয়েছে! তাঁদের সেবা করতে-করতে আমার গতর মাটি, হাড় কালি হল!...... নারাণদাসী গজগজ করিয়া বকিতে বকিতে আবার বাড়ী হইতে পাড়া-বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

মণিমালা কোমরে আঁচল জড়াইয়া হাতের চুড়িবালা উঁচুতে তুলিয়া সমস্ত ঘৃণাকে জোর করিয়া দূর করিয়া দিয়া গোবর তুলিতে যাইতেছিল। প্রসাদী ও বিন্দি তাহার দুইহাত ধরিয়া পিছনে সরাইয়া দিয়া বলিল—তুমি থাক বৌ, আমরা করছি...

অপর বাড়ীর লোক আসিয়া তাহার কাজ করিয়া দিবে ইহাতে কুণ্ঠিত হইয়া মণিমালা বলিল—না না ভাই,

তোমরা বোসো, আমি এক্ষণি আসছি। তোমরা একদিন করে দিলে কি হবে ভাই, আমায় ত রোজ করতে হবে।

প্রসাদী হাসিয়া বলিল—তুমি কি এসব কাজ জানো যে করবে?

—না জানি শিখতে হবে ত।

বিন্দি বলিল—শেখবার দরকার? তুমি সব কাজ ফেলে রেখে দিও, বিন্দি পোড়ারমুখী রোজ করে দিয়ে যাবে।

প্রসাদী হাসিয়া বলিল—আর পেসাদী পোড়াকপালী তার পেটেল হবে।

বিন্দি বাসনের গোছা কাঁধে তুলিয়া ডোবায় মাজিতে গেল, প্রসাদী একটা ঘটীতে গোলা করিয়া রান্নাঘর নিকাইতে বসিল। আর মণিমালা কুণ্ঠিত হইয়া এই দুটি সদ্যপরিচিত সখীর যত্ন দেখিতে লাগিল। মণিমালা ছলছল চোখে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্ব্বাসনের সকল দুঃখ মুছিয়া রাখিবার জন্যই এই দুটি মেয়ে যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছিল। মণিমালার মন প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন সময় কাঙালীর মেয়ে কাত্যায়নী আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল—হ্যাঁ বৌ-দিদি, পেসাদী-দিদিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে বুঝি? আমি রাঙা-দিদিকে বলে দেবো!

প্রসাদী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—যা যাঃ! বলগে যা তোর

সাত কালের রাঙা-দিদিকে। রাঙা-দিদি এসে আমাদের শূলে দেবে আর তোকে পাহাড়পুরের রাজার রাণী করে দেবে!

কাত্যায়নী চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—কেন লা শতেকখোয়ারী, তুই আমাকে অমন করে বলবি—আমি কি তোর সঙ্গে কথা কয়েছি যে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলি! তোর মাকে বলে আমি ঝাঁটা না খাওয়াই ত আমার নাম নয়।

কাত্যায়নী ফরফর করিয়া চলিয়া গেল।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—বাবা, মেয়েটা ত কম ঝগড়াটে নয়!

প্রসাদীও হাসিয়া বলিল—উঃ ভয়ানক ঝগড়াটে! ওর মা বাবা ঐ রকম কি না, তা ও আর কত ভালো হবে।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—ওরা কারা?

প্রসাদী হাসিয়া বলিল—এই পাড়ারই। হাড়ে-হাড়ে চিনতে বেশী দেরী লাগবে না

(২৬)

প্রসাদী ঘর নিকাইয়া গোলার ঘটী মাজিতে ও বিন্দিকে সাহায্য করিতে ডোবায় চলিয়া গেল। নারাণদাসী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কাজ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সুখী হইল কিন্তু মণিমালাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

কতই তুমি জান ঠাট,
দাঁড়িয়ে যেন বৃষকাঠ।

একটু নড়োচড়ো, নইলে বাতে ধরবে যে।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা রাঙা-দিদি, তুমি অমন ঠেস পেড়ে-পেড়ে কথা কও কেন বল দেখি। কি করতে হবে সোজাসুজি বললেই ত হয়!

নারাণদাসী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—বাবা! দুধের সঙ্গে খোঁজ নেই, আবার চাট ছোড়েন! লোকে তাই কথায় বলে—

'কাঁচা মাটি কচি বৌ সাঁচা লক্ষ্মীমণি,
আনিলে জ্যাঠাই বৌ ঘটে ঠনাঠনি।'

মণিমালা তবু হাসিমুখেই বলিল—এত কথা বললে রাঙা-দিদি, কেবল কি করতে হবে সেইটিই এখনো বলা হল না।

নারাণদাসী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—গোবরগুলো পচছে, ঘুঁটে দিতে হবে না?

মণিমালা হাসিমুখে গোবরের গাদার কাছে গিয়া বলিল—রাঙা-দিদি, একটু দেখিয়ে দেবে এস না, কেমন করে ঘুঁটে দিতে হয় জানিনে।

নারাণদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ভ্যালা এক অকম্মার ঢিপি তুমি বাছা! বাপ মায়ে তোমায় এও শেখায়নি? শিখিয়েই যদি দেবো ত নিজে করলেই পারি?

মণিমালা লজ্জিত হইয়া বলিল—এক দিন দেখিয়ে দিলেই আমি শিখে নেব।

—ভ্যালা জ্বালাতন।—বলিয়া নারাণদাসী মণিমালার কাছে আসিয়া বলিল—আগে এই গোবরগুলো বেশ করে চটকে নাও, তারপর এক এক তাল হাতে তুলে গুলি পাকিয়ে দেয়ালে এমনি করে চাপড়ে দাও......

মণিমালা ঘুঁটে দিতেছে, আর তাহার অপটুতা দেখিয়া নারাণদাসী হাসিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিয়া তাহার লজ্জিত মুখখানি লাল করিয়া তুলিতেছে. এমন সময় বৃন্দাবন এক হাতে হুঁকা ঝুলাইয়া অপর হাতে একখানা কচুর পাতায় করিয়া চারটি চুনো মাছ লইয়া বাড়ী ঢুকিলেন। মণিমালাকে দিয়া ঘুঁটে দেওয়াইতে দেখিয়া বিরক্তি ও বেদনার স্বরে নারাণদাসীকে বলিলেন—রাঙা-বৌ, ও হচ্ছে কি! যার বাপের বাড়ী শ্বেত পাথরে ছাওয়া, একটু যে ধূলো মাড়াত না, তাকে দিয়ে তুমি গোবর ঘাঁটাচ্ছ? .....সর গো বাছা নাতবৌ, আমি তোমার হয়ে ঘুঁটে দিয়ে দিচ্ছি।—বলিয়া বৃন্দাবন উঠানে হুঁকা ও মাছ ফেলিয়া মণিমালাকে সরাইয়া নিজে ঘুঁটে দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল তাল তাল গোবর দেয়ালে না লাগাইয়া নারাণদাসীর মুখেই চাপড়াইয়া দ্যান; কিন্তু ততখানি সাহস তাঁহার ছিল না।

নারাণদাসী বৃন্দাবনের ব্যবহারে অপ্রতিভ হইয়া

তাঁহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নিজে ঘুঁটে দিতে লাগিল এবং স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া, কিন্তু কাহারও দিকে না চাহিয়াই, বলিতে লাগিল—নাত-বৌএর ওপর এত যদি দরদ তবে একজন দাসী রেখে দিলেই হয়, সে কাজ করবে, আর টাটে বসিয়ে নাতবৌএর চরণ পূজো কোরো !...

বৃন্দাবন তিরস্কারের প্রচুর সম্ভাবনা দেখিয়া হাত ধুইয়া রকের কোণ হইতে হুঁকাটি উঠাইয়া লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন।

তখন নারাণদাসী মণিমালাকে বলিল—ওগো বড়-মানুষের ঝি, মাছ বনাতে পার, না শুধু মাছ খেতেই পার ?

অমন চুনো মাছ মণিমালার বাপের বাড়ীতে কেহ খাইত না, ফেলিয়া দিত। মণিমালা হাসিয়া বলিল—দুইই পারি।

মণিমালা গোবরের হাত ধুইয়া বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিল। সে ঐ অতটুকুটুকু মাছগুলাকে লইয়া যে কি করিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা ও ভয় হইতেছিল।

মণিমালার ভাব দেখিয়া নারাণদাসী বলিয়া উঠিল—

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুইমাছ কাঁদে—
না জানি রাঁধুনী আমায় কেমন করে রাঁধে !

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোমাদের দেশের রুইমাছ-গুলি খাসা রাঙা-দিদি !

নারাণদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—

কাজেতে কাঁচা বচনে দড়
মগজে কাঁচ বয়সে বড়!
এলেন বৌ ধেড়েকেষ্ট
ইতোভ্রষ্ট ততনষ্ট!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদি, তুমি এত শোলোকও জান! এখন কথায়-কথায় শোলোক আওড়ানো রেখে আমায় একটু দেখিয়ে দেবে এস ত।

নারাণদাসী বাৎসল্যের স্বরে বলিল—না ভাই, রেখে দাও, তোমার গোসাঁইদাদা দেখলে আবার রাগ করবেন—তোমার চাঁপার কলি আঙুলে আবার আঁসটে গন্ধ হবে!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদির হাতের গোবরের গন্ধ শোঁকা গোসাঁইদাদার যদি সয় ত আমার হাতের আঁসটে গন্ধও সইবে!

—না ভাই, আমরা হলাম গিয়ে দুয়ো, আর তুমি হলে সুয়ো রাণী ভাগ্যিমানি! আমরা হলাম গরিবের ঘরের মেয়ে, আর তুমি হলে রাজার ঝি! তোমাতে আমাতে কি তুলনা!

নারাণদাসীর কথাগুলো ক্রমশ ঝগড়ার আকার ধরিতেছে দেখিয়া মণিমালা একটা কলসী কাঁখে তুলিয়া লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিল।

মণিমালা জল লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে, পথে বৃন্দাবনের

সঙ্গে দেখা। বৃন্দাবন বলিলেন—নাতবৌ, কলসী রাখ তুমি।

মণিমালা ঘোমটা টানিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন আবার জেদ করিয়া বলিলেন – নামাও কলসী।

পথের মাঝখানে আর আপত্তি করিতে না পারিয়া মণিমালা কলসী নামাইয়া দিল। বৃন্দাবন এক হাতে জলের কলসী ও অন্য হাতে হুঁকা ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ী চলিলেন; কুণ্ঠিত লজ্জিত মণিমালা পিছনে পিছনে চলিল।

বাড়ী আসিয়া নারাণদাসীর সামনে ধপাস করিয়া কলসী নামাইয়া বৃন্দাবন কণ্ঠস্বরে দমক দিয়া বলিলেন—এই নাও তোমার জল!

আজ বিপদ সঙ্গিন দেখিয়া মণিমালা বৃন্দাবনের সহিত কথা বলিল—জল আনতে রাঙা-দিদি বলেন নি, আমি নিজেই গিয়েছিলাম।

বৃন্দাবন চটা স্বরে বলিলেন—কেন যাও তুমি বাছা? ওতে লোকের কাছে আমার মুখ হেঁট হয় জানো? লোকে বলবে যে আমি কপিলা গাইকে দিয়ে লাঙল টানাচ্ছি, পক্ষীরাজ ঘোড়াকে দিয়ে ধান মাড়িয়ে নিচ্ছি! তুমি কী সুখে ছিলে তা কি আমি দেখিনি; তোমায় কাজ করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়, আমার বুকে বাজে।

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—শুনছ গো নাতবৌ দাদাশ্বশুরের দরদের কথা। তুমি পটের সুন্দরী

টাটে বসে থেকো, আমি বান্দরী বাঁদী আছি তোমাদের সাতগুষ্টির সেবা করব।

মণিমালা হাসিয়া নারাণদাসীর কাছে গিয়া চুপিচুপি বলিল—তবু যদি না নাম হত রাঙা-বৌ, আর গোসাঁইদাদা রাঙা বৌ বলতে না অজ্ঞান হতেন!

কথাটা বৃন্দাবন শুনিতে পাইয়া রাঙা-বৌএর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। রাঙা-বৌ মুখ গোঁজ করিয়া মাছ কুটিতে বসিল।

(২৭)

মণিমালার এ বাড়ীতে থাকা মুস্কিল হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন তাহাকে কাজ করিতে দেখিলে চেঁচাইয়া বকিয়া বাড়ী মাথায় করেন; আবার না করিলে নারাণদাসীর নখনাড়া ও খোঁটা সহিতে হয়। আবার তার উপর অধিকন্তু ছিল বিন্দি ও প্রসাদীর যত্নের উপদ্রব—তাহারা দাসীর মতো তাহার সমস্ত কাজ করিয়া দিবে মণিমালা ইহা সহ্য করিতে পারিত না, কুণ্ঠিত হইয়া কষ্ট বোধ করিত। তাহার উপর আর-এক বিপদ হইয়াছিল যে সে শাক্ত, সে অভ্যাসের দোষে তরকারী কোটা বলিত, বনানো বলিতে লজ্জা বোধ করিত; মাছের ঝোল বলিত, রসা বলিতে পারিত না; ইহাতে গ্রামের সকলেই তাহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত। সে শাক্ত বলিয়া ঠাকুরঘরের ভিতরে যাইতে পাইত না, ঠাকুরের ভোগের কিছু ছুঁইতে পাইত

না। এই-সমস্ত ব্যবহার মণিমালার কাছে অত্যন্ত অপমানের মনে হইত; সে এইজন্য ঠাকুরবাড়ীতেই যাইত না, যে তাহার হাতে না খায় তাহার হাতের রান্নাও সে খাইত না, ঠাকুরের প্রসাদ হইলেও না। তাহার এই অহঙ্কার দেখিয়া পাড়ার রসকলিগুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিত; রাধাকান্তর দালানে পা ছড়াইয়া বসিয়া হরিনামের মালার এক-একটি ঝুলি হাতে করিয়া পাড়ার গিন্নিরা নারাণদাসীর কথায় সায় দিয়া বলিত—শাক্তর আবার এমন অহঙ্কার! রাখালের আস্কারাতেই ত এমন হচ্ছে—বৌ নয় ত যেন মাথার মণি! আজকালকার ছেলেদের ঐ কেমন ধারা; মা-মাসিকে দেখতে পারে না, কিন্তু বৌএর কাছে একটি টুঁ শব্দ করবে না।

পাড়ার লোকেদের রাখালের উপর রাগ হইবার একটু কারণ ঘটিয়াছে। গিন্নিরা, যেহেতু তাঁহারা গিন্নি, নাকের ডগায় তিলক কাটিয়া একখানি ছোট খাদি কেঠে কাপড় পরিয়া ডান হাত হরিনামের মালার ঝুলির মধ্যে ঢুকাইয়া পাড়া-বেড়াইতে বাহির হন, ইহা রাখালের অসহ্য; কেহ কাহারও কুৎসা করিতেছে শুনিলে তাহার আর রাখালের কাছে নিস্তার নাই; গ্রাম্য কথা বলিলে রাখাল তাহা অশ্লীল বলিয়া বক্তাকে সাবধান করিয়া দ্যায়; কেহ ছেলেকে দিয়া তামাক সাজাইতেছে দেখিলে রাখাল তাহাকে তিরস্কার করে; কোনো ছেলে অসভ্যতা করিলে

বা লেখাপড়ায় অবহেলা করিলে রাখাল তাহাকে নিজের ছেলেরই মতন কড়া শাসন করে। ইহার ফলে এই হইতেছিল যে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ রাখালের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল—সকলে মনে করিতেছিল যেহেতু রাখাল বড়মানুষের জামাই সেহেতু সে সকলকে শাসন করিয়া বড়মানুষী জানাইয়া বেড়ায়। অথচ রাখালের পক্ষে ন্যায় এত প্রবল যে কেহ সাহস করিয়া তাহার উগ্র মতের প্রতিবাদ করিতেও পারিত না। মাত্র দেড় বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই যেন রাখালের এ গ্রামে স্বত্ব লোপ পাইয়াছিল, এখন সে যেন একজন উড়িয়া আসিয়া গ্রাম জুড়িয়া বসিয়াছে—তাহার প্রচণ্ড প্রতাপে তাহার চেয়ে বয়সে ও সম্পর্কে বড়ও যাহারা তাহাদিগকেও নত কুণ্ঠিত হইয়া ভয়ে-ভয়ে থাকিতে হয়।

এই সময় একদিকে কেশব সেনের ধর্ম্মসংস্কার ও বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার লইয়া সারা বাংলায় যে তুমুল নাড়া লাগিয়াছিল, তাহার ধাক্কা রাখালের ন্যায় তাজা বলিষ্ঠ মনকে সত্যের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল। রাখাল সংবাদ-পত্রে সংস্কার সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত। ইহাতে গ্রামের সেই-সমস্ত লোক, যাহারা নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর, সমস্ত ভাবনার ভার শাস্ত্রের ও ঋষিদের উপর দিয়া যাহারা নিশ্চিন্ত, যাহারা শুধু বাড়ীতে বসিয়া তামাক ও সময়ে-সময়ে গাঁজাটা চরসটা ফোঁকে ও দুপুর বেলা চণ্ডীমণ্ডপে

তাস পিটিয়া বিকাল বেলা মাছ ধরিয়া সময় কাটায়, সুযোগ পাইলেই পরনিন্দা করিয়া দলাদলি পাকায়, এবং এক-একবার খুব ঘটা করিয়া তিলকসেবা করিয়া তেকণ্ঠী মালা আঁটিয়া প্রবাসে বাহির হইয়া জেলেমালাদের পায়ের ধূলা দিয়া বার্ষিক আদায় করিয়া আনিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ভুঁড়ির তোয়াজ করে, তাহারা যখন শুনিল যে রাখাল ম্লেচ্ছদের দলে ভিড়িয়া তাহাদের সমর্থন করিতেছে, তখন তাহাদের তাসের আড্ডা সরগরম হইয়া উঠিল।

শেষ দানের উপর ফেরাই ইস্কাবনের বিবি জোরে মারিয়া কাঙালী শেষ পিট কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—রাখালকে আমাদের একঘরে করা উচিত—যে জাত মানে না, ঠাকুর-দেবতা মানে না, বিধবার বিয়ে দিতে চায়, তাকে একঘরে না করলে আমাদের ধর্ম্ম থাকবে না। ওর বড্ড বাড় বেড়ে উঠেছে, একটু দমন করাও দরকার।

কাঙালী উঠিয়া পড়িয়া খুব ঘোঁট করিয়া রাখালকে একঘরে করিবার জন্য দলে লোক টানিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় কাঙালীর ছেলেকে সুদানে যাইতে হইল—সে কমিসেরিয়টের কেরাণী ছিল।

এই দৈবগতিকে চক্রপরিবর্ত্তনে কাঙালী বেচারা একেবারে চুপ হইয়া গেল। কিন্তু যাহাদিগকে কাঙালী খোঁচা দিয়া-দিয়া উস্কাইয়া ধর্ম্ম ও জাতি রক্ষার সম্বন্ধে

অত্যন্ত সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল—হয় কাঙালী ছেলেকে ত্যাগ করুক, নয় আমরা কাঙালীকে একঘরে করব—ছেলে জাহাজে চড়ে সমুদ্র-পারে গোরা পল্টনের সঙ্গে ম্লেচ্ছ দেশে গেছে, তাকে নিয়ে ত সমাজে চলা যেতে পারে না।

কাঙালী প্রমাদ গণিল। রাখালকে জব্দ করিবে বলিয়া যে অস্ত্র সে এতদিন ধরিয়া সযত্নে শানাইয়া তুলিতেছিল তাহা যে তাহারই বধের কারণ হইবে তাহা সে মোটেই ভাবে নাই। দুর্দ্দৈব ইহাকেই বলে।

চিন্তিত কাঙালীকে ডাকিয়া রাখাল বলিল—দেখ কাঙালী-দা, তুমি কিছু ভেবো না; চুপ করে থাক; আপনিই সব গোলমাল থেমে যাবে। উমেশ ফিরে এলে আর-একবার হৈ চৈ হবে; তখনও কিছু বোলো না, দেখো সে আন্দোলনও শিগগির থিতিয়ে যাবে; যদি না যায়, এরা যদি উদ্যোগ করে তোমায় একঘরে করেই, তবে জেনো তুমি একঘরে হবে না, আমরা দুঘরে হয়ে থাকব, আমি তোমার দলে।

কাঙালী কৃতার্থ হইয়া বলিল—তোমার ভরসাই ত করি দাদা। আমি এই জন্যেই ত তোমায় বয়সে ছোট হলেও অত শ্রদ্ধাভক্তি করি। যখন গাঁয়ের লোক এককাট্ঠা হয়ে তোমাকে একঘরে করবে বলে বেঁকে বসল, তখন একা আমিই ত চারিদিক সামলে থামিয়ে রেখেছিলাম।

রাখাল শুনিয়া হাসিয়া বলিল—সেই জন্যেই ত দাদা আমি তোমায় কখনো ত্যাগ করতে পারব না।

(২৮)

মণিমালা দুপুর বেলা প্রসাদীদের বাড়ীতে গিয়া প্রসাদীর সহিত গল্প করিতেছিল। মণিমালা বিদ্যাসাগরের কথা তুলিয়া বলিল—অত বড় পণ্ডিত যখন বিধান দিয়েছেন তখন তুমি ভাই আবার বিয়ে কর না কেন? উনি বলছিলেন তোমার যদি মত হয় ত বিদ্যাসাগরকে বর ঠিক করতে চিঠি লিখবেন।

(প্রসাদী করুণ হাসি হাসিয়া বলিল—একটা বিয়ে না করলে বাপ-মায়ে ছাড়ত না, তখন অবুঝ ছিলাম, বুঝলেও লজ্জায় বেধেছিল, চুপ করে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু ভগবান আমার সতীত্ব রক্ষা করেছেন। এমন সামগ্রী ত হেলায় হারাবার নয়।)

মণিমালা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রসাদীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—সই, বল্ আমার সতিন হবি?

প্রসাদী শান্তভাবে করুণ হাসি হাসিয়া বলিল—মেয়েমানুষ অক্লেশে জীবন দিতে পারে, কিন্তু স্বামীর ভাগ দিতে পারে না। তুইও বৌ, আমাকে যা হবার নয় তা নিয়ে ঠাট্টা করিসনে!

প্রসাদীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

মণিমালা বলিল—ঠাট্টা নয় ভাই, আমি মন থেকেই

বলছি। ওর মনের এককোণে তোর জন্যে একটু ব্যথা লেগে আছে, আমি এত করেও সেটুকু দূর করতে পারিনি। তুই ত জীবনটাই মাটি করতে বসেছিস। আয় তুই, আমার স্বামীকে সুখী কর্, আমিও তোকে একেবারে আমার করে নি—তোর এমন প্রাণ-ঢালা ভালোবাসার ঋণ একটু শোধ করতে দে।

প্রসাদী গম্ভীর হইয়া বলিল—সে ঋণ কি এমনি অপমানেই শোধ করবি বৌ!

প্রসাদীর কথায় মণিমালা ব্যথিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। প্রসাদীর কাছে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল—প্রসাদী যেন তাহার কাছে অনেক বড় হইয়া উঠিল আর সে তাহার কাছে এতটুকু হইয়া গেছে—সে যেন ডিঙি মারিয়া দুহাত বাড়াইয়াও আর তাহার নাগাল পাইতেছে না।

হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ার মতো বিন্দি ঘরে আসিয়া মণিমালা ও প্রসাদী দুজনকে বাঁচাইয়া হাসিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—

ওলো তোর পোষা পাখীর যায় বুঝি যায় প্রাণ!
দুটো ব্যাধে ওত পেতেছে মারবে বলে বাণ!
রাঙা তেলাকুচোর টোপে
ফাঁদে পা সে দ্যায় বা লোভে,
তোমার বুলি ভুলি বুঝি শিখে আরেক তান!

মাথায় ও কোমরে হাত দিয়া ত্রিভঙ্গ ঠামের ঘুরণ নৃত্য বিন্দির আর থামে না। প্রসাদী হাসিয়া বলিল—আ মর পোড়ারমুখী, এতক্ষণ আড়ি পেতে শোনা হচ্ছিল বুঝি?

বিন্দি তাহাদের দুজনের সামনে হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া বলিল—হ্যাঁ ভাই, আড়ি পেতে শুনছিলাম,—কাঙালী বাঁড়ুয্যে কেনারাম বুড়োকে বলছে, কাত্যায়নীর সঙ্গে রাখালদার বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কেনা-বুড়ো অমনি মুড়ো গোঁপ চুমরে বললে—তার আর ভাবনা কি? তোমার মেয়ে যে সুন্দরী, তাতে রাখাল ত রাজি হয়েই আছে। ওরা রাখালদাকে গ্রেপ্তার করতে গেল, আমি ছুটে এলাম বৌকে খবর দিতে। ওলো, হাঁ করে বসে ভাবছিস কি? ছুটে যা, ডাকাত পলো বলে।

মণিমালার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—মরণ আর কি!

বিন্দি বলিল—সত্যি বলচি বৌ, কাঙালী বাঁড়ুয্যে আর কেনা-বুড়ো রাখাল-দাকে ভজাতে গেছে। পুরুষগুলো বড় লোভী, ওদের বিশ্বাস নেই। তুমি বাড়ী যাও।

মণিমালার কৌতূহল হইলেও বাড়ী ফিরিতে অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। রাখাল যদি মনে করে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া সে তাহাকে পাহারা দিতে আসিয়াছে। মণিমালা জোর করিয়া বলিল—কারো সাধ্য

নেই যে আমার স্বামীকে কেড়ে নেবে। একবার চেষ্টা করেই দেখুক না।

প্রসাদী ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া বলিল—কাঙালীদাদা কেন এ কাজ করতে যাচ্ছে জানিস বৌ? ওর ছেলে উমেশ বিলেত গেছে, ফিরে এলে একঘরে হবে ঠিক হয়েছে; উনি বলেছেন কাঙালীর দলে থাকবেন। পাছে তখন দলে না যান, তাই কাত্যায়নীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাজটা খুব পাকা করে রাখছে। কাঙালী-দাদা কৌশল আর মতলব ছাড়া একপা কখনো চলে না। বৌ, তোর সতিনের বড় সখ হয়েছিল—কাত্যায়নী তোর সতিন হবে, তোর মনোবাঞ্ছা খুব ভালো করে এত শিগগির পূর্ণ হতে চলল, তোর খুব খুসী হওয়া উচিত।

প্রসাদী হাসিতে লাগিল। মণিমালাও হাসিল, কিন্তু সে হাসি বড় শুষ্ক, যেন পরের কাছে ধার করিয়া চাহিয়া আনা।

বিন্দি বলিল—তোরা ভাই হাসতে পারছিস! আমার ত গা ছমছম করছে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারছিনে। আমায় দেখতে যেতে হল।

(২৯)

রাখাল দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া তাহার গ্রামের যত লোক যেখানে চাকরী করে তাহাদিগকে একটা চাকরী জোগাড় করিয়া দিবার জন্য চিঠি লিখিতেছিল। পাশে বসিয়া

গোর দাগা বুলাইতেছে। কেনারাম কাঙালীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া সেইখানে বসিল। রাখাল কাগজ দোয়াত সরাইয়া রাখিয়া সরিয়া বসিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল।

কেনারাম বলিল—ক্যাঙালীর মেয়ে কাত্যায়নীর জন্যে ক্যাঙালী একটি সুপাত্র খুঁজছে। আমায় ধরেছে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে...

রাখাল হাসিয়া বলিল—দাদা-মশায়, ঘটকালি-করা যে আপনার পেশা হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ ভাই, কুলীনের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া মহা পুণ্যের কাজ। তোমাদেরই ঠিক পালটি ঘর। তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম...

—আমার সন্ধানে ত কোনো পাত্র নেই।

—উনি তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করতে চান।

—উনি কি জানেন না যে আপনিই ঘটকালি করে এর আগে আমার একটা বিয়ে দিয়ে চুকেছেন।

—কুলীনের ছেলের একটা বিয়ে ত বিয়েই নয়। অন্তত-পক্ষে এক গণ্ডা না হলে হাতের জল শুদ্দু হয় না।.. আর ঐ হলুদবনের শেয়াল রাজাটা বুঝুক যে কুলীনের ছেলে অমনি তুয়ো-ভাত্তা করবার জিনিস নয়—খাঁটি সোনা, মুচড়ে-সুচড়ে ফেলে দিলেও তার দাম বিশ টাকা ভরি।

রাখাল হাসিয়া বলিল—না দাদামশায়, আমার নিজের

মূল্য সম্বন্ধে অত বড় ধারণা নেই। এখন দেখতে পাচ্ছি আমার যোগ্যতা এক কাণা কড়িরও নয়।

—বিয়ের যোগ্যতা তোমার ষোল আনাই আছে।

কাঙালী বলিল—আমার জাত রক্ষা তোমাকে করতেই হবে রাখাল।

রাখাল বলিল—আমি তোমার জাত মারব এমন পাষণ্ড আমায় মনে কোরো না কাঙালী-দা।

কেনারাম বলিল—মেয়েটি বেশ, যেন পটের সুন্দরী, দেখেছ ত তুমি।

—দেখেছি বলেই আরো দুঃখ হচ্ছে, যে, অমন সুন্দর মেয়েটিকে বাপ হয়ে ইনি কেমন করে যাকে-তাকে সঁপে দিতে চাচ্ছেন।

কাঙালী বলিল—জাত যায়, করি কি বল? আর তোমার মতন এমন খাঁটি কুলীন কোথায় পাব। আমাকে দয়া করতেই হবে। আমার একান্ন বিঘে ব্রহ্মত্তর জমি আছে; তোমায় লেখাপড়া করে যতুক দেবো। আমি এই পৈতে দিয়ে তোমার হাত জড়িয়ে দিচ্ছি, স্বীকার না করলে কিছুতেই খুলব না।

রাখাল হাসিয়া বলিল—বৃথা কষ্ট পাচ্ছ। ব্রহ্মত্তর অপহরণ করব এমন পাষণ্ড আমাকে ভেবো না কাঙালী-দা। ততক্ষণ অন্য কোথাও খুঁজলে কাজ দেখত। অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভে অপকর্ম্ম করতে পারে এমন লোকের অসদ্ভাব দেশে এখনো হয়নি।

রাখাল হাতের পৈতা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কাঙালী রাখালের হাত জোরে চাপিয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যদি রাজি না হও তা হলে আমি অভুক্ত ব্রাহ্মণ মনক্ষুণ্ণ হয়ে এই পৈতে ছিঁড়ে তোমায় শাপ দিয়ে যাব।

রাখাল পৈতার নাগপাশ হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া একটা মোটা বাঁশের লাঠি তুলিয়া বলিল—আর আমি এই নাদনা দিয়ে শাপের মুণ্ডপাত করে দেবো!

শাপের সহিত শাপুড়েরও মাথা ভাঙিবার আশঙ্কা করিয়া কেনারাম কাছা কোঁচা খুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। কাঙালীকেও ডাকিতে হইল না।

(৩০)

মণিমালা ও প্রসাদী কাহারও মুখে কথা নাই। দুজনেই শুষ্ক মুখে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, না জানি বিন্দি কি খবর আনে। হঠাৎ বিন্দি দমকা হাওয়ার মুখে শুকনো পাতার মতো হাসি ও গানের ঘূর্ণী তুলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া নাচিয়া গাহিয়া অস্থির হইয়া উঠিল—

"টোপ ধরেনা ঠুকরে বেড়ায়, ভেসে ওঠে ফাতার গোড়ায়,
প্রেমডোর কেবল এড়ায়, অঙ্গ জ্বলে হেরে তারে—".
পড়ল না সে চারে!

বিন্দির রকম দেখিয়া প্রসাদী ও মণিমালার মুখে হাসি ফুটিল। প্রসাদী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ?

বিন্দি হাসিতে লুটিতে-লুটিতে বলিল—

পরের ঘরে কাট্‌তে যে সিঁদ এসেছিল সিঁদেল চোরে,
লাঠির বহর দেখে শেষে মানে মানে পড়ল সোরে।

রাখাল-দার লাঠি ভাগ্যি কেনা-বুড়োর গোঁপের ঝোপে আটকে গেল, নইলে কাঙালীকে আজকেই প্রাণের কাঙাল হতে হত।...

প্রসাদী ও বিন্দি খুব হাসিতে লাগিল। মণিমালার মন স্বামীর দৃঢ়তা দেখিয়া গর্ব্বে আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

প্রসাদী হাসিতে-হাসিতে মণিমালাকে বলিল—আজকে কি প্রজাপতির ঘুম নেই? রঙিন ডানা মেলে কেবল ঘরে ঘরে ঘটকালি করে বেড়াচ্ছে? কেনা-বুড়ো গিছল তোকে সতিন দিতে, তুই এসেছিলি আমায় সতিন করতে...

এমন সময় প্রসাদীর মা আসিয়া বলিলেন—বৌমা, রাঙা-খুড়ি চেঁচাচ্ছে, তুমি বাড়ী যাও।

মণিমালা উঠিল। বিন্দি বলিল—চল বৌ, তোমার কিছু ভয় নেই, আমরা তোমার সান্ত্রী পাহারা সঙ্গে আছি।

কেনারাম ও কাঙালী চলিয়া গেলে রাখাল আবার চিঠি লিখিতে লাগিল। নারাণদাসী ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়া রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল, নাতবৌ কোথায় ?

—বোধহয় প্রসাদীর বাড়ী গেছে।

—ভ্যালা এক পাড়াবেড়ানি বৌ হয়েছে। অমন বৌএর মুখে খ্যাংরা মারতে হয়।

—রাঙা-দিদিমা, ভালো করে বললেই হয়। অত-বড় রাজার মেয়ে আমার জন্যে কতখানি দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করছে। তাকে একদিনও কি একটা মিষ্টি কথা বলতে নেই রাঙা-দিদিমা ?

—পড়ে পেলা ত সরে গলা ! শুধু রবই শুনি রাজার মেয়ে, রাজার মেয়ে ; দিদিশাশুড়ি বলে আমায়, কি মামা-শ্বশুর বলে গৌরকে একদিন একখানা সোনা রুপোর জিনিস কিছু দিয়েছে ? অঙ্গে ত সোনা রুপোর একটা ছড় লাগল না, মিষ্টি কথা কিসে বেরুবে ?

রাখাল হাসিয়া বলিল—আগে আমার চাকরী হোক, তারপর তোমায় বাউটি স্যুট গয়না গড়িয়ে দেবো।

নারাণদাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ গো হ্যাঁ—

কে যে কেমন দাতা
জানে তার জমাখরচের খাতা।

এই যে তিন-তিনটে প্রাণী বসে-বসে খাচ্ছ, উপুড়হস্ত করবার নামটি নেই, তার আবার বাউটি স্থট গয়না দেবেন !

শূন্য কথার মূল্য কি,
রয়েছে ভাঁড় নেইক ঘি !

—কেন রাঙা-দিদি, মণি ত মাসে মাসে দশটাকা করে দ্যায়।

—শুনতে দশ টাকা ! তিন-তিনটে লোকের খাওয়া দশটাকায় হয় ?

—সজনের শাগ সেদ্ধ ভাত খেতে ওর চেয়ে ত বেশী খরচ পড়বার কথা নয়।

আর যায় কোথায়। নারাণদাসী চীৎকার করিয়া উঠিল—তোমার রাজা শ্বশুর ত আমাদের হুণ্ডি বেঁধে দ্যায়নি যে নিত্যি ক্ষীর সর নবনী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খাওয়াব ! এতে যার মন না ওঠে সে নিজের ব্যবস্থা নিজে করলেই ত পারে ; আমার ওপরে পিণ্ডি রাঁধবার ভার দেওয়া কেন......

গণ্ডগোল বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া রাখাল আস্তে-আস্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। গৌরও অমনি সেলেট ফেলিয়া বাহির হইল। রাখাল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—গৌর, কোথায় যাচ্ছিস ? লিখলিনে।

গৌর বলিল—মা বলেছে লিখতে হবে না।

—পাজি ছেলে, মা বলেছে লিখতে হবে না! চ লিখবি।—বলিয়া যেই রাখাল তাহার হাত ধরিল অমনি গৌর ভ্যাঁ করিয়া চীৎকার করিয়া মাকে জানাইয়া দিল যে ভাগ্‌নে তাহাকে মারিয়াছে।

নারাণদানী রায়বাঘিনীর মতো গাঁক করিয়া আসিয়া পড়িয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে ড্যাকরা, এমনি করেই কি শত্রুতা সাধতে হয়?—আমার ওপর রাগ করে কচি ছেলেকে মার!

রাখাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আমি ত ওকে মারিনি রাঙা-দিদিমা, শুধু পড়তে বলতেই কেঁদে উঠল।

—কারো অত আত্তি করে পড়তে বলতে হবে না. ওর বাপ-পিতমরা কত লেখাপড়া শিখেছিল যে ও শিখবে? যাদের পরের গোলামী করে খেতে হবে তারা লেখাপড়া শিখুকগে; আমাদের পায়ে কড়ি! ও আমার কত দুঃখের ধন, ওকে পড়ার জন্যে বক্‌লে মারলে আমি ওকে বুকে করে কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এই কথার পর গৌরকে পড়াইবার দুরাশা রাখালকে ত্যাগ করিতে হইল।

মণিমালা বাড়ী আসিয়া সব শুনিয়া রাখালকে বলিল—দেখ আমরা নিজের খেয়ে পরে এঁদের কাছে চোর হয়ে আছি! রাত দিন এই খিটিমিটির চেয়ে ভিন্ন হওয়া ভালো।

রাখাল স্ত্রীর এই কথায় অত্যন্ত রাগিয়া বলিল—এমন কুপরামর্শ দিতে তোমায় কে শেখালে? যাদের খেয়ে আমি মানুষ, তাদের একটা কথায় আমি ভিন্ন হব? ফের যদি অমন কথা মুখে আন, ত আমি তোমার মুখদর্শন করব না।

মণিমালা লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল—ইহাদের ত ঢের খাইয়াছ! অর্দ্ধেক দিন উপবাসে কাটাইতে হইয়াছে; অর্দ্ধেক দিন দিদিমার ভিক্ষা আর মুখের গ্রাস খাইয়া প্রাণ ধারণ হইয়াছে! পৈঁতাটাও দিয়া দিল গাঁয়ের অন্য লোক! কটুকথার ঋণ কি কিছুতেই শোধ হইবার নহে!

(৩২)

নারাণদাসীর বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন রাখাল একটা চাকরীর জন্য দেশবিদেশের পরিচিতদের খোসামোদ করিয়া চিঠির পর চিঠি লিখিতেছিল, তখন একদিন সুযোগ তাহার ঘরের দ্বারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন একখানা বজরা আসিয়া গোসাঁইগঞ্জের ঘাটে লাগিল; তাহার চড়নদার একজন ইংরেজ। একে বজরা তায় ইংরেজ-সওয়ারী,—দেখিবার জন্য ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ গঙ্গার ঘাটে মেলা লাগাইয়া তুলিল। কেবল যায় নাই মণিমালা—তাহার বাপের অমন কত বজরায় সে নদীতে-নদীতে বেড়াইয়াছে, কত ইংরেজ তাহার বাপের দরবারে

আসা-যাওয়া করিয়া থাকে। আর যায় নাই রাখাল—পাহাড়পুরে শ্বশুর-বাড়ীতে সে বজরা ও ইংরেজ দেখিয়াছে ও বটে, আর তাহার সামান্য বিষয়ে চঞ্চল হইয়া উঠা স্বভাব নয় বলিয়াও বটে। পাড়ার লোকেদের কাছে ইহা কিন্তু অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। সকলে যখন দেখিল যে তাহারা দুজন ছাড়া সবাই আসিয়াছে তখন কাঙালী বলিয়া উঠিল—রাজাগিরির গরম!

ইংরেজটি বজরার সামনে দাঁড়াইয়া ডাঙার লোকদের জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের এখানে ফার্সী-জানা লোক আছে?

ফার্সী? নিজের ভাষা বাংলাই পড়িতে জানে না কেহ, তার আবার কোন্ সাত সমুদ্র তের নদীর পারের ভাষা ফার্সী পড়িতে পারিবে কে? সকলে ভাবিয়াই খুন। কেনারাম একটু ভাবিয়া বলিল—দুর্গাগতি জান্‌ত বটে, কিন্তু সে ত মরে গেছে!

কাঙালী পিছন হইতে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া খুব লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—হাঁ হজুর, আছে একজন। রাখাল ফার্সী জানে।

অমনি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ! রাখাল জানে বটে!

ইংরেজটি বলিল—আমাকে কেউ অনুগ্রহ করে রাখাল-বাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারেন, আমার একটা জরুরি চিঠি পড়াতে হবে।

কাঙালী আবার সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর কেন কষ্ট করে যাবেন, আমি গিয়ে রাখালকে ডেকে আনছি। আপনি ডাকছেন খবর পেলেই সে ছুটে আসবে।

ইংরেজটি ঠোঁটে একটা চুরুট চাপিয়া দেশালাই জালিয়া ধরাইতে লাগিল। কাঙালী রাখালকে ডাকিতে ছুটিল।

বিন্দি মণিমালার কাছে গিয়া যখন গাহিতেছিল—

আজগুবি এক সং এসেছে নদের বাজারে,
টুপির ওপর চৈতন তার নাইকো কাছারে।

—তখন কাঙালী শশব্যস্তে আসিয়া রাখালকে বলিল—রাখাল, রাখাল, তোমাকে একজন সাহেব ডাকছেন, ঝপ করে এস।

রাখাল বসিয়া পড়িতেছিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আমার কাছে সাহেবের কি দরকার? সাহেব কোথায়?

কাঙালী রাখালের উদাসীনতায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সাহেব গঙ্গার ঘাটে, বজরায়! ডাকছেন! চট্ কোরে এস!

রাখাল বলিল—তাঁর দরকার থাকে তাঁকে এখানে আসতে বলগে। আমার দরকার থাকলে আমি যেতাম।

কাঙালী ভয়ে আধমরা ও অবাক হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল—রাখালকে লইয়া যাইতে পারিল না বলিয়া যদি সাহেব রাখালকে হাতের কাছে না পাইয়া তাহাকেই

বুটসুদ্ধ লাথি কষাইয়া দ্যায়! কাঙালীর মারীচের দশা উপস্থিত। সে ভয়ে-ভয়ে গিয়া শুষ্ক-মুখে সাহেবের সম্মুখে একটু তফাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল-বাবু আসছেন ?

ঠোঁট চাটিয়া আমতা-আমতা করিতে-করিতে ব্যাপারটা নিজের পক্ষে যথাসম্ভব নিরাপদ করিয়া লইয়া কাঙালী বলিল—আজ্ঞে সে একটা আকাট গোঁয়ার! বলে কিনা যে সাহেবের দরকার থাকে সে আসবে, আমার ত দরকার নয় যে আমি তার কাছে যাব! তার এই গোঁয়ার্তুমি আর দেমাকের জন্যে আমাদের কারো সঙ্গে তার বনে না হুজুর।

ইংরেজটি হাসিয়া বলিল—আমাকে তাঁর কাছে আপনি অনুগ্রহ করে নিয়ে চলুন।

সাহেব রাখালকে এতলোক হইতে একটু স্বতন্ত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু কাঙালী মনে করিল সাহেব রাখালকে দেখিতে চাহিতেছে তাহাকে মজা দেখাইয়া দিবার জন্য! সে ভয়ে জড়সড় হইলেও মনের মধ্যে আনন্দে ফুলিতেছিল, এইবার রাখালের সকল অহঙ্কার সকল লোকের সাক্ষাতে সাহেবের বুটের আঘাতে ধূলায় চূর্ণ হইয়া পড়িবে!—এ যে তাহার অসহ্য আনন্দ! সে মনে মনে মানত করিতেছিল—হে ঠাকুর! হে রাধাকান্ত! হে দর্পহারী মধুসূদন! রাখালের

যেন উপযুক্ত শিক্ষা হয়! আমি তোমায় ঘৃত-পরমান্ন ভোগ দিব। হরিরলুট দিব!

কাঙালী পথ দেখাইয়া আগে-আগে চলিল এবং অনেক লোক ভিড় করিয়া সাহেবের পিছু লইল। গ্রামে ঢুকিতেই অপরিচিত পোষাকের লোক দেখিয়া কুকুরগুলা ঘেউঘেউ শব্দ জুড়িয়া দিল। এবং পথের দুধারি লোক খুব নত হইয়া হইয়া তাহাকে সেলাম করিতে লাগিল।

কাঙালী ইংরেজটিকে বৃন্দাবন গোসাঁইর সদর দরজায় দাঁড় করাইয়া পুনরায় আসিয়া রাখালকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—কি রকম লোক বল দেখি তুমি রাখাল! সাহেব আসছে তা তুমি একটু বাইরে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারনি। এই অহঙ্কারে তুমি বিপদে পড়বে দেখছি। এস, এস, ঝপ্ করে এস...

বৃন্দাবন গোসাঁইর বাড়ীর সম্মুখে সাহেবকে দেখিয়া গাঁয়ের সকল লোক জড়ো হইল; সাহেবের আগমনের কারণ যাহারা জানে না, শুধু রাখালের সন্ধানে সাহেব আসিয়াছে শুনিয়াই তাহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল—রাখাল খবরের কাগজে লেখে বলিয়া সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। ইহা কল্পনা করিয়া অনেকে বেশ একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিল।

বাহিরে আসিয়া রাখাল খুব সহজভাবে সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। সাহেবও খুব প্রীতির সহিত তাহার

হাত ধরিয়া শেকহ্যাণ্ড করিল। এতক্ষণ এত লোক দূর হইতে নুইয়া নুইয়া তাহাকে সেলাম করিতেছিল; আর এই একটা লোক তাহার নিকটে আসিয়া তাহার সমান হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল; ইহাতে সাহেব রাখালকে ভালো করিয়া জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

রাখাল বিনীতভাবে ইংরেজিতে বলিল—আমার কাছে আপনার কাজ আছে শুনলাম; আমি সাধ্যমত আপনার সাহায্য করতে পারলে সুখী হব।

সাহেব বলিল—আমি শুনলাম আপনি ফার্সী জানেন। আমার কাছে একখানা উর্দু চিঠি এসেছে, জরুরি; মুন্সি আমার সঙ্গে নেই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে পড়ে দ্যান একটু।

—নিশ্চয়; খুসী হয়েই পড়ে দেবো। আপনি অনুগ্রহ করে বাড়ীর ভিতরে এসে বসুন।

রাখাল সাহেবকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া নিজের মেটে-ঘরের দাওয়ায় একটা মোড়া পাতিয়া বসাইল। তারপর তাহাকে চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাখাল সেই চিঠি হইতে বুঝিল সাহেবের নাম রাইলী। ইনি উনাউ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট।

রাখালকে রাইলী অনেক ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল —আপনি কি কাজ করেন?

—আমি কোনো কাজই করি না।

—ওঃ! আপনার জমিদারী আছে বুঝি?

রাখাল খুব স্বচ্ছন্দে হাসিয়া বলিল—জমিদারী থাকলে কি এই রকম বাড়ী হয়? আমার কোনো সঙ্গতিই নেই।

রাইলী লজ্জিত হইয়া বলিল—আমাকে মাপ করবেন, আমি কথাটা না ভেবেই বলে ফেলেছিলাম। আমি শুনছিলাম যে গোসাঁইগঞ্জের ব্রাহ্মণেরা গুরুগিরি করে। গুরুরা প্রায়ই বড়লোক হয়, আমি তাই ভেবে বলেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল—এতে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? দারিদ্র্য স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই।

গাঁয়ের মধ্যে কাঙালী একটু ইংরেজি বুঝিত। কাঙালী তাড়াতাড়ি বলিল—হুজুর, ওর শ্বশুর পাহাড়পুরের রাজা!

রাইলী আশ্চর্য্য হইয়া রাখালকে বলিল—তবে আপনি সেখানে থাকেন না কেন?

—আমি তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করেছি, তাঁর জমিদারীকে ত করিনি। শ্বশুরের জমিদারীর চেয়ে নিজের দিনমজুরীর সম্মান ঢের বেশী আমার কাছে।

রাখালের প্রতি শ্রদ্ধায় রাইলীর মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—তবে আপনি নিজে কোনো কাজকর্ম্ম করেন না কেন?

—পাইনি বলে। পাবার চেষ্টা করছি।

—আমাকে যদি অনুমতি করেন ত আমি একটা কথা বলতে চাই।

—কি বলুন।

—আমি উনাউ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট......

—তা আমি চিঠি থেকেই টের পেয়েছি।

একটা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট! তাহার সহিত রাখাল এমন নির্ভয়ে সমানী হইয়া কথা কহিতেছে দেখিয়া কাঙালীর হৃৎকম্প হইল। এবং কাঙালী যখন সেই কথাটা প্রভুপাদ-দিগকে বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিল তখন তাঁহারা মধুসূদন নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

রাইলী বলিতে লাগিল—আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে ছুটি নিয়ে নদীতে-নদীতে বেড়াচ্ছি। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আমি কলকাতা গিয়েই উনাউ ফিরব। মাসখানেক পরে আপনি যদি অনুগ্রহ করে উনাউ গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন ত আমি বিশেষ খুসী হব। আপনি আজ আমার যে উপকার করেছেন তার সামান্য একটু প্রতিদান আপনার গুণমুগ্ধ বন্ধুর কাছ থেকে নিতে আপনি অস্বীকার করবেন না আশা করি।......এই আমার নামের কার্ড।

রাখাল কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত চিত্তে ধন্যবাদ জানাইয়া উনাউ যাইতে স্বীকার করিল। তারপর হাসিতে-হাসিতে

বলিল—আমাদের নিয়ম, বন্ধু বাড়ীতে এলে তাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় দিতে হয়।

রাইলী হাসিয়া বলিল—আমার শরীর খারাপ, আমি কিছু এখন খাব না। আপনি কিছু ফল দিলে আমি সঙ্গে করে বজরায় নিয়ে যেতে পারি।

রাখাল রবয় দুলেকে ডাকিয়া এক কাঁদি কলা ও এক কাঁদি ডাব পাড়িয়া সাহেবের বজরায় পৌঁছাইয়া দিতে বলিল। এবং এবার সে নিজে সাহেবের সঙ্গে-সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে বজরা পর্য্যন্ত গেল।

গ্রামময় রাষ্ট হইয়া গেল—রাখাল কি রকম সস্তায় কিস্তি পাইয়া গিয়াছে! আজকালকার এই মহার্ঘ চাকরীর বাজারে এমন সহজে চাকরী বাগানো বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সাহেবের সুনজরে যখন পড়িয়াছে তখন অন্তত ত্রিশ চল্লিশ টাকার একটা কেরানীগিরি ত পাইবেই! কিন্তু ইহাতে কেহই আশ্চর্য্য হইল না, কারণ সকলেরই বিশেষ রকম জানা ছিল লোকটার কি রকম পাতাচাপা কপাল! রাজার বাড়ী বিবাহ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঙালীর ভারি আপশোষ হইল যে সে-ই রাখালের খবর দিল, পরিচয় দিল, পথ দেখাইয়া লইয়া গেল, অত করিয়া হুজুর হুজুর করিয়া সেলাম করিল, কিন্তু সাহেব তাহাকে একবার পুছিলও না। ইংরেজদের এমনিই অবিচার বটে! বাঁচিয়া থাকিত দুর্গাগতি খুড়ো,

সে দেখিয়া লইত রাখাল কেমন করিয়া এমন ফাঁকি দিতে পারিত। দুর্গাগতি খুড়োর কাছেই সে সাহেবকে লইয়া যাইত! কাঙালী আপশোষ করিয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সী পড়ে তাঁতি,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন শল্য সেনাপতি,
আর সূর্য্য তারা চন্দ্র গেল জোনাকির পিছে বাতি!—

এযে তাই হল দেখছি। আগে সাহেবকে দেমাক করে খাতিরই করা হল না; আর যাই দেখলে যে ম্যাজিষ্ট্রেট, অমনি খাতির দেখে কে! চাকরীটি বাগিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে হেঁইগো হেঁইগো করতে-করতে সাহেবের বজ্‌রা পর্য্যন্ত যাওয়া হল, কিন্তু আগে বাড়ীর বাইরে এসেও একটু অভ্যর্থনা করতে পারেন নি!

একটা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব যে এমন-একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ লোককে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া গেল ইহাই সব চেয়ে কাঙালীর কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল

তখন স্বামীর গর্ব্বে উৎফুল্ল মণিমালার কাছে হাসিতে-হাসিতে বিন্দি কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের রামায়ণ হইতে সুর করিয়া বলিতেছিল—

"পরম দয়ালু রাম গুণের নাহি সন্ধি।
যাঁর গুণে বনের বানর হয় বন্দী॥

বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
বানরের মিতালিতে বদ্ধ নারায়ণ॥"

নারাণদাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া মণিমালার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—হাজার হোক রাজার মেয়ে, সতীলক্ষ্মী ভাগ্যিমানী! তোমার পয়েই আমার রাখালের এমন কল্যেণ হল নাতবৌ! আহা নাতবৌ, দেখছ না, ভূপাল যে ধূলো ঘাঁটছে! ষাট-ষাট বাছারে!—বলিয়া ভূপালকে কোলে তুলিয়া নারাণদাসী আঁচল দিয়া তাহার গায়ের ধূলা মুছাইতে লাগিল।

মণিমালা উঠিয়া নারাণদাসীর পায়ের ধূলা লইয়া হাসিভরা ছলছল চোখে বলিল—রাঙা-দিদি, আশীর্ব্বাদ কর ওঁর যেন ভাবনা ঘোচে।

—তা তুমি বলবে তবে আশীর্ব্বাদ করব নাতবৌ? নিত্যি রাধাকান্তর কাছে মানত করি যে আমার রাখালের বাড়বাড়ন্ত হোক, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। আমার গৌর আর রাখাল ত ভিন্ন নয়, বরং আগে রাখাল পরে গৌর।......কিন্তু বলে রাখছি নাতবৌ, পেরথম মাসের মাইনে থেকে আমার গৌরকে একখানা সোনার কিছু গড়িয়ে দিতে হবে বাছা।

—উনি যে খরচ পাঠাবেন তা গোসাঁইদাদার কাছেই পাঠাবেন; সব তোমাদেরই ত রাঙা-দিদি! তোমরাই আমার ভুপালকে দেখো। ভূপাল আমার বড় গরিব!—মণিমালার স্বর অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

নারাণদাসী ভূপালকে বুকে চাপিয়া বলিল—বালাই-বালাই ষাট! ও রাজার নাতি! আমাদের বক্ষের ধন, চক্ষের মণি! তবে গৌর দাদা, এ ভাই।

বিন্দি সমস্ত আঁচলটা মুখে গুঁজিয়া দিয়া এক ছুটে প্রসাদীর কাছে গিয়া লুটাইয়া পড়িল।

প্রসাদী বলিল—আ মর! কি হল তোর?

বিন্দি একটু দম লইয়া গাহিল—

সোনা-ব্যাং আর সোনা-পোকার যখন নামই দামী
সোনা-ব্যাঙের হার করিব সোনা-পোকার থামি!
কনক-ধুতরা কনক-চাঁপা
হবে আমার হারের ঝাঁপা,
সোনা রূপো নইলে সবই তুচ্ছ করি আমি!

(৩৩)

রাখাল পশ্চিমে গিয়াছে।

মণিমালার কাছে যে কয়েকখানা রূপার বাসন, মোহর, পুরানো টাকা ছিল তাহা বেচিয়া তাহা হইতে এক শত টাকা নারাণদাসীর হাতে দিয়া রাখাল বলিয়াছিল—রাঙা-

দিদি, আমি যতদিন না সেখানে বেশ গুছিয়ে বসছি, ততদিন এই টাকাতে তোমাদের খরচ চলবে, তারপর আমি মাসে মাসে খরচ পাঠিয়ে দেবো। মণি আর ভূপাল রইল, ওদের তুমি দেখো।

নারাণদাসী টাকাগুলি বাক্সয় রাখিতে রাখিতে বলিয়াছিল—তুমি বলবে তবে দেখব, নইলে দেখব না? ওরা যে আমার মাথার মাণিক; তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, ওদের যেখানে ঘাম পড়বে আমার রক্ত সেখানে পড়বে জেনো।

রাখাল এমনি করিয়া প্রদাসী ও বিন্দিকেও মণিমালা ও ভূপালের খবরদারী করিতে বলিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে।

একদিন নারাণদাসী ও মণিমালা খাইতে বসিয়াছে, বিন্দি আসিয়া দূরে বসিল। বসিয়া-বসিয়া দেখিল মাত্র কাঁচা-কলা সিদ্ধ, সজনের শাক শড়শড়ি, কলায়ের ডাল ও কুলের অম্বল রান্না হইয়াছে। বিন্দি মণিমালার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

কচু-সেদ্ধ কলা-পোড়া
খাচ্ছ তুমি আগা-গোড়া,
আছ আনন্দে।
তার সঙ্গে জলপানিটে
ঝাল কথা আর কালসিটে,
নিত্য ত্রিসন্ধ্যে!

নারাণদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখ্‌ বিন্দি পোড়ারমুখী, তুই যদি ফের আমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোবি ত তোকে ঝাঁটাপেটা করব! বেরো আমার বাড়ী থেকে...

বিন্দি হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদি-ঠাকরুণ—

গেরস্ত মারে কোস্তা ঝাঁটা।
বেরাল ভাবে মাছের কাঁটা!

তুমি ঝাঁটা মারবে, আমি মনে করব আমায় আদর করছ। আমায় কি তুমি তাড়াতে পারবে মনে করেছ?

'মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো।
বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো॥'

এই অপ্রিয় ঘটনায় মণিমালা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার যে কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে ইহা সে কাহাকেও জানাইতে চায় না।

তাহাকে অব্যাহতি দিয়া প্রসাদী একখানি রেকাবিতে করিয়া কতকগুলি তরকারি আনিয়া নারাণদাসীর পাতের কাছে রাখিয়া বলিল—রাঙা-দিদি, মা তোমাকে এই তরকারি পাঠিয়ে দিলে।

মণিমালা ও বিন্দি বুঝিল যে ইহা প্রসাদীর মা রাঙা-দিদিকে পাঠান নাই, পাঠাইয়াছেন মণিমালাকে।

নারাণদাসী বলিল—ও আর এঁটো করিসনে পেসাদী,

রান্নাঘরের তাকে তুলে রেখে দে, বিকেল বেলা গৌর খাবে।

প্রসাদী বলিল—এত তরকারী কি গৌর খেতে পারবে, তোমাদেরও একটু-একটু দি—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রসাদী নারাণদাসীকে অল্প ও মণিমালাকে বেশী-বেশী করিয়া দিয়া অল্প-কিছু রান্নাঘরের তাকে তুলিয়া রাখিয়া দিল। নারাণদাসী মুখ গোঁজ করিয়া খাইতে লাগিল, কাহারো সহিত আর একটি কথাও বলিল না।

মণিমালা আঁচাইয়া ঘরে আসিয়া প্রসাদী ও বিন্দিকে বলিল—তোমরা ভাই আমাকে যত্ন আত্তি কর কেন, ওতে রাঙা-দিদি যে বিরক্ত হন।

বিন্দি সুর করিয়া শ্রীধর কথকের গান ধরিল—

"যতনে যাতনা দিবে আগে সখী জানি না।
যাতনা হবে জানিলে যতন করিতাম না॥"

মণিমালা বিষণ্ণ হইয়া বলিল—না ভাই, হাসির কথা নয়। আমার জন্যে শুধু-শুধু তোমরা সুদ্ধু গাল খাও। তোমাদের হাতে ধরে বলছি, তোমরা যখন-তখন আমার কাছে এস না।

বিন্দি গাহিয়া উত্তর দিল—

"কি করে লোকেরি কথায়?
সে যে আমার প্রাণধন, মন যারে চায়।

উপজিলে প্রেমনিধি
নিষেধ না মানে বিধি,
মনপ্রাণ নিরবধি তারি গুণ গায় ॥'

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোকে পারবার জো নেই।

ক্ষণিকের বিষণ্ণতা কাটিয়া গেল। তিন সখীতে আবার হাসি গল্পে গানে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় বৃন্দাবনের নামে এক মনিঅর্ডার ও চিঠি এবং মণিমালার নামে এক পত্র আসিল। রাখাল পাঠাইয়াছে। রাখাল বৃন্দাবনকে লিখিয়াছে, সেখানে গিয়া সে মুন্সরিমের পদে নিযুক্ত হইয়াছে; এক বৎসর পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে থাকিতে হইবে, পরে একটা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে একশত টাকা হইবে। বেতন বৃদ্ধি হইয়া চারি শত পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। সাহেবকে সে উর্দ্দু পড়ায়; তাহার জন্য সাহেব তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে চাহিয়াছিলেন, সে লইতে অস্বীকার করিয়াছে। ত্রিশ টাকা পাঠাইতেছে; পনর টাকা বৃন্দাবন লইয়া বাকী পনর টাকা যেন মণিমালাকে দ্যান।

নারাণদাসী চিঠি শুনিয়া ত চটিয়া আগুন!—এমন সায়েবের মুয়ে আগুন। বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেল, আমরা মনে করলাম পাঁচ সাত শ টাকার একটা চাকরীই দেবে বা! ওমা, এ দেখছি—

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে
তার মাইনে চোদ্দসিকে !

আবার আমাদের রাখাল-বাবু রাজার জামাই কিনা, তাঁর আবার এমনি বড়মানুষী যে সায়েব টাকা দিতে চায় কিন্তু তাঁর নেওয়া হয় না ! মাইনে ত মোটে পঞ্চাশটি টাকা ! তার কুড়ি টাকা রাখলেন নিজে, বৌকে দেবার হুকুম হল পনর, আর এতবড় সংসারটার খরচ দেওয়া হল পনর ! এইতেই আবার পাড়ার পোড়াকপালীরা বলতে আসে যে বৌকে কচু-সেদ্ধ কলা-পোড়া খাওয়াও কেন ? ঐ যে পায় সেই ঢের !

বিন্দি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—হ্যাঁ রাঙা-দিদি, ঠিক বলেছ ! তুষ্টু গয়লাও বলছিল, আমরা জল-দেওয়া দুধ বেচি বলে' লোকে দাম দিতে চায় না, আর কলকাতায় খদ্দেরকে শুধু একবার দুধ দেখিয়ে গয়লা দুধের দাম নিয়ে চলে যায়।

নারাণদাসীর বিবিধ ছন্দের গালাগাল বিন্দির পিছনে ধাওয়া করিল, কিন্তু নাগাল ধরিতে পারিল না।

নারাণদাসী মণিমালাকে টাকা পনরটা দিল—উপায় নাই, নিশ্চয় রাখাল চিঠিতে তাহাকে লিখিয়াছে। বৌ ত সোনার বৌ, মুখে রা নাই, পাড়াকুঁদুলিরা বাড়ী বহিয়া আসিয়া উহাকে উস্কাইয়া দিয়াই ত মুস্কিল বাধাইতে চায়। আজকাল কোনো চোখখাকী কি পরের ভালো দেখিতে

পারে ছাই! নারাণদাসী জিজ্ঞাসা করিল—নাতবৌ, পনরটা টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

—উনি এ টাকা সবাইকে দিতে লিখেছেন রাঙা-দিদি। প্রথম উপার্জ্জনের টাকা—পাঁচ টাকা দিয়ে মাকে প্রণাম করতে বলেছেন, এক টাকা বিন্দির মাকে, এক টাকা আবদারকে, দুটাকা খোঁড়া নিস্তারিণীকে, এক টাকা পেঁদী বষ্টমীকে দিতে বলেছেন; পাঁচ টাকা আমায় দিয়েছেন।

নারাণদাসী বিরক্ত হইয়া বলিল—

ভাগাড়ে গরু পড়ে,
শকুনির মাথায় টনক নড়ে।—

রাখালের চাকরী হতে-না-হতে অমনি সকলের বুঝি দুঃখু জানানো হয়েছে? সকলকে মনে পড়েছে, কিন্তু এ ত মনে পড়ল না যে রাঙা-দিদি রয়েছে, গৌরি রয়েছে, তাদের কিছু হাতে তুলে দি! মনিঅডার এল, মনে করলাম রাখাল না জানি রাঙা-দিদিমাকে কতই দিয়েছে!—

শাঁখা-হাতী শাঁখা নাড়ে,
বেরাল ভাবে আমার ভাত বাড়ে!—

আমার হয়েছে তাই। রাখাল আবার বড়াই করে বলেছিলেন—চাকরী হলে আমায় বাউটি-সুট গয়না দেবেন! আরে আমার পোড়া কপাল!

মণিমালা লজ্জিত হইয়া বলিল—পনর টাকা ত তোমাকেই দিয়েছেন রাঙা-দিদি!

নারাণদাসী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—আমাকে দিয়েছে! তা হলে তোমরা মায়ে পোয়ে গিলবে কি?

কুণ্ঠিত হইয়া মণিমালা বলিল—সংসারখরচের টাকা ত ক মাসের মতন একেবারে দিয়ে গিছলেন।

নারাণদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওমা! সে কি নাতবৌ! সে কটা টাকা! এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে তাতে কদিন যায়? জমাখরচ লেখা আছে, তুমি দেখো বরং।

মণিমালা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—সে কি কথা রাঙা-দিদি, আমি কি তোমার কথা অবিশ্বাস করতে পারি কখনো। এ মাসের সংসারখরচের টাকা আমি দেবো। ও পনর টাকা তোমার প্রণামি, তুমি নিয়ো।

নারাণদাসী খুসী হইয়া বলিল—তা দেবে বৈ কি. তোমরা না দেবে ত দেবে কে! রাখাল আমার রাজা হোক, আমার মাথার চুলের মতন পেরমাই পাক, তুমি পতি পুত্তুর নিয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পর, হাতের নো ক্ষয় যাক!......

মণিমালার অধরপ্রান্তে আনন্দের একটু ক্ষীণ আভা দেখা গেল এই ভাবিয়া যে, রাখাল তাহাকে লিখিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার চার পাঁচ শত টাকা বেতন হইবে, বুড়া বয়সে ঘরে

বসিয়া দুইশত টাকা পেন্সন পাইবে; তাহার পর ভূপাল লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহার লোভ তাহারা করিবে না, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা দুজনে স্বাধীনভাবে নিজের খাইয়াই যাইতে পারিবে। এই ভবিষ্যৎ সুখের আনন্দ আজ মণিমালার সমস্ত মন ছাইয়া সমস্তই তাহার কাছে মধুময় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তার কোথাও কিছু অপ্রচুর ছিল না।

(৩৪)

রাখালের উপার্জ্জন যেন গ্রামের সকল গরীব দুঃখী ও আত্মীয়ের জন্য; যাহাদিগের নিতান্ত অভাব আছে বলিয়া সে জানে, যাহাদিগের নিকটে সে কখনো এতটুকু উপকার বা সাহায্য পাইয়াছে, যাহারা তাহাকে নিজের অভাব জানায়, তাহারা সকলেই রাখালের উপার্জ্জনের অংশীদার। ইহাতে যে-পরিমাণে নারাণদাসী চটে, সেই পরিমাণে গ্রামের সকল লোক রাখালকে আপনার বলিয়া জানিয়া ধন্য-ধন্য করে। স্বামীর প্রশংসায় মণিমালার বুক সুখে পরিপূর্ণ, সে অক্লেশে হাসি-মুখে নারাণদাসীর সকল অত্যাচার ও সকল গঞ্জনা ও বঞ্চনা সহ্য করিতে পারিতে-ছিল। তাহাকেও গ্রামের সকলে ভালো বাসে—বিন্দি ও প্রসাদী ত তাহার সহোদরারও অধিক।

এমনি সুখে দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন চিঠি আসিল মণিমালার বাবা রাজা ধনেশ্বর ছয় মাস হইল

মারা গিয়াছেন। রাণী জগদ্ধাত্রী সেই বিপুল জমিদারী লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন, রাখাল শীঘ্র গিয়া যেন তাঁহাকে রক্ষা করে।

এই অকস্মাৎ দুঃসংবাদ পাইয়া মণিমালা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল; তাহার পিতৃবিয়োগের দুঃখ প্রবলতর বোধ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে পিতা মরিবার সময়ও তাহাদের ক্ষমা করিয়া যাইতে পারিলেন না, মাতা এই ছয় মাসেও কন্যাকে তাহার পিতৃবিয়োগের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই, কন্যাকে কাছে ডাকিবার মমতা অনুভব করেন নাই, বিপদে পড়িয়া উদ্ধার করিবার জন্য জামাইকে মাত্র ডাকিয়াছেন! মণিমালার এতদিনের পুঁজি-করা সকল দুঃখ এই উপলক্ষ্য পাইয়া কান্নার স্রোতে বাহির হইতে লাগিল।

প্রসাদী ও বিন্দি রাতদিন মণিমালার কাছে-কাছে থাকে। মণিমালার দুঃখে ত তাহারা ম্রিয়মাণ, আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাহাদের মন আরো ব্যাকুল ভারাক্রান্ত। বিন্দি যে বিন্দি তাহারও মুখের হাসি আর গান থামিয়া গিয়াছে।

রাজা ধনেশ্বরের মৃত্যুতে নারাণদাসী পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সে আপন মনে গজগজ করিয়া বকিতেছিল—বাবা! মিন্সের কি দুর্জ্জয় কোরোধ গো! মোলো, তবু একবার মেয়েটার দিকে ফিরে চাইলে না! রাগ করে ছিলি বেশ ছিলি, সাত-তাড়াতাড়ি মরা কেন? একটুখানি

সংসারটা গুছিয়ে তুলছিলাম, পোড়া বিধির আর সইল না।
রাখাল ত এইবার স্ত্রীপুত্তুর নিয়ে শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে
রাজা হয়ে বসবে—তখন কি আর আমরা একটা পয়সা
নাড়াচাড়া করতে পাব ?...পাড়ার সব শতেকখোয়ারীদের
নজর লেগেই ত এমন হল !......

রাখাল মণিমালার চিঠি পাইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়া
গেল। সদ্য সে অনায়াসে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে
পারিয়াছে ; এমন অবস্থায় সেই স্বাধীন উপার্জ্জনের পথ
ছাড়িয়া আবার পরাধীন হইতে যাওয়া তাহার উচিত কি
না। মণিমালার পিতার মৃত্যুতে জমিদারী মণিমালার
মাতাতে বর্ত্তিয়াছে ; তাঁহার মৃত্যুর পর ভূপালের হইবে ;
কিন্তু তাহাতে রাখালের কি ? কিন্তু ঐ জমিদারী ভূপালের
জন্য রক্ষা করাও ত তাহারই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু রাণী
জগদ্ধাত্রী লিখিয়াছেন, জমিদারী হাতে লইয়া বিপদে
পড়িয়াছেন, রাখাল সত্বর গিয়া যেন তাঁহাকে রক্ষা করে।

রাখাল রাইলীকে সমস্ত জানাইয়া পরামর্শ চাহিল।
তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে আপাতত ছুটি
লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভব্যতা ভদ্রতা বিদ্যানুরাগ পরোপকার প্রভৃতি গুণে
রাখাল প্রবাসেও সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিল।
সকলকে দুঃখিত করিয়া দুঃখিত হইয়া সে দেশে ফিরিয়া
আসিল।

মণিমালাকে লইয়া রাখাল পাহাড়পুরে যাইবে স্থির হইয়াছে। মণিমালার ইহাতে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী বোধ হইতেছিল। যে জন্মনীড় হইতে তাহাকে দুঃখ পাইয়া দূর হইয়া আসিতে হইয়াছিল, সেখানে সে ফিরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিনা আহ্বানে; সেখানে গিয়া সে তাহার অমন স্নেহময় অথচ অতি-তেজস্বী বাবাকে দেখিতে পাইবে না; তাহার মায়ের স্নেহকোল সে ফিরিয়া পাইবে, কিন্তু যে মাকে সে দেখিয়া আসিয়াছিল সে মাকে সে পাইবে না—তাঁহার সে রাণীর বসনভূষণ ঘুচিয়া বিধবার দীনবেশ হইয়াছে; এই কয়দিনের বিচ্ছেদ মেয়েকে মায়ের মন হইতে না জানি কতখানি দূরে সরাইয়া দিয়াছে—যে জায়গা হইতে ছাড়াছড়ি হইয়াছিল সে জায়গায় পৌঁছিতে কখনো পারিবে কি না কে জানে! আর এই যে এখানে অল্পদিনের প্রবাসে নূতন পরিচয়ে কতগুলি নূতন প্রাণের সঙ্গে প্রণয়গ্রন্থি বাঁধা হইয়াছে, এইখানে যে প্রীতির লতা শত শত কোমল বাহু মেলিয়া কত লোককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, এ-সমস্ত খুলিয়া ছাড়াইয়া যাওয়া কি অমনি কথার কথা! হয়ত কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত হৃদয়ে বেদনা বাজিবে, প্রীতির লতাকে আশ্রয়হীন করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চারাইয়া রোপণ করাতে তাহার হয়ত এমন নধর ঢল-ঢল তাজা ভাব থাকিবে না, হয়ত বা একেবারেই শুকাইয়া যাইবে!

প্রসাদী আজ কদিন থেকে শুধু কাঁদিতেছে আর মণি-মালার গলা জড়াইয়া বলিতেছে—আমি আবার বিধবা হলাম! তোকে পেয়ে বৌ আমি সংসারে সুখ পেয়েছিলাম, তুই আমার সব সুখ সব আনন্দ কেড়ে নিয়ে চল্লি!

বিন্দি আর এমুখো হয় না। সে আপনাকে বাড়ীতে বন্দী করিয়াছে।

যাইবার দিন মণিমালা বিন্দিকে বারবার ডাকাইয়া পাঠাইল, সে কিছুতেই আসিল না। বিন্দির বাড়ী পাড়া-অন্তর বলিয়া বৌ-মানুষ মণিমালা তাহার বাড়ী কখনো যায় নাই। আজ সে বিন্দির কাছে বিদায় লইতে তাহার বাড়ী গেল। মণিমালাকে তাহার কুঁড়ে-ঘরে পদার্পণ করিতে দেখিয়াই বিন্দি চোখের জল চাপিয়া হাসি-মুখে গাহিয়া উঠিল—

"এস যাদু আমার বাড়ী তোমায় দিব ভালোবাসা।"

মণিমালা ম্লান মুখে বলিল—বিন্দি ঠাকুরঝি, আমরা যাচ্ছি ভাই। তুমি ত আমাদের ছায়া মাড়াও না, তাই আমিই এলাম বিদায় নিতে।

বিন্দি আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিমালার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল।

বিন্দি দেখিয়া দেখিয়া বলিল—বিন্দি পোড়ারমুখীর জন্যেও লোকে কাঁদে দেখছি!

মণিমালা বিন্দির হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—

ঠাকুরঝি, একেবারে ভুলে যাসনে ভাই, মাঝে-মাঝে মনে করিস। তোদের আমি কখনো ভুলতে পারব না।

বিন্দি হঠাৎ হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া গোপাল-উড়ের যাত্রার নকলে গাহিতে লাগিল—

"ভোলা সে কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা।
শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা।"

মণিমালা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বিন্দির হাত ধরিয়া বলিল—তবে যাই ভাই ঠাকুরঝি। বেঁচে থাকলে আবার কখনো না কখনো দেখা হবে।

বিন্দি আবার হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

"তোমারি বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে সকলি সবে॥"

মণিমালা চোখ মুছিতে-মুছিতে ফিরিল। মণিমালা চোখের আড়াল হইতেই বিন্দি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিয়া মাটিতে আছড়াইয়া পড়িয়া আকুল ক্রন্দনে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

(৩৫)

রাখাল ও মণিমালা পাহাড়পুরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে রাণী জগদ্ধাত্রীর এক দূর-সম্পর্কের ভাই আসিয়া কর্ত্তা হইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে, তাহার নাম বঙ্কবিহারী। সে আফিং গাঁজা গুলি চরস প্রভৃতি নেশা সযত্নে অভ্যাস

করিয়াছিল ; এক্ষণে দিদির দৌলতে সেইগুলির চর্চ্চায় সে বিশেষ রকম মনোযোগ দিয়াছে। রাজবেশে ফিটফাট হইয়া সে নেশার চর্চ্চা আর খুব লম্বা লম্বা হুকুম করে। সমস্ত জমিদারীর সেই কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে। এবং তাহার স্ত্রী চন্দনমণি অন্দরের কর্ত্রী, সে-ই রাণী ; রাণী জগদ্ধাত্রীর বেনামিতে অন্দরের সমস্ত কর্ত্রীত্ব সে-ই করিয়া থাকে। আর তাহাদের দুজনের মাঝখানে তাহাদের ছেলে কুবেরকে দাঁড় করাইয়া তাহারা তাহার এক হাত দিয়া সমস্ত জমিদারী ও অপর হাত দিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর পুত্রস্নেহ বেদখল করিবার চেষ্টায় আছে।

রাজা ধনেশ্বর মরিতে-না-মরিতে বঙ্কবিহারী পুত্র কলত্র লইয়া আপনার জীর্ণ ভাঙা তালপাতায়-ছাওয়া একমাত্র কুঁড়ে ঘরখানির মায়া একেবারে ত্যাগ করিয়া ছুটিতে-ছুটিতে আসিয়া পাহাড়পুরে জমিয়া বসিয়াছে। অভিলাষ পুত্র কুবেরকে পোষ্যপুত্র করিয়া দিয়া তাহারাই রাজার জনক-জননী হইয়া প্রভুত্ব করিবে।

রাজা ধনেশ্বর মরিবার পূর্ব্বে রাণী জগদ্ধাত্রীকে দত্তকপুত্র লইবার এক অনুমতি-পত্র দিয়া গিয়াছেন বলিয়া বঙ্কবিহারী ঘোষণা করিয়া দিয়া পুত্রের ওসি হইয়া নিজেই রাজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার বীরত্বে এখন পাহাড়পুরের জমিদারী যায়-যায়।

রাজা ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট খবর

লইতে আসিলেন রাজার কেহ ওয়ারিসান আছে কি না, রাজার কোনো উইল আছে কি না, জমিদারী কে চালাইবে।

বঙ্কবিহারী রাজা ধনেশ্বরের পরিত্যক্ত কিংখাবের পোষাক পরিল, মাথায় জরির তাজ চড়াইল, পায়ে জরির জুতা দিল, কানে বীরবৌলী, গলায় হার, হাতে বালা পরিল। কিন্তু কোনোটাই ঠিক মানানসই হইয়া গায়ে বসিল না। তা হোক, সে স্বাধীন নৃপতি! সাদাসিধা পোষাক ত সে পরিতে পারে না! কিন্তু তাহার মহা সমস্যা উপস্থিত হইল, স্বাধীন নৃপতির তুচ্ছ ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবুতে গিয়া দেখা করা উচিত কি না। দেওয়ান রাজনাথ তাহাকে বুঝাইল যে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাঁহার রাজ্যে অতিথি, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার সৌজন্যই প্রকাশ পাইবে, মানহানি হইবে না।

বঙ্কবিহারী খুসী হইয়া বলিল—হাঁ হাঁ, যথার্থ বলেছেন মন্ত্রীমশায়। রাজমন্ত্রী! রাজবুদ্ধি! হবে না কেন? কিন্তু রাজকায়দায় যেতে হবে মন্ত্রীমশায়! সম্মুখে দুজন দৌবারিক নাঙ্গা তরোয়াল নিয়ে যাবে, পার্শ্বে দুজন আসা-বরদার চলবে, পশ্চাতে দুজন শরীররক্ষী গোলন্দাজ যাবে; আর আমার সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ দিকে আপনি মহামাত্য যাবেন, আর বাম দিকে খাস খানসামা ঘনশ্যাম ওরফে ঘিসু সোনার ফরসীতে মুক্তার-ঝালর-দেওয়া জড়োয়া সরপোষ চড়াইয়া বহিয়া লইয়া চলিবে!

এই স্বাধীন নৃপতির অদ্ভুত বেশভূষা ও গ্রামভারী চালচলন দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের হাস্য রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সাহেব তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনিই কি স্বর্গীয় রাজার জামাই?

বঙ্কবিহারী বুক ফুলাইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া বলিল—না, আমি জামাই নহি, আমি রাজশ্যালক, রাণীর ভ্রাতা!

—আমি জানতে চাই যে রাজা কোনো উইল রেখে গেছেন কি না। যদি উইল না থাকে তবে রাজার মেয়েই ত রাণীর মরণোত্তর উত্তরাধিকারী হবেন। তা হলে রাণীর অভিভাবক তাঁর জামাতাই হবেন ত?

—সে কখনো হতে পারে না। এ স্বাধীন নৃপতির রাজ্য! কন্যাকুলে রাজ্য যেতে পারে না! রাজার অনুমতিপত্র আছে, রাণী দত্তকপুত্র নেবেন। আমার ছেলেই দত্তকপুত্র হবে, এবং সে সাবালগ না হওয়া পর্যান্ত আমিই তার ন্যায়-সঙ্গত অভিভাবক, আমিই রাজ্য রক্ষা করব!

—রাণীর কি মত আমি রাণীর নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই। আপনারা এইখানে থাকুন, রাণীকে খবর পাঠিয়ে দেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

বঙ্কবিহারী উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—সে কখনো হতে পারে না! স্বাধীন নৃপতির ভার্য্যা, স্বাধীন নৃপতির ভাবী মাতা, কখনো পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হতে পারেন না!

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন—তিনি দরজায় পরদা

ফেলে ওপারে থাকবেন, আমার মেম তাঁর কাছে থাকবেন, আমি এপার থেকে শুধু তাঁর মুখের কথা শুনে যেতে চাই।

বঙ্কবিহারী রাজনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—মন্ত্রী, আপনার অভিপ্রায় কি?

—আজ্ঞে, হুজুর যা বলছেন তাতে দোষ দেখি না।

বঙ্কবিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—হুজুর! এখানে আমি ছাড়া আর কে হুজুর আছে!

রাজনাথ প্রমাদ গণিল। সে তাড়াতাড়ি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইংরেজিতে বলিল—মাপ করিবেন, ইঁহার নানাবিধ নেশা করিয়া মাথার একটু গোলমাল হইয়াছে।

বঙ্কবিহারী হুঙ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অমাত্য, ম্লেচ্ছ ভাষায় কি বললেন?

রাজনাথ কষ্টে হাসি গোপন করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বললাম যে সাহেব যখন রাজভৃত্য তখন প্রভু তাঁকে অন্তঃপুরে যেতে দিতে অস্বীকার করবেন না।

বঙ্কবিহারী হাসিয়া-হাসিয়া গা দুলাইয়া বলিল—অমাত্য, আপনার বুদ্ধির তারিফ করি! রাজভৃত্য, রাজভৃত্য! রাণীর সঙ্গে ভৃত্যের দেখা করতে দোষ কি! হাঁ, সাহেব আপনি মেম-সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চলুন তবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট মেমকে রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাহারা রাখিয়া তাঁহার মুখ হইতে বঙ্কবিহারী যাহা বলিয়াছিল তাহাই শুনিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রাজা ধনেশ্বরের অনুমতি-

পত্র লইয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সই কি স্বর্গীয় মহারাজের।

রাণী জগদ্ধাত্রী ঢোক গিলিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—হঁা।

ম্যাজিষ্ট্রেট রাজা ধনেশ্বরের স্বাক্ষরিত অপর কাগজের সহিত অনুমতি-পত্রের সই মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দলিলের সইএর সঙ্গে অনুমতি-পত্রের সইএর মিল নেই বোধ হচ্ছে। এর কারণ কি?

বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—পীড়িত...

ম্যাজিষ্ট্রেট ধমক দিয়া বলিলেন—আপনি চুপ করুন। আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করছি।

রাণী বলিলেন—তখন তিনি পীড়িত ছিলেন।

—আপনি ঠিক জানেন এ সই তাঁর নিজের হাতের?

রাণী জগদ্ধাত্রী ক্ষীণস্বরে বলিলেন—হঁা।

তখন সাহেব ভাবী পোষ্যপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। অমনি বঙ্কবিহারী বলিয়া উঠিল—দৌবারিক, যাও মহারাজকে নিয়ে এস।

কুবেরও খুব জমকালো জরির জামা ও টুপি পরিয়া আসিল। সে আসিয়া দাঁড়াইতেই বঙ্কবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—মহারাজের আসতে আজ্ঞা হোক্! সাহেব, ইনিই মহারাজ!

কুবেরের বয়স বছর বারো তেরো। ফর্সা রং হইলেও

পাড়াগেঁয়ে দৌরাত্ম্যে একটু কটাসে রোদপোড়া হইয়া গিয়াছে; চেহারাটা পাকাটে; তামাকে দম কষিয়া-কষিয়া ঠোঁট দুটো কালিবর্ণ। হাত পা নলি-নলি, হাড়-বেরুনো, শিরা-ওঠা।

সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—এ যতদিন সাবালগ না হয় ততদিন এই ষ্টেট কোর্ট-অব-ওার্ডসে থাকবে, এবং ইহার শিক্ষা সহবতের জন্য একজন শিক্ষিত লোককে নিযুক্ত করতে হবে।

বঙ্কবিহারী মাথা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—সে কখনো হতে পারে না। এর অভিভাবক আমি! কার সাধ্য এ রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে! যদি করে, বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হবে!

সাহেব হাসিয়া "পাগল!" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিন পরে একজন ইংরেজ ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। বঙ্কবিহারী বুক ফুলাইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া আস্ফালন করিয়া বলিল—

"তীক্ষ্ণ সূচি-অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি,
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি!"

যে ঐ ম্লেচ্ছ ইংরেজটার শির আনতে পারবে সে পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার পাবে!

জমিদারী-সরকারে গুণ্ডা লাঠিয়াল পোষা থাকে পাঁচশত টাকার লোভে অনেক লাঠি চঞ্চল হইয়া উঠিল

কিন্তু দেওয়ান রাজনাথ ঠিক সময়ে সতর্ক ও সাহায্য করাতে সাহেব ম্যানেজার মাথা লইয়া পলাইয়া বাঁচিল।

বঙ্কবিহারী ও রাণী জগদ্ধাত্রীর নামে ম্যাজিষ্ট্রেট ওারেণ্ট জারি করিলেন।

এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রাখালের ডাক পড়িয়াছিল।

পুলিশকে ঘুষের উপর ঘুষ চাপাইয়া ওারেণ্ট এড়াইয়া রাখা হইতেছিল। কিন্তু আর বুঝি বাঁচানো যায় না। স্বয়ং পুলিশ-সাহেব সশস্ত্র পুলিশ লইয়া বাড়ী ঘেরাও করিতে আসিতেছেন।

রাখালকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কবিহারীর প্ররোচনায় রাখালকে কেহ পুছে না; রাখাল নিজে হইতে কোনো পরামর্শ দিতে গেলে বঙ্কবিহারী বলিয়া উঠে—তোমার পরামর্শ শুনতে পারি না বাবাজী; তুমি আমাদের বিরুদ্ধ-স্বার্থের লোক!

অন্দরে মণিমালাও মায়ের কাছে পর হইয়া উঠিয়াছে। চন্দনমণি সদাসর্ব্বদা জগদ্ধাত্রী দেবীকে আগলাইয়া-আগলাইয়া ফিরিতেছে, মণিমালা যাহাতে কখনো একলা মায়ের কাছে না থাকিতে পায়; চন্দনমণি কুবেরকে সর্ব্বদা রাণীর কাছে-কাছে রাখে, পাছে ভূপালের উপর রাণীর মায়া বসিয়া যায়। রাণী জগদ্ধাত্রী বিধবা হওয়ার পরই পুলিশ-হাঙ্গামায় পড়িয়া কেমন হতভম্ব জবুথবু হইয়া গিয়াছেন,

কাহারও সহিত কথা বলেন না, ভালো করিয়া খান না, ঘুমান না, থাকেন-থাকেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—শেষে এও কপালে ছিল,—রাজরাণী ছিলাম, জেল খেটে মরব!

মণিমালা একদিন রাখালকে বলিল—এখানে দেখছি আমাদের এরা চায় না, আমাদের এখানে দরকার নেই। চল আমরা আমাদের বাড়ীতে ফিরে যাই।

রাখাল বলিল—সে কি হয় মণি। এদের দরকার না থাক, আমি দেখছি এখানে আমাদের দরকার আছে। এই বিপদের সময়ে ফেলে চলে যাওয়া মানুষের কাজ হবে না।

—শেষকালে আমাদের একুল ওকুল দুকুল যাবে। তোমার চাকরীটি গেলে তখন আমাদের কি উপায় হবে?

—তখনকার ভাবনা তখন ভাবব। এখন অন্য ভাবনাই অনেক ভাববার আছে।

—অনুমতি-পত্র তুমি দেখেছ?

—দেখেছি।

মণিমালা একটু ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল—বাবার সইটা ত বাবার বলে বোধ হয় না।

রাখাল বিরক্ত হইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—মা বলেছেন সে সই শ্বশুর-মশায়েরই। এখন অন্য ভাবনা ছেড়ে দিয়ে মাকে অপমান থেকে বাঁচাতে হবে।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

রাখাল জগদ্ধাত্রী দেবীকে লইয়া পাহাড়পুর হইতে পলায়ন করিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকিবে স্থির করিল। মোকদ্দমা শেষ হইলে ও তখন ওয়ারেণ্টের ভয় না থাকিলে ফিরিয়া আসিবে।

রাখাল আপনার সঙ্কল্প রাণী জগদ্ধাত্রীকে জানাইল। তিনি উদাসভাবে বলিলেন—যা হয় কর, আমি কি জানি? আমার কপাল! শেষকালে আপনার বাড়ীঘর ছেড়ে চোরের মতন পালাতে হবে!

বঙ্কবিহারী রাখালকে বলিল—কাপুরুষ নরাধম! পৃষ্ঠ-প্রদর্শন! এই কি বীরধর্ম্ম!

রাখাল বিরক্ত হইলেও কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া বলিল—পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করবেন ত কি মেয়েমানুষকে জেল খাটালে বীরধর্ম্ম রক্ষা হবে?

বঙ্কবিহারী সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—কেন? মেয়েরা জলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করুক। আমরা সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জ্জন করি।

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ সম্মুখ সমর করুন। সেই অবসরে আমি মাকে নিয়ে পলায়নই করি।

বঙ্কবিহারী—কাপুরুষ! ভীরু!—বলিয়া রাখালকে গালি পাড়িতে লাগিল।

পলায়ন করিতে হইবে। কিন্তু পাল্কীর বেহারা পাওয়া যায় না। যাহাকে বলা যায় সেই বলে—এক পেট ভাতের জন্যে কে জান দিবে?

যাকে অনুরোধ করা যায় সেই বলে, কোম্পানির রাজ্য হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর কাহারও প্রজা নহে, কাহারও চোখ-রাঙানি ধমকানির ধার তাহারা আর ধারে না।

তখন অগত্যা ঠিক হইল হাঁটিয়াই পলাইতে হইবে। আজই গভীর রাত্রিকালে।

সন্ধ্যাবেলা পুলিশ আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিল।

রাখাল গিয়া পুলিশের দারোগাকে বলিল—পাড়ার তিন চার জন মেয়ে বেড়াইতে আসিয়া আটক পড়িয়াছে, যদি তিনি দয়া করিয়া তাহাদের বাড়ী চলিয়া যাইতে দ্যান। দারোগা গম্ভীর হইয়া বলিল—কিছু পান খাইতে পাইলে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

দারোগাকে পান খাইবার জন্য হাজার টাকা দিতে হইল।

রাণী জগদ্ধাত্রী ও মণিমালা প্রস্তুত হইয়া চন্দনমণিকে ডাকিল। চন্দনমণি বলিল—পোড়াকপাল! আমি কেন যেতে গেলাম! আমি গেলে কুবেরের এইসব ধনসম্পত্তি আগলাবে কে?

রাখাল বঙ্কবিহারীকে বলিল—আপনি সম্মুখ-সমরের জন্যে থাকছেন ত ?

বঙ্কবিহারী বলিল—দিদি যখন পালাচ্ছেন তখন আমি কার জন্যে লড়ব ? আমিও দিদির সঙ্গে যাব, তাঁকে রক্ষা করতে হবে ত !

রাখাল হাসি চাপিয়া বলিল—তবে আপনি শিগগির মেয়ে-মানুষ সেজে নিন।

বঙ্কবিহারী স্ত্রীলোকের মতন কাপড় পরিয়া ঘোমটা দিয়া পাড়ার মেয়ে সাজিল। এই বিপদের সময়েও তাহাকে দেখিয়া রাখাল ও মণিমালা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

তখন রাখাল সকলকে বলিল—যে যত পার গহনা পরিয়া লও, তোড়া ভরিয়া টাকা আর মোহর কোমরে বাঁধিয়া লও, টাকার দরকার হইবে।

চন্দনমণি চীৎকার করিতে লাগিল—ওরে বাপরে ! আমার কুবেরের টাকা ! সব নষ্ট করলে ! বাপরে সব লুটে নিলে ! আমি চেঁচিয়ে এখনি পুলিশ ডাকব !

রাখাল কিছু না বলিয়া চন্দনমণির দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিল।

বঙ্কবিহারী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বিপদে পড়িলে বাঘ হরিণের পা চাটে !" চন্দনমণি সয়ে থাক ! এর শোধ নেবার দিন আসবে !

যে বাড়ীতে বিবাহের বধূ আসিয়া রাণী হইয়া এতদিন ছিলেন সেইবাড়ী হইতে এতদিনে রাণী জগদ্ধাত্রী অসহায় অকূলে ভাসিলেন।

অসংখ্য দাসদাসীর মধ্যে সঙ্গ লইল শুধু ইনামসিং জমাদার, ঘিসু খানসামা, বিতাড়িত বৃদ্ধা দাসী ইচ্ছা। চারজন বেহারা ফুলচাঁদ, ঝুমকা, ঝড়ু ও কাতুয়া একখানি ডুলি আনিয়া কাঁদিয়া বলিল—অনেক দিন রাণীমায়ের নিমক খাইয়াছি; তিনি হাঁটিয়া পথ চলিবেন ইহা আমরা প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না; রাণীমা ডুলিতে উঠুন।

রাণী জগদ্ধাত্রী ভূপালকে কোলে করিয়া ডুলিতে চলিলেন আর সকলে হাঁটিয়া চলিল। মণিমালার বাপের বাড়ী এখন পরের বাড়ী বলিয়াও বটে, আর মাতা ও স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে থাকিবার জন্যও বটে সেও পলাতকদের সঙ্গে গেল।

বর্ষাকাল। মাঠ ঘাট জলে ভাসিয়া গিয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে পথ ধরিয়া যাইবার জো নাই। রাত্রিকালে মাঠে-মাঠে জল ভাঙিয়া চলিতে হয়; দিনের বেলা কোনো গ্রামে লুকাইয়া থাকে। যাহারা না চিনে তাহাদিগকে পরিচয় দ্যায় তাহাদের বাড়ী ঝিকড়গাছিতে, তাহারা জগন্নাথের তীর্থযাত্রী। মণিমালা পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত হইলেও মনে করিয়াছিল এবার তাহাদের দুঃখ ঘুচিল। কিন্তু বিধাতা যে তাহার জন্য নূতনতর দুঃখ সৃজন করিয়া

রাখিয়াছিলেন সে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে এই দুঃখে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া মুষড়িয়া পড়িয়াছিল।

ঘুরিতে-ঘুরিতে এক গ্রামে গিয়া সকলে পৌঁছিল, সেই গ্রামে রাজনাথ দেওয়ানের বাড়ী। তাহার নিকট সাহায্য পাইবে আশা করিয়া রাখাল তাহার বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিল।

শুনিয়া বঙ্কবিহারী বলিল—হাঁ। অমাত্য-প্রধান অতীব সুজন! উত্তম সঙ্কল্প!

প্রস্তাব শুনিয়া রাজনাথ স্পষ্ট বলিল সে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে চাকরী বাহাল রাখিবার প্রত্যাশা রাখে, অতএব তাহার দ্বারা কোনো রকম সাহায্য প্রত্যাশা করা মিথ্যা। সে এই পর্য্যন্ত করিতে পারে যে সে ধরাইয়া দিবে না।

সেই দিনের মতো আশ্রয় চাহিলে সে নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহার বাগানের মধ্যে একখানা ভাঙা ঘর দেখাইয়া দিল।

ইচ্ছা-বুড়ি গিয়া বলিল—দেওয়ানজি, মুনিবমা একটু শোবেন, যদি একটা বিছানা আর বালিশ দেন।

রাজনাথ মুখ খিঁচাইয়া বলিল—আর বিছানা বালিশ নেয় না। দুদিন বাদে জেলখানায় ইট মাথায় দিয়ে শুতে হবে, এখন থেকে অভ্যেস করতে বলগে।

ইচ্ছার মনের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করিলে সেই নিমক-হারাম লোকের জিহ্বা তখনই খসিয়া পড়িত, তাহার মাথায় সমস্ত আকাশ ভাঙিয়া বজ্রাঘাত হইত।

ঘুরিতে-ঘুরিতে রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিকে লইয়া গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল।" আজ মণিমালার আনন্দ ও গর্ব্ব আর ধরে না। একদিন এমনি অসহায় অবস্থায় তাহার মাতা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, আজ মাতাকে তেমনি অসহায় অবস্থায় তাহারই আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে। এ তাহার আপনার গৃহস্থালি, এখানকার কর্ত্রী সে-ই।

মণিমালা গাঁয়ে পা দিয়াই ছুটিয়া প্রসাদী ও বিন্দিকে দেখিতে গেল। প্রসাদী হাসিতে গিয়া কাঁদিল; বিন্দি তাহার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গভরে গাহিল—

"তুমি আমার সোহাগ-পাখী, আমি রে তোর পিঁজরা,
আমায় ছেড়ে যাবে কোথায় ওরে কালো ভোমরা।
যে অবধি গেছ তুমি হয়ে আছি কাতরা,
হৃদয়খানি দেখ খুলে হয়ে গেছে ঝাঁঝরা।"

গাহিতে-গাহিতে আজ বড় আনন্দে বিন্দিও সকলের সামনে মন খুলিয়া কাঁদিল।

গাঁ ভাঙিয়া আসিল রাণী দেখিতে; তাহারা রাজকন্যা দেখিয়াছে, রাণী কখনো ত দেখে নাই। এবারও তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিল।

বাস্তবিক রাণীর রাণীত্বও ত কিছু ছিল না; তিনি এখন ওয়ারেণ্টের পলাতক আসামী। মেয়ের বাড়ীতেও রাণীর দুদিনের বেশী থাকিতে সাহস হইল না। ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে গিয়া থাকা স্থির হইল।

সকলকে চন্দননগরে রাখিয়া রাখাল পাহাড়পুরে ফিরিয়া গেল।

সে গিয়া দেখিল কোর্ট-অব-ওার্ডস জমিদারীর ভার লইয়া বসিয়াছে। চন্দনমণি অন্দরে জাঁকিয়া বসিয়া নবাবী চালে রাজার মা-গিরি ফলাইতেছে; এবং ভাবী রাজা কুবের একটা চাবুক লইয়া অকারণে যাকে-তাকে মারিয়া-মারিয়া আপনার প্রভুত্ব অভ্যাস করিয়া ফিরিতেছে।

রাখাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার বিরুদ্ধে ওারেণ্ট প্রত্যাহার করিতে মিনতি করিয়া অনুরোধ করিল। সে কারণ দেখাইল যে, রাণী স্ত্রীলোক, তিনি যে ম্যানেজার সাহেবকে খুন করিবার হুকুম দিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না; মোকদ্দমা হইলে আদালতে প্রমাণ হওয়াও সন্দেহস্থল; এক্ষেত্রে তিনি ওারেণ্ট প্রত্যাহার করিলে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আচ্ছা বাবু, এই সর্ত্তে আমি ওারেণ্ট প্রত্যাহার করিব যে সেই পাগলা বদমায়েস বঙ্কবিহারী আসিয়া ধরা দিবে। আমি তাহাকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিব।

রাখাল তাহারও জন্য অনেক অনুনয় করিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, কোনো ফল হইল না।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা রাণী জগদ্ধাত্রীকে বলিল। তিনি শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বঙ্কবিহারী শুনিয়া বলিয়া উঠিল—এ কখনো হতে পারে না। এ ইংরেজের অবিচার! এক অপরাধে দুজনের দুরকম ব্যবস্থা হতে পারে না।

রাখাল ধমক দিয়া বলিল—তা হলে কি আপনার ইচ্ছে যে আপনার সঙ্গে মা-সুদ্ধ জেল খাটুন গিয়ে। তা হলেই ইংরেজের সুবিচার হবে!

বঙ্কবিহারী বলিল—না তা নয়! এতে তোমার কিছু কারসাজি আছে! তুমি আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার অভিলাষ করেছ।

রাখাল বিরক্তি চাপিয়া বলিল—আপনার জেল যাতে না হয় তার জন্যে উকিল ব্যারিষ্টার লাগিয়ে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়ব। এখন মাকে বাঁচাবার জন্যে আপনি একবার ধরা দেবেন চলুন। আমি বলছি আপনাকে আমি জামিনে খালাস করে আনব!

বঙ্কবিহারী গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিল—এখন আমি অসহায়! যা ইচ্ছে কর। কিন্তু এর প্রতিফল আমি সময় পেলে হাতে-হাতে চুকিয়ে দেবো!

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনাকে আমি ঋণী করে রাখব না। সুদে-আসলে আপনি ঋণ শোধ করবেন, আমি আপত্তি করব না।

রাখাল একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বঙ্কবিহারীকে হাজির করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করিবেনই না; অনেক বলা কহাতে রাখালের ঝুঁকিতে জামিন মঞ্জুর করা হইল। রাখাল ওয়ারেণ্টের আসামীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সম্মতি লইয়া একদিন হাজতে আটক রাখিয়া তাহাকেও জামিনে খালাস দিলেন। মকদ্দমা চলিতে লাগিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী এইবার নিরাপদ হইয়া দেশে ফিরিবেন। চন্দননগর হইতে গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া গ্রামদেবতা রাধা-কান্তের খুব সমারোহ করিয়া পূজাভোগ দিলেন; সমস্ত গ্রামের ভদ্র ও চাষা মেয়ে-পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইল। রাখাল, মণিমালা, প্রসাদী ও বিন্দি ভোর হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত লোকের পরিচর্য্যা করিয়া বেড়াইল। বৃন্দা-বনের ও নারাণদাসীর সম্মান গ্রামে চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

মণিমালা মাকে দিয়া নারাণদাসীকে চেলী ও গহনা, গৌরকে মোহর ও পোষাক, বৃন্দাবনকে গরদের জোড় ও মোহর দেওয়াইল। নারাণদাসী খুসী হইয়া বলিল—হাঁ! এতদিনে টের পেলাম যে নাতবৌ আমাদের রাজার মেয়ে বটে!

গ্রামের ঘরে-ঘরে গরদ চেলী বিলি হইল; গরীব দুঃখীরা যে যাহা চাহিতে লাগিল রাণী জগদ্ধাত্রী তাহাকে তাহা দান করিতে লাগিলেন।

কাঙালী আসিয়া রাখালকে ধরিয়া বসিল—তোমার শাশুড়ীকে বলে যদি আমার একটা চাকরী করে দাও রাখাল!

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীকে গিয়া বলিল—কাঙালী-দাদা আমার পরম উপকারী বন্ধু, সেই আমার চাকরী করে দিয়েছিল। তাকে যদি একটা চাকরী দ্যান।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—পাহাড়পুরে ওকে নিয়ে চল। কি চাকরীর যোগ্য তুমিই ঠিক করে দিয়ো।

—ওকে ইংরেজি সেরেস্তায় হেডক্লার্ক করে দিলেই হবে, হেডক্লার্ক একজন দরকার আছে।

তাহাই ঠিক হইল। কাঙালী আশাতীত সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কাঙালী রাখালকে দিয়া চাকরী জোগাড় করিয়া লইয়াই বঙ্কবিহারীর সঙ্গে রাজামামা সম্পর্ক পাতাইয়া তাহার মনোরঞ্জনে লাগিয়া গেল। কারণ কাঙালী বুঝিয়াছিল রাখাল এখন আর পাহাড়পুরের কেউ নয়, বঙ্কবিহারীর দলই প্রধান ও প্রবল।

মণিমালা একদিন রাখালকে বলিল—দেখ, মা বঙ্কমামার সঙ্গে ফিরে যান, তুমি আর পাহাড়পুরে যেও না। তুমি উনাউ যাও।

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল—না, তা কি হয়। ওঁদের পৌঁছে ঠিকঠাক করে দিয়ে আসি। তারপর যা হয় করা যাবে।

—তা হলে তুমি যাও, আমি এখানে থাকি।

—না না, তা হলে মা কি মনে করবেন? মনে করবেন যে আমরা কুবেরের হিংসে করছি। তোমাকেও যেতে হবে।

আবার বিদায়ের পালা। এবার মণিমালা হাসিতে-হাসিতে বিদায় লইয়া বলিল—ভাই ঠাকুরঝিরা, এবার আর কান্না নয়, ধুলো পায়ে লগ্ন, যেমন যাওয়া অমনি ফেরা। আমি শিগগির ফিরব।

তাহাই বিশ্বাস করিয়া বিন্দিও এবার আনন্দের গান গাহিল—

"শুন শুন ওহে পরাণ-পিয়া,
চিরদিন পরে পাইয়াছি শ্যাম,
আর না দিব ছাড়িয়া।
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব,
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব।
অগাধ প্রেমের নিগড়ে বাঁধিয়া
রাখিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥"

(৩৯)

বিচারে বঙ্কবিহারীর ছয়মাস জেল হইল। আবার মোকদ্দমা মোশন করা হইল; সে যে ম্যানেজার-

সাহেবকে খুন করিবার হুকুম দিয়াছিল বা কেহ তাহার হুকুম অনুসারে ম্যানেজারকে খুন করিতে গিয়াছিল ইহার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না; প্রধান সাক্ষী রাজনাথের কথায় অনেক পরস্পর-প্রতিবাদী উক্তি বাহির হইয়া পড়িল। বঙ্কবিহারী অব্যাহতি পাইয়া গেল।

এই মোকদ্দমা-জয়ের উৎসব শেষ হইয়া গেলেই মণিমালা রাখালকে বলিল—এইবার বাড়ী চল, এখানে এরা ত এখন নিশ্চিন্ত হল।

রাখাল বলিল—দাঁড়াও, আগে পোষ্যপুত্র নেওয়া হয়ে-টয়ে যাক।

মণিমালার বাবা তাঁহার সম্পত্তি কন্যাকে দিয়া যান নাই ইহা যদি সত্য হয়ও, তাহার মা ইচ্ছা করিলে সে সম্পত্তি তাহাকে দিতে পারেন যদি তিনি পোষ্যপুত্র না লন; পোষ্যপুত্র লওয়া না-লওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন; পোষ্যপুত্র লইতে তিনি যে খুব ব্যস্ত বা ইচ্ছুক তাহাও মনে হয় না; অথচ তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গছাইয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছিল তাহাও ত তিনি প্রতিরোধ করিতেছিলেন না। মণিমালা চোখের সামনে নিজের হকের ধন পরের হস্তগত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেছিল না—তাহার নিজের জন্য নহে, তাহার ভূপাল রাজার দৌহিত্র হইয়াও গরিবের ছেলে হইয়াই যে থাকিবে এই দুঃখ তাহার অসহ্য বোধ

হইতেছিল। কিন্তু রাখাল বুঝিতে পারিতেছিল না মণিমালা কেন তাহার বাপের বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেছে। সে কেবল ইহাই দেখিতেছিল যে এতবড় জমিদারীটার একটা পাকা বন্দোবস্ত না করিয়া দিয়া তাহার কোথাও নড়া উচিত নয়; পাছে তাহার শাশুড়ী আবার কোনো বিপদে পড়েন।

রাখালের পিসশ্বশুর শ্রীকৃষ্ণ পাহাড়পুরে আসিয়া রাখালকে বলিলেন—বাবাজী, নিজের পায়ে নিজে কি এমনি করেই কুড়ুল মারতে হয়? কোথাকার কে একটা টোঙর এসে তোমার শ্বশুরের সম্পত্তি দখল করে বসছে, তুমি চুপ করে তাই দেখছ? ইনাম-সিং জমাদারকে বল—দুহাতে বঙ্কা আর কুবরার গর্দ্দানা ধরে পাহাড়পুর থেকে দূর করে দিক!

রাখাল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—পিসে-মশায়, আপনি আমাকে অধর্ম্ম করবার পরামর্শ দিতে এসেছেন! আমার শ্বশুরের পোষ্যপুত্র নেবার অনুমতি-পত্র পাওয়া গেছে। এক পোষ্যপুত্র অবর্ত্তমানে পাঁচটি পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র নেবার অনুমতি আছে।

—ও অনুমতি-পত্র ত জাল, বঙ্কার তৈরি।

—মা বলেছেন সই মহারাজার। আর নাই হোক সই মহারাজের; মহারাজ অবর্ত্তমানে সম্পত্তি মায়ের হয়েছে, তিনি যাকে খুসী তাঁর সম্পত্তি দেবেন। মা ইচ্ছা করলে

পোষ্যপুত্র না নিয়ে মেয়েকে নাতিকে বিষয় দিতে পারতেন ; কিন্তু তাঁরও সে-রকম ইচ্ছের কোনো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এক্ষেত্রে বিষয় নিতে হলে আমাকে হয় চুরি করে অনুমতিপত্র নষ্ট করতে হয়, নয় ঠেঙাড়ে হয়ে একে একে পাঁচ-পাঁচটা পোষ্যপুত্রের মাথায় লাঠি মারতে হয়, নয় শাশুড়ীর বিরুদ্ধে আদালতে জালিয়াতির নালিশ করতে হয়। আপনার কি ইচ্ছে আমি এইসব করি! আমাকে কি এমনি অধার্ম্মিক মনে করেছেন! আর যাকে পোষ্যপুত্র নেওয়া হচ্ছে সে ত যে-সে পর নয়, সে আপনার পিসির সম্পত্তি পাবে—মা আর পিসি-মাসিতে কি খুব তফাত?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ওগুলির মধ্যে একটিও করতে হয় না—কেবল এইটুকু মাত্র প্রমাণ করতে হয় যে উইলটা জাল এবং রাণী করেননি। তিনি যে রাজার সই স্বীকার করেছেন তা undue influence বশতঃ বা ভাইকে বাঁচাবার জন্যে। সেটুকু করতে পারলে অধর্ম্ম করা তো হবেই না, বরং অধর্ম্মের নিবারণই হবে। তুমি যা বলছ তাতে ধর্ম্মজ্ঞান কতটুকু প্রকাশ পাচ্ছে বলা যায় না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

রাখাল চটিয়া বলিয়া উঠিল—আপনি আমাকে প্রলোভন দেখাতে এসেছেন? আমি আপনার কোনো পরামর্শ শুনতে চাইনা।

এই কথার পর শ্রীকৃষ্ণ রাখালকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি মুখ কাচুমাচু করিয়া রাখালের কাছ হইতে অন্দরে মণিমালার কাছে গেলেন।

মণিমালাকে বলিলেন—মণি, ঘরে আগুন লাগাচ্ছে আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিস? গাকে পুষ্যিএঁড়ে নিতে বারণ কর না।

মণিমালা দৃপ্তভাবে বলিল—পিসে-মশায়, কেঁদে মান আর যেচে সোহাগ? সে আমার চাইনে।

—তোর ভূপালের কি অবস্থা হবে?

—ভূপাল বেঁচে থেকে লেখাপড়া যদি শিখতে পারে ভালোই, নয়ত মাথায় মোট বয়ে রোজগার করবে।

—রাজার নাতির পক্ষে সেটা কি খুব গৌরবের হবে মণি।

—নিজের পরিশ্রমে নিজের উপার্জ্জন খাওয়া যদি গৌরবের না হয় তবে কি ভিক্ষে করে পরের অনুগ্রহ পাওয়া গৌরবের হবে পিসেমশায়!

—রাজা ধনেশ্বরের ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা নগদ জমা ছিল। জামাই ইচ্ছে করলে সেটা ত নিতে পারে। সে টাকাটা ত এখন জামাইয়ের হাতেই আছে!

—পিসেমশায়, আমার স্বামী চোর নন!

শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন রাখালের হাতে পড়িয়া মেয়েটার সুদ্ধ মতিগতি বিগড়াইয়া গিয়াছে

দেখিতেছি! তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন।

(৩৯)

মহাসমারোহ করিয়া পুত্রেষ্টি যাগের আয়োজন হইতে লাগিল। ভাটপাড়া নবদ্বীপ ও কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে যাত্রা থিয়েটার বাজি, লক্ষ্ণৌ হইতে নহবৎ, ও নানাদেশ হইতে দ্রব্যসম্ভার আসিয়াছে, পাহাড়পুরে মেলা বসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বড় বড় চালা-ঘর করিয়া বহু তাম্বু ফেলিয়া নিমন্ত্রিতদের বাসা দেওয়া হইয়াছে। ডিভিজনের কমিশনর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া গোলাপবাগের মধ্যে বড় বড় তাঁবুতে আছেন।

যাগের আগের দিন রাখাল বঙ্কবিহারীকে বলিল—আজকে একবার কুবেরকে নিয়ে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসুন।

বঙ্কবিহারী বলিল—স্বাধীন নৃপতির ওসকলের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি ঐসমস্ত অবিচারক অত্যাচারীদের মুখদর্শন করি না।

আসল কথা বঙ্কবিহারী স্বাধীন নৃপতির চাল চালিতে গিয়া যে বিষম দায়ে ঠেকিয়া গিয়াছিল তাহারই ভয়ে সে সাহেবদের কাছে ঘেঁষিতে আপত্তি করিল।

রাখাল হাসিয়া বলিল—স্বাধীন নৃপতি হয়ে থাকলে

নৃপতি শিগগিরই গজভুক্ত কপিত্থ হয়ে যাবেন। আপনি না যান আমি নিয়ে যাব।

বঙ্কবিহারী আর আপত্তি করিল না; রাজনাথের বিশ্বাসঘাতকতায় ঠেকিয়া শিখিয়া সে এখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া ছোট দেওয়ান দীনদয়ালকে আশ্রয় করিয়াছে। বঙ্কবিহারী দীনদয়ালকে বলিতে লাগিল—এ সমস্তই রাখালের হিংসা! কিসে স্বাধীন নৃপতিকে অপমান করবে তারই চেষ্টা! আচ্ছা, আচ্ছা, এ সমস্তই তোলা থাকছে!

কুবের ও ভূপালকে লইয়া রাখাল কমিশনর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কুবেরকে চন্দনমণি খুব জাঁকজমকের পোষাক পরাইয়া দিয়াছিল; তাহার কুশ্রী চেহারার উপর সেই দামী পোষাক যেন তাহার পৈতৃক দারিদ্র্যকে ও তাহার অনভিজাত্যকে বেশী করিয়া ঘোষণা করিতেছিল, যেন সে যাত্রার দলের ছোকরা! আর ভূপালকে মণিমালা নিতান্ত সাদাসিধা পোষাকে সাজাইয়া দিয়াছিল, তাহাতেই তাহার কমনীয় প্রিয়দর্শন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাখাল তাহাদিগকে লইয়া যাইতে-যাইতে শিখাইতে লাগিল—দেখ, সাহেবদের কাছে গিয়ে প্রথমে নমস্কার করবে; সাহেবরা হাত বাড়িয়ে দিলে তোমরাও হাত বাড়িয়ে দেবে; বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকবে, ছটফট করবে না।...

রাখাল প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিল;

তাঁহার সহিত তাহার পূর্ব্বকার পরিচয় ছিল; তিনি সম্মান করিয়া রাখালকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাখালের অভিপ্রায় শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া কমিশনরের কাছে লইয়া গেলেন।

কমিশনরের সম্মুখে গিয়া শিশু ভূপাল হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। কুবের করিল না, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমিশনর তাহা লক্ষ্য করিলেন। কমিশনর হাসিয়া তাহাদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, ভূপাল হাত বাড়াইল, কুবের হাত বাড়াইল না। কমিশনর তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন। ভূপাল স্থির হইয়া বসিল। কুবের বসিল না, সে একবার চেয়ারের উপর পাতা লোমশ চামড়াখানা তুলিয়া দেখিল; তাম্বুর কোণে একটা পিয়ানো ছিল, দৌড়িয়া গিয়া তাহাতে দুবার টুংটাং করিল; তারপর রাখালের ধমকে মুখ গোঁজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া মুখ বিকৃত করিয়া নাক খুঁটিতে লাগিল।

কমিশনার ভূপালকে দেখাইয়া বলিলেন—রাণী বুঝি এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নেবেন?

—আজ্ঞে না, এ আমার ছেলে।—বলিয়া রাখাল কুবেরের দিকে ঘুরিয়া নাক হইতে তাহার হাত টানিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—এইটি রাণীর ভাইয়ের ছেলে, রাণী একেই পোষ্যপুত্র নেবেন!

—নিজের মেয়ের এমন সুন্দর ছেলে থাকতে রাণী পোষ্যপুত্র নেবেন কেন?

—স্বর্গীয় রাজার হুকুম আর রাণীর নিজের খুসী।

—পোষ্যপুত্র যদি নিতেই হয় তবে নিজের মেয়ের এমন সুন্দর সভ্যভব্য ছেলে থাকতে অপরের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন কেন?

—আজ্ঞে আমাদের হিন্দু আইন অনুসারে মেয়ের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নেওয়া যায় না। আরও, আমার ছেলে হয়েই ও জন্মেছে, আমার ছেলেই থাকবে।

—আমি আপনার পরিচয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে পেয়েছি। উনাউএর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রাইলী আপনাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরী দিয়েছিলেন তাও শুনেছি। মিঃ রাইলী আপনাকে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার কাছে তা দেখেছেন বলছিলেন। এখন আপনাকে দেখে আর আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি বিশেষ মুগ্ধ হলাম। পাহাড়পুর রাজ-সংসারে দেখছি একমাত্র আপনিই লেখাপড়া জানা লোক; ভাবী পোষ্যপুত্রের বাবা শুনেছি আধপাগলা বড় বদ লোক। আমাদের ইচ্ছে যে আপনাকেই আমরা রাণীর পোষ্যপুত্রের টিউটার গার্জেন নিযুক্ত করি। আপনার কি মত?

—আপনারা যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, আমি

যথাসাধ্য কর্ত্তব্য করব। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ছেলেকে শিক্ষিত করা ত আমার কর্ত্তব্য বলেই মনে করি।

—আপনাকে যদি আপাতত আড়াই শত টাকা বেতন দেওয়া হয়......

—মাপ করবেন, আমি বেতন নিয়ে কাজ করতে পারব না। আমি অমনই করব—এ আমার শ্বশুরের পুত্র-স্থানীয়, তাকে শিক্ষণ রক্ষণের জন্যে আমি বেতন নিতে পারব না।

—তা হলে আপনাদের একটা মাসহারা ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার হবে।

—আপনারা সে সম্বন্ধেও কোনো চেষ্টা না করলে আমি অনুগৃহীত হব। আমি কারো কাছ থেকে জোর করে বা ভিক্ষে করে কিছু নিতে পারব না।

—তা হলে কি মেয়ে জামাই বিষয় থেকে একেবারে বঞ্চিত হবে?

—সে কথা রাণী নিজে বিবেচনা করবেন।

সাহেবেরা রাখালের নিঃস্বার্থ তেজস্বী স্বভাবের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। রাখাল তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় হইল।

পথের ধারে একজন লোক পথের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবের তাহার কাছে আসিয়া হঠাৎ তাহার পিঠে লাথি মারিল; সে বেচারা উঁচু-বাঁধা পথের নীচে পগারে গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

রাখাল ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কুবেরকে বলিল—তুমি ত ভারি বদ ছেলে! ওকে শুধু-শুধু মারলে কেন?

কুবের গোঁজ হইয়া বলিল—আমি রাজা! আমার সামনে তামাক খাচ্ছিল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল না!

রাখাল আর রাগ চাপিতে পারিল না, কুবেরের কান মলিয়া দিয়া বলিল—এরই মধ্যে রাজাগিরি ফলাতে আরম্ভ করেছ ষ্টুপিড। এমনি করে তুমি প্রজাপালন করবে?

কুবের রাখালের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মনে মনে বলিল—আগে রাজা হই, তারপর কানমলার মজা টের পাইয়ে দেবো!

পরদিনই সে রাজার ছেলে হইয়া গেল। ভবিষ্যতে তাহার রাজা হওয়া রদ করিবার সাধ্য তখন এক যম ছাড়া আর কাহারও রহিল না। এখন হইতে কুবেরকে তাহার পিতার নাম রাজা ধনেশ্বর চৌধুরী বলিতে হইবে, বঙ্কবিহারী মজুমদার তাহার পিতৃপদ হইতে খারিজ হইয়া গেল।

রাজার দৌহিত্র বিষয়ের অধিকারী হইবে বলিয়া যাহার নাম রাখা হইয়াছিল ভূপাল, সে এখন নিঃসম্বল দরিদ্র। আর দরিদ্রের কুঁড়েঘরে যাহার জন্ম হইলেও নাম পাইয়াছিল কুবের, সে ঘটনাচক্রে ধনেশ্বরের উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার নামটাকে সার্থক করিয়া তুলিল। ইহাকেই বলে ভাগ্য!

রাণী জগদ্ধাত্রীর পোষ্যপুত্র লওয়ার উৎসব শেষ হইয়া গেলে মণিমালা রাখালকে বলিল—এইবার ত এখানকার সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল, এইবার চল।

রাখাল বলিল—এখনো যাবার সময় হয়নি। এত লোকের সুখদুঃখ একটা ছোট ছেলের হাতে পড়েছে; সে যদি সৎ হয়ে গড়ে না ওঠে ত লোকের সর্ব্বনাশ করবে; বিশেষতঃ কমিশনার সাহেব আমার হাতে ওর শিক্ষার ভার দিয়েছেন।

মণিমালা স্বামীর সহিত কখনো তর্ক করিতে পারিত না। সে নিরস্ত হইল।

এ বাড়ীতে মণিমালারও বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল। কুবের অকস্মাৎ দিদিকে এ বাড়ীতে প্রধান অবলম্বন মনে করিয়া তাহার নেওটো হইয়া উঠিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী একটা নূতন কিছু বড়মানুষী করিতেছি মনে করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পোষ্য-পুত্রটির নিতান্ত গ্রাম্য চেহারা ও অশিষ্ট ব্যবহার তাঁহার মোটেই ভালো লাগে নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট পুত্রকে প্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য চন্দনমণি সদাই সচেষ্ট ছিল। কুবের একবারও তাহার কাছে গেলে সে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিত—ওরে হাবা ছোঁড়া, যা না তোর

পিসিমার কাছে, ভূপাল যে তোর পিসিমার মন জুড়ে বসছে ; শেষে স্ত্রীধন সম্পত্তিটা কি তাকে দিয়ে ফেলবে !

কুবের রাণীর কাছে গেলে তিনি মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কুবের যদি ডাকিত—পিসিমা। অমনি জগদ্ধাত্রী তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিতেন—পিসিমা ! যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফতুর হলাম সে একদিন মা বললে না। দূর হ চক্ষুশূল আমার সামনে থেকে।

কুবের পিসিমার তিরস্কারে ও মায়ের শিক্ষায় যদি কোনো দিন রাণী জগদ্ধাত্রীকে মা বলিয়া ডাকিত তাহাও তাঁহার ভালো লাগিত না, বেজার হইয়া বলিতেন—অনভ্যেসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে। তোমার আর আড়ষ্ট হয়ে মা বলতে হবে না।

কুবের তিরস্কৃত হইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া গেলে মা তাহাকে আবার ধাক্কা দিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিত। তখন নিরুপায় কুবের কোনোখানে আশ্রয় না পাইয়া রাগে ও দুঃখে একলাটি এককোণে গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; স্নেহের অভাবে তাহার কঠিন মন কঠিনতর হইয়া উঠিতেছিল।

কুবেরের কোনো কিছুর দরকার হইলেও তাহার মা তাহাকে রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিত। তাহাতেও রাণী জগদ্ধাত্রী রুষ্ট হইয়া রূঢ় স্বরে বলিতেন— তোর মা আর বাবাই ত সব করছে, এটা করতে কি হল যে আদিখ্যেতা

করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে?' ইহার ফলে এই হইত যে বেচারা কুবেরের অভাব না মা, না পিসিমা কেহই পূরণ করিতেন না। এইসব কারণে কুবেরের বিরক্ত মন তাহার অধীন চাকর-দাসীদের উপর অকারণে অত্যাচার করিয়া লঘু হইতে চাহিত ; এবং তাহার ফলে সে রাখালের নিকট তিরস্কার ও প্রহার লাভ করিত।

সকল দিক হইতে তাড়া খাইয়া সে একাকী ম্লান মুখে উদাস দৃষ্টিতে কোথাও চুপ করিয়া প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিত।

ইহা মণিমালার চোখে পড়াতে তাহার মন এই হতভাগ্য বালকের উপর করুণায় ভরিয়া উঠিল। তারপর হইতে সে তাহাকে ঐরূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেই তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া স্নেহ-গলিত স্বরে বলিত—কেন ভাই, অমন করে দাঁড়িয়ে আছ? কে বকেছে? তুমি আমার ঘরে এস, কি চাই তোমার?

সেইদিন হইতে মণিমালা খুঁজিয়া-খুঁজিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সকল অভাব মোচন করে, স্নেহ দিয়া যত্ন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দ্যায়।

শেষে হইল এই, একটু কোথাও ব্যথা পাইলেই কুবের দিদির চোখে পড়িবার মতো জায়গাতেই আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু সাহস করিয়া কখনো নিজে সে দিদির ঘরে যাইতে

পারে না; কারণ তাহার মা কোনো দিন তাহাকে মণিমালার কাছে দেখিলেই চোখ টিপিয়া আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে তিরস্কার করিত, মণিমালার ঘরে যাইতে নিষেধ করিত, এবং নিরন্তর তাহার মনে বিষ উদ্গিরণ করিয়া বলিত—রাম সকলের বন্ধু কিন্তু রামের বন্ধু কেউ নয়! ঐ যে ভূপালের মা, খবরদার ওকে এতটুকু বিশ্বাস করিসনে। ওরা তোর সব চেয়ে শত্রু, কারে পেলে পাঁশ পেড়ে কাটবে, বিষ খাওয়াবে।

এইরকম কথা বালকের মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্ক সৃজন করিত। তাহার মন মণিমালার কাছে যাইতে চাহিলেও সে যাইতে পারিত না।

কুবেরকে মণিমালা যে যত্ন করিতেছে এবং কুবেরও যে ক্রমে মণিমালার অনুগত হইয়া উঠিতেছে ইহা চন্দনমণির শ্যেনদৃষ্টি এড়াইল না। চন্দনমণি একদিন দেখিতে পাইল কুবের ভয়চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে চোরের মতন চুপেচুপে মণিমালার ঘরের দিকে যাইতেছে। চন্দনমণি বাঘিনীর মতন লাফাইয়া আসিয়া ছেলের কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার গালে জোরে এক চড় কষাইয়া দিয়া বলিল—অপ্পেয়ে, উড়ে ফড়িং পুড়ে মরে! শত্তুরের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিস? মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান, এও জানিসনে?

কিন্তু চন্দনমণির এত সাবধানতা ও শাসন সত্ত্বেও

কুবেরের চুরি করিয়া দিদির মমতার কাছে ধরা দিতে যাওয়া রোধ করা গেল না। চন্দনমণি সমস্ত দিন সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, পাছে কেউ কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া খায় এই তার সব চেয়ে বেশী ভয়; রাণী জগদ্ধাত্রী সমস্তক্ষণ ভূপালকে লইয়া তন্ময় হইয়া থাকেন; সুতরাং চুরি করিয়া দিদির আদর কুড়াইয়া বেড়াইতে কুবেরকে বেশী বেগ পাইতে হইল না।

(৪১)

মণিমালা যখন অন্দরে কুবেরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন রাখালও বাহিরে আপনাকে নানা কর্ম্মের পাকে জড়াইয়া তুলিয়াছে। কুবেরকে পড়ানো, ঘোড়ায় চড়াইয়া সঙ্গে-সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাওয়া, তাহাকে সৎ উপদেশ দেওয়া রাখালের প্রধান কাজ হইয়াছে; কমিশনার তাহাকে পাহাড়পুর বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন; কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার সকল কাজে তাহারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন; প্রজারা কেহ কোনো বিপদে পড়িলে তাহাকেই আসিয়া ধরে—সেও ম্যানেজারকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করে। কোথাও আগুন লাগিলে রাখাল ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে গিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করে; গৃহহীন-দিগকে পাহাড়পুরে আনিয়া আশ্রয় দ্যায় এবং যাহাতে শীঘ্র তাহাদের নষ্ট গৃহ পুনর্নির্ম্মিত হয় তাহার চেষ্টা ও সাহায্য

করে। কোথাও বন্যা হইলে রাখাল খাবার ও কাপড়ে নৌকা বোঝাই করিয়া সেই গ্রামে গিয়া বাস করে; কোথাও কলেরা হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স লইয়া দিন নাই রাত নাই রোগী দেখিয়া বেড়ায়,—প্রায় লোকই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মর্ম্ম জানে না, তাহাদের কড়া হুকুমে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করায়। কোথাও জলকষ্ট আছে সংবাদ পাইলে সেখানে ইন্দারা করিয়া দিবার জন্য ম্যানেজারকে অনুরোধ করে; যেখানে রাস্তা নাই, সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে দিয়া রাস্তা করাইয়া দ্যায়। বেচন মণ্ডল খুব ধনী, বাড়ীতে হাতী পোষে, অথচ তাহার খড়ের বাড়ী, বছর বছর অগ্নিকাণ্ডে সে গৃহহীন হইয়া কষ্ট পায়, অনেক ক্ষতিও হয়; কিন্তু বাপপিতামহ কেহ ইট পোড়ায় নাই, ইট পোড়ানো তাহাদের সহিবে না, এই ভয়ে তাহারা কোঠা বাড়ী করে না; রাখাল সকল অমঙ্গলের ঝুঁকি নিজের উপর লইয়া নিজের নামে তাহাদিগকে ইট পুড়াইয়া দিয়া তাহাদের কোঠাবাড়ী করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে; ইহার জন্য তাহারা সপরিবারে রাখালের কাছে কৃতজ্ঞ। নূতন পথ হইতেছে, পথের উপর "গ্রামদেবতী"র গাছ পড়িল, কেহ কাটিবে না, গাছটা থাকিলে পথটাতে বিশ্রী একটা মোচড় পড়ে, রাখাল নিজে কুড়ুল ধরিয়া সে গাছ কাটিয়া ফেলিল, অথচ লোকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল জামাই-বাবু মুখে রক্ত উঠিয়া মরিল না; ইহাতে

সকলে রাখালকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তুফানি সাহার জমি জরিপ হইয়া আমিনরা আবিষ্কার করিয়াছে তুফানি একশত বিঘা জমি ছাপাইয়া ছিপাইয়া খাইতেছিল; তুফানি আসিয়া রাখালের সম্মুখে একশত টাকা রাখিয়া হাত কচলাইতে-কচলাইতে বলিল, বাবু পান খাইবার জন্য এই টাকা লইয়া যদি উহার জমিটা ছাড়াইয়া দ্যান; তুফানি রাখালের কাছে চাবুক খাইয়া টাকা তুলিয়া লইয়া দৌড় দিল, কিন্তু কিছুদিন পরে সে দেখিল তাহার বিনা তদ্বিরে একষট্টি বিঘা জমি সে ফেরত পাইয়াছে—সেই জমিটুকুই তাহার হকের পাওনা, বাকী জমিটা সে বাস্তবিকই ছাপাইয়া খাইতেছিল। রাখাল ম্যানেজারকে বুঝাইল যে পাহাড়পুরে ছেলেদের একটি বড় ইংরেজি স্কুল, মেয়েস্কুল, খয়রাতি ডাক্তারখানা ও হাঁস-পাতালের নিতান্ত অভাব আছে; ম্যানেজার নিমিত্ত মাত্র হইল, রাখালই প্রজাদের ডাকিয়া সভা করিয়া তাহাদিগকে স্কুল ও ডাক্তারখানার উপকারিতা বুঝাইয়া চাঁদা আদায় করিয়া গবর্মেণ্টকে লিখিয়া স্কুল ডাক্তারখানা ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিল। ডাক্তার ও মাষ্টারদিগকে লইয়া সে সাহিত্য ও দেশহিতের উপায় আলোচনায় লাগিয়া গেল। এইসব কারণে রাখাল ইতরভদ্র সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। তাহার দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, গম্ভীর প্রকৃতি, সাধু চরিত্র, শুচি বাক্য ও অন্যায়-অসহিষ্ণু তেজস্বী

ক্রোধন স্বভাব দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভয় করিত; যে ব্যক্তি তামাক পর্য্যন্ত খায় না, রহস্য করিয়াও অশ্লীল বা মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করে না, যে এতটুকু ত্রুটি দেখিলে রূঢ় কঠিন দণ্ডবিধান করে, আবার যে বিপদে সহায়, সম্পদে সুখী, উৎসবে বিনা নিমন্ত্রণে আনন্দের ভাগী, তাহাকে সকলে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম যথেষ্টই করিত, কিন্তু বন্ধু বলিয়া কেহ অন্তরঙ্গ হইতে পারিত না।

রাখাল যখন গৌরবের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তখন মূষিকধর্ম্মীরা তাহার গৌরব-মন্দিরের ভিত্তি তলে-তলে খুঁড়িয়া ফোঁপরা করিয়া ফেলিতেছিল। রাখালের গৌরবে সুখী ছিল না তিনজন— বঙ্কবিহারী, চন্দনমণি ও কাঙালী। বঙ্কবিহারী স্বাধীন-নৃপতির জনক, তাহার কাছেই সকলের আসা উচিত; কিন্তু কেহ যে তাহাকে পুছে না সে শুধু রাখালেরই জন্য! প্রজারা তাহাকে জানাইলেই ত সে স্কুল ডাক্তারখানা মঞ্জুর করিয়া দিত; প্রজারা দরখাস্ত করিল না, সে ত আর রাখালের মতন ছোটলোক নয় যে প্রজাদের কাজ যাচিয়া করিয়া বেড়াইবে! রাখাল ছোটলোক, সে সাধারণ লোকের সমকক্ষ হইতে লজ্জা বোধ করে না; কিন্তু বঙ্কবিহারীর ত রাজমর্য্যাদা আছে, সে ত আর যে-সে গরীব টোঙর লোক নয়! আর রাখালের এই যে কাণ্ড সে ত তাহাকেই চাপা দিবার জন্য!

বঙ্কবিহারীর এই ধারণা যে যথার্থ, তাহার প্রধান সাক্ষী ও সমর্থক ছিল কাঙালী। রাখাল কোনো কাজ করিলেই কাঙালী অর্থপূর্ণ স্বরে বলিত—রাজামামা, রাখালের মতলব কি বুঝেছেন তো? আপনার রাজবুদ্ধি, আপনাকে খুলে বলতে হবে কেন!

কাঙালী যাহা নাও ইঙ্গিত করিত বঙ্কবিহারী তাহার অকথিত কথার মধ্য হইতে তাহাও হাতড়াইয়া বাহির করিত।

অন্দরে গেলেই চন্দনমণি বলিত—তুমি যে একেবারে নিবে গেলে! যত-সব রাহু এসে জুটেছে! ভূপাল কুবিরের রাহু, মণি আমার রাহু, রাখাল তোমার রাহু!

তাই ত! বঙ্কবিহারী এই ত্রি-রাহুর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিশেষ রকম চিন্তিত হইয়া উঠিল।

(৪২)

একদিন সন্ধ্যায় তোষাখানায় কিংখাবের তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া বঙ্কবিহারী রূপার গড়গড়ায় জরির লম্বা শটকা লাগাইয়া মৃগনাভি-দেওয়া অম্বুরি তামাক খাইতেছিল; রাখাল পাশের ঘরে বসিয়া কুবেরকে পড়াইতেছিল। খাওয়ার পরিচারক ব্রাহ্মণ প্রাণকৃষ্ণ আসিয়া খবর দিল আহার প্রস্তুত হইয়াছে। রাখাল কুবেরকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বঙ্কবিহারীকে বলিল—মামা খেতে চলুন।

—হঁ হাঁ বাবা চল চল।—বলিয়া বঙ্কবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল—এই, কোই হ্যায় ?

আরদালি বাবুরাম মিশ্র সামনে আসিয়া বলিল—হজুর!

বঙ্কবিহারী বলিল—মিশির, হামারা জুতি ঘুমায় দেও!

বাবুরাম হাত জোড় করিয়া বলিল—হজুর, ম্যয় বাহ্‌মন ; হজুরকো লিয়ে ম্যয় জান দেগা, পর্ ইজ্জৎ নেহি দেগা!

ব্যাপার দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

বঙ্কবিহারী রাখালের সম্মুখে রাজকায়দা করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—বে-আদব, বে-ইমান, তুমকো হাম বরখাস্ত্ কিয়া।......কোই খানসামা হাজির নেই হ্যায় ?

না, কোনো খানসামা সে তল্লাটে নাই। খানসামা ডাকিতে আরদালি ছুটিল। বঙ্কবিহারী খানসামার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ জুতা ফিরাইয়া না দিলে সে যাইবে কেমন করিয়া? কোন প্রাতঃস্মরণীয় নবাব জুতা ফিরাইয়া দিবার লোক না পাইয়া শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়াছিলেন তবু নবাবী চাল ছাড়িয়া নিজে জুতা ফিরাইয়া পরিয়া পলায়ন করেন নাই বলিয়া শোনা আছে ; নবাবের প্রাণের কাছে বঙ্কবিহারীর খাবার জুড়াইয়া যাওয়া ত অতি তুচ্ছ!

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনিই পায়ে করে জুতোটা ঘুরিয়ে পরুন না।

বঙ্কবিহারী নবাবী চালে বলিল—ও রকম করে পাদুকা পরা আমার অভ্যাস নাই।

রাখাল হাসিতে-হাসিতে বলিয়া ফেলিল—জুতোপরা অভ্যাসটাই আপনার কত দিনের?

বঙ্কবিহারীর চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল।

কাঙালী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া জুতা ঘুরাইয়া দিল।

রাখাল ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

বঙ্কবিহারী কাঙালীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—হাঁ, তুমি আমার ভগ্নীপুত্র আছ, কোনো দোষ নাই, দিতে পার, দিতে পার, তুমি ভক্তিমান আছ, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করবেন!

—আমি আপনাকে ভক্তি করি, রাখালের তা সহ্য হয় না। দেখলেন ত কেমন করে চলে গেল।

—এর উচিত প্রতিফল দিতে হবে। তুমি বুদ্ধিমান আছ, ভেবে চিন্তে সত্বর একটা উপায় নিরূপণ কর।

—যে আজ্ঞে, ভেবে দেখব।—বলিয়া কাঙালী বাসায় গেল। বঙ্কবিহারী খাইতে অন্দরে গেল।

খাইতে বসিয়া রাখাল দেখিল তাহার লুচিগুলি কাঁচা আছে, এবং বঙ্কবিহারী ও কুবেরের পাতের লুচিগুলি বেশ খর-ভাজা। সাত ভুতে জুটিয়া তাহার কুবেরের

ভাণ্ডার সমস্ত খাইয়া ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিতেছে ইহা চন্দন-মণি সহ্য করিতে পারিতেছিল না; এজন্য সে প্রত্যেকের পাওনা যথাসাধ্য করমকষ্যি করিয়া কমাইয়াছে। যে এক-সের চাউলের সিধা পাইত, সে এখন আধসের পায়; আগে যত মাছতরকারী রান্না হইত এখন তাহার অর্দ্ধেক হয়, পাচকেরা ঘি-তেলের টানাটানি লইয়া অসন্তোষ ও রন্ধনে অক্ষমতা প্রকাশ করে; চাকর-দাসীরা খাইতে পায় না বলিয়া খুঁৎখুঁৎ করে; যাহারা আগে লুচি খাইত তাহাদের রুটি ও যাহারা রুটি খাইত তাহাদের ভাত বরাদ্দ হইয়াছে;—চন্দনমণি ত আর সমস্ত লুটাইয়া দিয়া কুবেরকে ফতুর হইতে দেখিতে পারে না। সকলেরই বরাদ্দ কমিয়াছিল, কেবল রাখাল মণিমালা ভূপাল ও রাণী জগদ্ধাত্রীর নিয়মিত বরাদ্দ কমাইতে তাহার সাহসে কুলায় নাই; তবে রাখাল ও মণিমালার বরাদ্দ নামে মাত্র ঠিক ছিল, তাহাদের লুচির তুপিঠ ভাজা হইত না। আর বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছিল চন্দনমণির নিজের ও তাহার স্বামী বঙ্কবিহারীর। ক্ষীর-পারা দুধ না হইলে তাহারা খাইতে পারে না, আধা-ছানার মণ্ডা ছাড়া মুখে রুচে না, পোলাও কালিয়া লুচি কচুরি সর ননী প্রায়ই চাই—কারণ এই রকমই তাহাদের খাওয়া চিরকালের অভ্যাস!

রাখাল লুচি ছিঁড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—

মামী, এই কাঁচা লুচির চেয়ে দুটি সুসিদ্ধ ভাতের ব্যবস্থা যদি করে দাও......

চন্দনমণি সমস্ত শরীর দুলাইয়া কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—ওমা! লুচি কাঁচা আছে কি গো! এমনি লুচিই ত আমার বাবুদাদার বাড়ীতে হয়!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোমার বাবুদাদা বুঝি খুব বড়লোক!

—বড়লোক আবার নয়! সাতমহল বাড়ী, হাতী-শালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া! পায়রার ডিমের মতন গজমোতির একছড়া হার আছে; বাবুদাদা হাতীর দাঁতের তক্তপোষে শোন; গোলাপজলে মুখ ধোন! শিকার করতে যান বাঘ সিংহী গণ্ডার সজারু কত কি, হাতীর পিঠের ওপর সোনার জিন কষে!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ঘোড়ার জিন মামীমা, হাতীর হাওদা।

চন্দনমণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—ওমা! মণি! তোদের এখানে বুঝি হাওদা বলে! আমাদের ওখানে বলে জিন। তোদের বুনো দেশের বুনো কথা শুনে হাসি পায় বাছা। হাওদা! হাওদা আবার একটা কথা হল!

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—কিন্তু লুচির সঙ্গে সিমের তরকারীও কি তোমার বাবুদাদা ভালোবাসতেন?

—উঃ বড্ড! সাতটা বাগানে শুধু সিম হত! একবার

এত সিম হয়েছিল যে সোম-বচ্ছর কাঠ কিনতে হয়নি, সিম আর আমসির জ্বালে রান্না হল! বাবুদাদা বলতেন, আহা! এমন সিম সব পুড়িয়ে ফেলছিস তোরা চন্দন! আমায় সিমের কোপ্তা কালিয়া ছেঁচকি করে দিস! সকাল বেলা পাঁউরুটি জল-খেতেন কিনা, সক্কালে উঠে বারো মাস ত্রিশ দিন সিম-ছেঁচকি আর পাঁউরুটি টাটকা করে দিতে হত।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—পাউরুটি করতে জানো নাকি মামীমা?

—প্‌ছ্‌! আমরা করতে যাব কেন? হালুইকর বামুন ছিল; বেলে বেলে তেলে ফেলত আর ফোঁস ফোঁস করে ফুলে উঠত!

ইহার পর আর কেহই কোনো কথা বলিতে পারিল না। রাখাল মাথা নীচু করিয়া আহারে মনোযোগ দিল। মণিমালা ভূপালের মাছের কাঁটা বাছিবার জন্য খুব ঝুঁকিয়া পড়িল। কেবল বঙ্কবিহারী সহধর্ম্মিণীর আভিজাত্যগৌরবের সম্মুখে সকলকে অধোবদন ও নিরুত্তর দেখিয়া বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া ঘন ঘন গোঁফে চাড়া দিতে লাগিল।

চন্দনমণি রাখালকে পাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল—সিম-ছেঁচকি খেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে কি বাবা? আলুর তরকারী এনে দেবো কি একটু?

রাখাল মুখ তুলিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল—আমি গরিবের ছেলে মামী, আমি তোমাদের মতন কোনো বাবুদাদার ঐশ্বর্য্য চোখেও দেখিনি; আমি যে-দাদামশায়ের বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলাম সেখানে এই সিম-ছেঁচকিও আমার জুটত না, দিদিমা আমাকে কলাপোড়া ভাত দিতেন! তাই, আমার কিছুতেই কষ্ট হয় না; আমার মনে কষ্টের টিকে দেওয়া হয়ে গেছে!

মণিমালার চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরিতে লাগিল, মণিমালা ভূপালের মাছের কাঁটা-বাছা ফেলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি রাখালের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—তা ত বটেই, ঠিক কথাই ত। তুমি গরিব গেরস্তঘরের ছেলে, তোমার যা-তা একটা কিছু হলেই হল। কিন্তু আমি ত দাদাবাবুর বাড়ীতে মানুষ! হলে হবে কি? আমারও ভালো জিনিস মুখে রুচত না। বাড়ীতে সোনার সামিগ্‌গিরি থইথই করছে, আমি তা খেতে পারতাম না, আমি সেই ময়রার দোকানে গিয়ে মুড়িমুড়কি কিনে খেতাম! ছেলেবেলায় পয়সা ত পেতাম না—এক-একখানি করে তাবিজের দাঁতি খুলে খুলে ময়রাকে দিতাম আর মুড়িমুড়কি খেতাম!

রাখাল হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাবুদাদা কৃপণ ছিলেন বুঝি? পয়সা হাত থেকে বেরুত না?

—কৃপণ! এক-ঝাঁকা সিকি-পয়সা ছিল; সিকি-পয়সার রেওয়াজ উঠে যেতে সেই এক-ঝাঁকা সিকি-পয়সা নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ঢেলে দিলেন; গাঁয়ের ছেলেরা তাই নিয়ে ময়না-পুকুরে ছিনিমিনি খেলত! ... তুমি যে কিছুই খেলে না বাবা?

রাখাল হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। বলিল—সামান্য জিনিস খাওয়া অভ্যেস করেছিলাম মামী, কিন্তু কাঁচা খেতে অভ্যেস করিনি।

চন্দনমণি মুখ নাড়িয়া বলিল—লুচি খাওয়া তোমার অভ্যেস নয় কিনা, তাই অমন লাগছে। আচ্ছা, কাল থেকে ভাতের ব্যবস্থাই করে দেবো!

(৪৩)

রাখাল আঁচাইয়া ঘরে আসিতেই মণিমালা তাহার হাত ধরিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল—এইবার বাড়ী চল।

রাখাল ব্যথিত হাসি হাসিয়া বলিল—বাড়ী! বাড়ী ত আমার কোথাও নেই মণি! গোসাঁইগঞ্জে রাঙাদিদিমা তোমাকে যে কষ্ট দেন, মামী আমাকে তা এখনো দিতে পারেননি। আমি তোমাকে সে কষ্টের মধ্যে আর টেনে নিয়ে যাব না, আমার এ কষ্টের চেয়ে সেখানে তোমার কষ্ট আমার মনকে বেশী পীড়া দ্যায়।

—রাঙা-দিদির কাছে না হয় না থাকব, দুজনে এক-

খানা কুঁড়ে করে তোমার উপার্জ্জনের খুদকুঁড়ো আমি হাসিমুখে খাব; সেখানে আমি তোমাকে ত যত্ন করতে পারব।

—গোসাঁইগঞ্জে গিয়ে থাকব অথচ যাদের খেয়ে আমি মানুষ তাদের থেকে পৃথক হয়ে থাকব এ আমাকে দিয়ে হবে না। যেতে হলে তাঁদের সংসারেই থাকতে হবে। কিন্তু মণি এখানে আমার কিছু কষ্ট নেই, কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছ? কুবের আমাদের হাতে এসে পড়েছে, তাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবে?—সে ত শুধু তোমার মামার ছেলে নয়, সে যে এখন তোমারই মা-বাপের ছেলে; তোমার ভাই!

এ কথায় মণিমালাকে নিরুত্তর হইতে হইল, কিন্তু তাহার মন আরাম পাইল না। তাহারা চলিয়া গেলে কুবেরের কষ্ট খুবই হইবে, কিন্তু—।

এই কিন্তুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার সাহায্য করিল অতি গোপনে কাঙালী।

কাঙালী বঙ্কবিহারীকে পরামর্শ দিল যে বঙ্কবিহারী বোর্ডে দরখাস্ত করুন এই বলিয়া যে নাবালগ রাজার শিক্ষা ও রক্ষণের ভার রাখালের উপর দেওয়া অন্যায় হইয়াছে, কারণ রাখালের স্বার্থ কুবেরের স্বার্থের বিরোধী; এরূপ বিরুদ্ধ-স্বার্থের লোকের হাতে বালক রাজার ভার পড়াতে রাজার শারীরিক মানসিক ক্ষতি ও অপকার হইবার যথেষ্ট

সম্ভাবনা আছে। বালক রাজার মৃত্যু হইলে যখন রাখালের পুত্রেরই বিষয়ের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা তখন রাখালের নিকট কুবেরের হিত আশা করা অগ্নি হইতে জল লাভের আশার ন্যায় নিতান্তই অসম্ভব।

বঙ্কবিহারী খুসী হইয়া বলিল—বাবাজী, তুমি তীক্ষ্ণধী আছ! ভবিষ্যতে তোমাকে মন্ত্রী করে দেবো! বাবাজী, তুমিই দরখাস্তটা মুসাবিদা করে লিখে দিও—তুমিই আমার দক্ষিণ হস্ত, হবে না কেন, ভক্তিমান ভগ্নীপুত্র আছ!

—এই দরখাস্তটাতে যদি রাণীমার দস্তখত করিয়ে দিতে পারেন তবে খুব জোর হয়।

—তার আর চিন্তা কি! সে হয়ে যাবে!

কাঙালী দরখাস্ত লিখিয়া দিল। বঙ্কবিহারী সেইখানা লইয়া গিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে সই করিয়া দিতে বলিল। জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—এটা কি?

—কুবেরের জন্যে একজন ভালো মাষ্টার রাখবার দরখাস্ত।

—কেন, রাখাল ত পড়াচ্ছে?

—রাখাল ত সদাসর্ব্বদা নানান কাজ নিয়ে নাম কিনতেই ব্যস্ত, ও কি কুবেরকে পড়ায়, না ওর খোঁজ রাখে? আর ও অস্থায়ী লোক, বাড়ী চলে যাবে শুনছি, কুবেরের ভালো হয়েছে এ আর চোখে সহ্য হচ্ছে না। এ রকম হিংসুক লোকের হাতে কুবেরকে ছেড়ে দেওয়া আর যমের

মুখে ছেড়ে দেওয়া দুইই সমান। আপনি দেখেছেন ত দিদি, রাখাল কুবেরকে কি রকম শাসনই না করে? সেদিন একটু তামাক খেয়েছিল বলে বেদম করে মারলে। স্বাধীন নৃপতির গায়ে হাত তোলা! রাজা সে, তামাক খাবে না?

জগদ্ধাত্রী দেখিলেন কথাগুলা সমস্তই যুক্তিসঙ্গত বটে। তিনি কলম লইয়া সই করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রত্যেক-বার সই করিবার সময় তাঁহাকে নামের বানান ও অক্ষর লিখিতে দেখাইয়া দিতে হইত; বঙ্কবিহারী বলিতে লাগিল—এইখান থেকে লিখুন,—শ্রী, ম, তয়ে দীর্ঘঈ, রয়ে আকার, মূদ্ধণ্য ণয়ে দীর্ঘঈকার, বর্গীয় জ, গ, দয়ে ধয়ে আকার, তয়ে রফলা—এ লিখে মাত্রা দিন, হাঁ, এই দিকে এইখানে দীর্ঘঈকার দিন, তারপর দয়ে একার, বয়ে দীর্ঘঈকার, চয়ে ঐকার—এদিকে একার, এপাশে আকার দিয়ে মাথা উড়িয়ে দেন, হাঁ ঠিক হয়েছে, ধয়ে হ্রস্বউ, রয়ে আকার, মূদ্ধণ্য ণয়ে দীর্ঘঈকার। পাশে একটা কসি টেনে দেন, হাঁ।

দরখাস্ত ম্যানেজারের মারফতে বোর্ডে প্রেরিত হইবে; ম্যানেজারকে দেওয়া হইল। ম্যানেজার কুবেরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল-বাবুর উপর টুমি খুসী আছে?

কুবের ঘাড় জোরে নাড়িয়া বলিল—না।

—কেনে?

—বড় বকে, মারে।

—দোস্‌রা মাষ্টার হোলে টুমি খুসী হোবে।

কুবের উৎসাহিত হইয়া বলিল—হাঁ।

তারপর ম্যানেজার রাখালকে ডাকিয়া বলিল—রাখালবাবু, দেখেছেন?

রাখাল দরখাস্তের নীচে রাণী জগদ্ধাত্রীর সই দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—'মা এমন কথা লিখলেন? মাও আমাকে সন্দেহ করছেন!' —কিন্তু একথা তার একবারও মনে পড়িল না যে রাণী জগদ্ধাত্রীর নিজের শিক্ষা ও বুদ্ধি মোটেই নাই, তিনি যে-রকম দুর্ব্বল চরিত্রের লোক তাহাতে তাঁহাকে দিয়া কিছু করাইয়া লওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত হাসি হাসিয়া রাখাল বলিল—এ কথাটা আমারই মনে পড়া উচিত ছিল; কুবেরের শিক্ষণ ও রক্ষণের ভার আমার নেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি এখন বুঝতে পারছি। আপনি এ দরখাস্ত বোর্ডে পঠিয়ে দিন।

—তার চেয়ে আপনি পদত্যাগ করে আমার মারফতে বোর্ডে একখানা ইস্তফা-পত্র পাঠিয়ে দিন, আমি এ দরখাস্ত পাঠাব না।

রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ভাবিয়া বলিল—না সাহেব, এ কথা ত আমার নিজে-থেকে মনে পড়েনি, এই দরখাস্ত আপনি দেখালেন বলে মনে পড়ল।

আমি ইস্তফা দেবো না, বরখাস্ত হওয়ার অপমানই আমাকে স্বীকার করতে হবে—সেটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য!

সাহেব ম্যানেজার আপন মনে বলিয়া উঠিল—O how noble!......রাখালবাবু, আমি আপনাকে যত দেখছি আপনার ওপর তত শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল—আপনি আমাকে বন্ধুত্বের সম্মান দিয়েছেন বলে ওরূপ মনে করছেন। আমি ত শুধু ন্যায় আর কর্ত্তব্য পালন করতে চেষ্টা করি, মানুষের এতে প্রশংসা পাবার কিছু নেই, না করলে নিন্দা পাবার কারণ আছে বটে!

বোর্ড হইতে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল; রাখালকে বরখাস্ত করা হইল। এত বড় গর্ব্বিত রাখালের এই অপমানে বঙ্কবিহারী ও কাঙালী খুব উৎফুল্ল হইল, কিন্তু আর সমস্ত দেশের লোক এত বড় মানী-লোকের গৌরব-হানি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আবার রাণী জগদ্ধাত্রীর সইকরা আর-এক দরখাস্ত পড়িল রাখালের স্থানে কাঙালীকে শিক্ষক ও রক্ষক নিযুক্ত করা হোক।

ম্যানেজার রাখালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা রাখালবাবু, এই ষ্টেটের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাউকে কি ওয়ার্ডের টিউটর গার্জিয়ান হওয়ার উপযুক্ত মনে হয়?

রাখাল অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—কাঙালী

লে আপাততঃ কাজ চলতে পারে; তবে সে আমার আনা আমার দেশের লোক, তাকে নিযুক্ত করলেও আপত্তি হবে।

ম্যানেজার হাসিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর আবেদন দেখাইল। রাখাল দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল—তা হলে ঠিকই হয়েছে, আপনি সুপারিশ করে দিন।

—কত মাইনে দেওয়া যাবে ওকে? এখন এক-শ টাকা পাচ্ছে।

—দুশো টাকা হলেই ঠিক হবে বোধহয়।

—বড় বেশী হল না? আমি একশ পঁচিশ কি দেড়শ লিখব ভাবছিলাম।

—কাজের দায়িত্ব বড় বেশী, আর পদের মর্য্যাদার অনুরূপ বেতন না হলে লোকের কাছে ও সম্মান পাবে না।

—আচ্ছা তবে তাই হবে।

ম্যানেজার কুবেরকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাঙালীবাবু মাষ্টার হোলে তুমি খুসী হোবে?

কুবের উৎফুল্ল হইয়া বলিল—হাঁ, খুব!

—কেনে?

—কাঙালী-বাবু আমাকে রাজাবাবু বলে, ওর সামনে আমি তামাক খাই, তবুও আমাকে কিছু বলে না—এক-দিন আমাকে তামাক সেজে দিয়েছিল!

ম্যানেজার হাসিল।

কাঙালী দুশো টাকায় কুবেরের শিক্ষক নিযুক্ত হইল। কিন্তু সে রাখালের উপর হাড়ে চটিয়া গেল—কারণ, ম্যানেজার-সাহেব তাহাকে আড়াইশো টাকা বেতন দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, রাখাল মাঝে পড়িয়া পঞ্চাশ টাকা কমাইয়া দিয়াছে—সাহেবের খানসামা জুম্মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে নাকি জানিয়াছে!

(৪৪)

রাখাল মণিমালাকে বলিল—মণি, আমার এখানকার কাজ চুকে গেছে, এইবার চল।

মণিমালার মুখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এখন যাওয়া ঠিক হবে না, লোকে বলবে এতদিন আমরা স্বার্থের জন্যে পড়ে ছিলাম, যেই কাজ গেল অমনি আমরা চলে যাচ্ছি। আরও, আমরা চলে গেলে কুবেরের বড় আবস্থা হবে।

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে। কিন্তু এখানে শুধু-শুধু বসে ভাত ধ্বংস করাটা কি ভালো দেখাবে?

মণিমালা মনে মনে খুসীই হইয়া বলিল—তবে এখনি চল মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

রাণী জগদ্ধাত্রী ভাত খাইয়া শুইয়া একটি সোনা-বাঁধানো কলি-হুঁকায় তামাক খাইতেছেন, সর্ব্বর মা ও ঝুনকিয়া দাসী পা চাপিতেছে, চন্দনমণি মাথার কাছে বসিয়া পাকা

চুল তুলিয়া দিতেছে। মণিমালার পিছনে পিছনে রাখালকে সেই ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হুঁকাটা তিনি চন্দনমণির হাতে দিয়া বলিলেন—বৌ, বৌ, শিগগির এটা লুকোও!

চন্দনমণি হুঁকা লইয়া বলিল—তুমি দিদি ওদের দেখে ভয় কর!

জগদ্ধাত্রী লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—ভয় নয়, ওরা খায় না তাই ওদের কাছে খেতে লজ্জা করে।

চন্দনমণি কোনো দিন তামাক খাইত না; সে দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া রাখাল ও মণিমালা যাহাতে দেখিতে পায় এমন ভাবে খুব সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ভড়র ভড়র করিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রাখাল ও মণিমালা তাহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি উচ্চরবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, রাণী জগদ্ধাত্রীও খুলখুল করিয়া হাসিতে লাগিলেন—রাখাল ও মণিমালা খুব জব্দ হইয়া গিয়াছে!

চন্দনমণি বলিল—দেখলে দিদি! এ বাড়ীর কর্ত্তা তুমি আর আমি; ওরা ত নয়! ভয় করতে হয় ওরা করবে, আমাদের যা খুসী আমরা করব। পছন্দ না হয় ওরা নিজের পথ দেখুক!

জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন—ওরা যাবে যাবে শুনছিলাম, কবে যাবে?

—গেলেই হল, কোনো কাজ নেই কর্ম নেই, উড়ে ব'সে ঝুঁরো লুসছেন আর কুবিরের হিংসেতে জ্বলে' মরছেন বৈ ত নয়!

জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া গেলেন।

চন্দনমণি পরম সুযোগ পাইয়া কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া জগদ্ধাত্রীর চুলের রাশি হাতে তুলিয়া বলিল—এমন রেশমের মতন চুল এক ঢাল, তুমি বাঁধো না কেন দিদি?

—পিঠের ওপর পড়ে' যখন গা-টা গিজ-গিজ করে তখন এক-একবার ভাবি বাঁধি, কিন্তু মণি আর রাখাল কি মনে করবে ভেবে বাঁধতে পারিনে।

চন্দনমণি আর কথাটি না বলিয়া উঠিয়া গিয়া আলমারী খুলিয়া আয়না চিরুণী ফিতে কাঁটা জরির গোটা আনিয়া বলিল—দিদি উঠে বস।

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া বসিয়া হাসিয়া বলিলেন—এই বুড়ো বয়সে কি সং সাজাবি বৌ! চুলটা না হয় জড়িয়ে দে, খোঁপায় আর গোটা দিসনে! বুড়ো বয়সে লোক হাসবে?

চন্দনমণি চুল বিনুনি করিতে করিতে বলিল—বুড়ো! আমি পুরুষমানুষ হলে তোমায় নিকে করতাম!

জগদ্ধাত্রী খুসীতে খুলখুল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দনমণি একখানি কালা-ফিতে-পাড় ফরাসডাঙার ধুতি বাহির করিয়া জগদ্ধাত্রীকে পরাইল; গহনার বাক্স খুলিয়া গলায় হার, বাহুতে অনন্ত, আঙুলে আংটি পরাইল।

জগদ্ধাত্রী খুসী হইয়া বলিলেন—করছিস কি বৌ? বিধবা মানুষের কি এসব পরতে আছে?

চন্দনমণি বলিল—বিধবার পরতে নেই নোয়া সিঁদুর আলতা! গহনা পরতে দোষ নেই।

চন্দনমণি জড়োয়া বালা তুলিয়া পরাইতে গেল।

জগদ্ধাত্রী কুণ্ঠিত হইয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন—না, না, নীচে-হাতটা শুধু থাক।

রাণী জগদ্ধাত্রীর মনের মধ্যে যে বিলাসিতা অতৃপ্তিতে ব্যথিত হইয়াও লোকলজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া ছিল, তাহা চন্দনমণির সাহায্যে ও সমর্থনে সার্থক হইতে পারিয়া রাণীকে অত্যন্ত আরাম ও আনন্দ দিল।

মণিমালা ও রাখাল চন্দনমণির তামাক খাওয়া দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল; ক্ষণেক বিলম্ব করিয়া আবার তাহারা আসিয়া দেখিল এই অভাবনীয় ব্যাপার।

মণিমালা অবাক হইয়া মায়ের কাণ্ড দেখিল। মা তাহার নিকটে একটু লজ্জিত হইলেও এই সজ্জায় তাঁহার মন খুসী আছে দেখিয়া সে দুঃখিত হইল। একেই সে মায়ের কাছে বিনা পাহারায় আসিতে পাইত না বলিয়া বড় একটা ঘেঁসিত না, তাহার উপর মায়ের এই বেশ দেখিয়া মায়ের ত্রিসীমানায় থাকিতে তাহার আর প্রবৃত্তি মাত্র রহিল না।

রাখাল অন্যায় দেখিতে পারে না। সে স্পষ্ট মুখের

উপর বলিয়া বসিল—মা, এ আবার কি সং সাজলেন? এ আপনার উপযুক্ত হয়নি। এতে স্বর্গীয় মহারাজকে অপমান করা হচ্ছে!

রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। চন্দনমণিও রাখালের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মণিমালাও চলিয়া গেল।

রাখাল চলিয়া গেলে চন্দনমণি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—বাপরে! যারপরনাই ছেলে কুবির, সে কিছু বললে না, আর উনি কোথাকার কে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে এলেন শাসন করতে!

চন্দনমণি জগদ্ধাত্রীর কানে গুঞ্জন করিতে লাগিল—কখ্খনো শুনো না দিদি; তুমি বড়, না ওরা বড়! মহারাজের মান কিসে থাকবে বা যাবে তা তুমি বোঝ বেশী, না ঘুঁটে-কুড়ুনির ছেলে একটা কোথাকার হাভাতে টোঙর সে বেশী বোঝে? কুবির ত তোমায় কিছু বলেনি। যতক্ষণ সে কিছু না বলছে, ততক্ষণ তোমার কাকে ভয়?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া থাকিলেন। দেখিয়া চন্দনমণি বলিল—কণ্টক বিদায় করে দিলেই পার! তুমি না বলতে পার, আমি বলব।

জগদ্ধাত্রী তাহাতেও কোনো হাঁ কি না বলিলেন না দেখিয়া চন্দনমণির সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

(৪৫)

রাণী জগদ্ধাত্রীর ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মণিমালা রাখালকে বলিল—আর আমাদের এ বাড়ীতে থাকা উচিত নয়, আমরা ক্রমে ফাল্‌তো হয়ে উঠছি।

রাখাল চিন্তাকুল মুখে বলিল—কিন্তু এখন আমরা চলে গেলে এই পরিবারটাকে একেবারে সর্ব্বনাশের মুখে ফেলে দিয়ে যাওয়া হবে। চন্দনমণি মাকে দুর্ব্বল পেয়ে তাঁকে অধঃপাতের পথে ঠেলে নিয়ে চলছে।

—আমরা থেকে কি করব? কি বা করছি?

—আমরা অনেকখানি বাধা হয়ে আছি। আমরা সরে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। ওদিকে কাঙালী বড় হাল্কা ধরণের লোক, তার হাতে কুবের পড়েছে, কাঙালীকে সামলে রাখাও আমার কর্ত্তব্য।

মণিমালা আবার নিরস্ত হইল।

কিন্তু চন্দনমণি নিরস্ত হইতে পারিতেছিল না। দিদিকে অত্যাচারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার আগ্রহ ও দরদ তাহার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাখাল সেদিন খাইতে বসিয়া বলিয়াছিল কাঁচা লুচি অপেক্ষা সুসিদ্ধ অন্ন তাহার অধিক রুচিকর। লুচি সুপক্ক হইল না, লুচির স্থান অন্ন গ্রহণ করিল। সেদিন রাত্রে এক-

জায়গায় বসিয়া বঙ্কবিহারী ও কুবের খাইল লুচি এবং রাখাল খাইল ভাত।

মণিমালা ঘরে আসিয়া রাখালকে বলিল—আর থাকা উচিত নয়, এখনো মানে মানে যাই চল।

—কেন, অপমান কোথায় দেখলে? লুচির চেয়ে ভাতই ত আমি ভালো বাসি; আমি ভাত খেতে চেয়েছিলাম বলেই ভাত হয়েছে।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি আপনার বাড়ীতে শাক ভাত খেতে পার, কিন্তু পরের বাড়ীতে কেউ যদি নিজে লুচি খেয়ে তোমাকে ভাত খেতে দ্যায় সেটা কি অপমান নয়? তোমার পায়ে পড়ি তুমি এখান থেকে চল।

—দাঁড়াও, আমি যে কটা কাজ আরম্ভ করেছি শেষ করে নিতে দাও, তারপর তোমার কথা শুনব।—পাঁচটা পরগণায় পাঁচটা বড় স্কুল আর খয়রাতি ডাক্তারখানা করছি; এখানকার স্কুলটাকে কলেজ করবার জন্যে লেখালেখি হচ্ছে, হয়ত হবে। দেশটার একটু শ্রী ফিরিয়ে দিয়ে, লোকগুলোকে একটু মানুষ হবার পথ দেখিয়ে দিয়ে তবে যাব, ততদিনে কুবেরও সাবালগ হয়ে যাবে।

—এমনি করতে করতে তোমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, তখন কি আর তুমি কোনো কাজকর্ম্ম করতে পারবে?

—নাইবা পারলাম মণি! আমাদের দুটো পেটের জন্য ভাবনা?

—ষাট্, ভূপাল আর বিভা বেঁচে থাক, আমাদের দুটো পেট হতে যাবে কেন?

—ওদের ভাবনা কুবের ভাববে মণি। আমি কুবেরের মঙ্গলের জন্যে আমার সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিলাম, আমার ছেলেদের সে দেখবে না? সে মামা, ভূপাল ভাগনে; আর ভূপাল অমনি তার মামার অনুগ্রহ নেবে না, ষ্টেটের সেবা করে তার বদলে রাজার ভাগনে হয়ে প্রতিপালন হবে। কুবের তোমাকে কত ভালো বাসে দেখছ ত? সে ভূপালকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না, বিভাকে দেখলেই বুকে করে নেয়।

মণিমালার হৃদয় এই কথায় কুবেরের প্রতি স্নেহে ভরিয়া উঠিল। আহা বালক সে, সে দিদিকে তাহার পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াও সকলের অনাদরে তাহার ব্যথিত হৃদয় সেই দিদিরই স্নেহে জুড়াইতে চাহিতেছে। তাহাকে মণিমালা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই, সেও যে পরম নিশ্চিন্ত মনে তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই স্নেহের বন্ধন কি কখনো টুটিবার?

মণিমালা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তবে একটি কথা আমার শুনতে হবে তোমাকে; তুমি আর সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে পাবে না, তোমাকে আজ থেকে ঘরে খেতে হবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—তোমার মনের মধ্যেকার রাজ-কন্যাটি এই কথা তোমাকে দিয়ে বলাচ্ছে। তা, আচ্ছা, তাই হবে।

আজ হইতে রাখাল এক-বাড়ীতে থাকিয়াও কতকটা ভিন্ন হইয়া পড়িল। এক সংসারে রান্না হইলেও মণিমালা রাখালের খাবার যাহা পাইত তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া দিত।

একাদশী। রাখাল আজ ভাত খাইবে না। মণিমালা চন্দনমণিকে বলিল—মামী, আজ ওঁর একাদশী।

চন্দনমণি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—লোকের বের্‌তো নিয়ম করতে হয়, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে করা উচিত। আর নইলে সংসারে যা রান্না হবে তাই খেতে হবে। জোনাজাতের ফরমাস-মতন রাঁধতে হলেই ত চিত্তির!

মণিমালার অত্যন্ত রাগ হইল বলিয়া সে আর কোনো কথাই না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ঠাকুর-বাড়ীতে রাত্রে ঠাকুরের ভোগ হয় লুচি। মণিমালা ঠাকুর-বাড়ীর পরিচারক গুরুপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিল—গুরুদাদা, আজ ওঁর একাদশী, রাত্তিরে লুচি খাবেন; বাড়ীতে লুচি ভাজার স্থবিধে হবে না; তুমি একপোয়া ময়দা কিনে ঠাকুরের লুচি ভাজা হলে যদি একটু কষ্ট করে ভেজে দ্যাও! এখন আমার হাতে পয়সা নেই, ময়দার দাম তোমায় দুদিন পরে দেবো!

হায় রাজার মেয়ে! একপোয়া ময়দা কিনিবার পয়সা হাতে নাই!

গুরুপ্রসাদ ব্যথিত হইয়া বলিল—দিদি, পয়সা দিতে হবে কেন? ঠাকুরবাড়ীর ময়দাও ত সে তোমারই বাপের পয়সার!

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার বাপের পয়সায় তাহার আর অধিকার কৈ?

শীঘ্রই বাড়ীর চাকর-দাসীরা টের পাইল যে জামাই-বাবুর আজ একাদশী, কিন্তু চন্দনমণি তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা কিছুই করিল না। সকলেই চন্দনমণির উপর দারুণ বিরক্ত হইয়া ছিল, ইহাতে সকলে বেশী করিয়া বিরক্ত হইল।

খাবারের পরিচারক প্রাণকৃষ্ণ সন্দেশ ও চিনি লইয়া গিয়া মণিমালাকে দিয়া আসিল; ঘিসু ভাণ্ডার হইতে ক্ষীর ও কলা লইয়া গিয়া দিয়া আসিল। মণিমালা স্বামীর জন্য চাকরদের এই চুরি-করা দানও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। তাহাকে কুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ ও ঘিসু বলিল—এসব ত আপনারই জিনিষ আপনাকে এনে দিচ্ছি দিদি!

রাত্রে রাখাল খাইতে বসিয়া আহারের বিবিধ প্রচুর আয়োজন দেখিয়া হাসিয়া বলিল—দেখ ত কত আয়োজন হয়েছে, আর তুমি বল কিনা যে মামী বিরক্ত হন! লুচি কাঁচা ছিল বলেছিলাম বলে আজকে কেমন খর লুচি ভেজে দিয়েছেন।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিতে পারিল না।

রাখাল মণিমালার ম্লান মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বুঝিতে পারিল এই আহার জোগাড় করিতে মণি-মালাকে অনেক দুঃখ সহিতে হইয়াছে। রাখালের গ্রাস আর মুখে উঠে না, মুখের খাবার গলা দিয়া নামে না। রাখাল গম্ভীর হইয়া মাথা নত করিয়া খাইতে লাগিল। মনে মনে ঠিক করিল এ বাড়ীতে এই তাহার শেষ আহার, আর না।

মণিমালা রাখালের জন্য দুধ পর্য্যন্ত লইতে আসিল না দেখিয়া চন্দনমণি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উহারা কি আজ তবে উপবাস থাকিবে, না নিজেরাই তোলা উননে কিছু রাঁধিয়া বাড়িয়া লইল, ইহা জানিবার জন্য চন্দনমণির মন ছটফট করিতে লাগিল। চন্দনমণি এক বাটি দুধ হাতে করিয়া সন্ধান লইতে মণিমালার ঘরে গেল। রাখাল বিবিধ উপকরণ লইয়া খাইতে বসিয়াছে দেখিয়া ত তাহার চক্ষু স্থির! সে খাইতে না দিয়া এ যে রাখালের সুখের দশা করিয়া তুলিয়াছে, এই আপশোষ তাহার মনের সর্ব্বাঙ্গে চিমৃটি কাটিতে লাগিল! সে অবাক হইয়া রাখালের রাজভোগ খাওয়া দেখিতে লাগিল।

চন্দনমণি আসিয়া স্তম্ভিত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রাখাল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—অবাক হয়ে কি দেখছ?

সেই কথার আঘাতে সচেতন হইয়া চন্দনমণি থতমত খাইয়া বলিল—দুধ এনেছি। কিসে ঢেলে দেবো?

রাখালের মন ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে পূর্ণ হইয়া ছিল। সে বাঁ হাতের তেলো মাথায় চাপড়াইয়া কর্কশ স্বরে বলিল—মাথায়!

তাহার ক্রোধন স্বামী না জানি কি অনর্থ বাধায় এই ভয়ে মণিমালা তাড়াতাড়ি বলিল—আমার ত আর আলাদা বাসন নেই মামী, বাটি সুদ্ধই রেখে যাও।

—এ বাটি যে রূপোর!

মণিমালা ম্লান মুখে হাসি টানিয়া বলিল—রূপো আমি চিনি মামী।

—যদি চুরি যায়? শিগগির করে ফেরত দিয়ে এসো।

—আমার বাবার বাটি, একটা যদি আমি চুরিই করি!

চন্দনমণি মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার বাবার যবে ছিল তবে ছিল, এসব এখন কুবিরের।

—কুবের এখন আমার বাবারই ছেলে, আমার ভাই। তুমি আর কুবেরের কেউ নও মামীমা।

চন্দনমণি একেবারে সঙ্কুচিত এতটুকু হইয়া দুধের বাটি রাখালের সামনে নামাইয়া রাখিয়া মণিমালাকে বলিল—বাটিটা বাসনের ঘরে রেখে এসো। রূপোর বাসন-সব কোন্ ঘরে থাকে জানো ত?

মণিমালা মৃদু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—মামীমা, এ আমারই বাবার বাড়ী! তুমি এখানে কদিন এসেছ?

চন্দনমণি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

(৪৬)

এতদিন মণিমালার মত হইয়াছে ত রাখালের মত হয় নাই, রাখালের মত হইয়াছে ত মণিমালার মত হয় নাই, আজ উভয়েরই এক মত হইয়াছে—এ বাড়ীতে আর থাকা নয়। বিদায় লইবে বলিয়া রাখাল ও মণিমালা রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকটে গেল।

রাখাল ও মণিমালা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই জগদ্ধাত্রী বলিলেন—আমি এই ভাবছিলাম তোমাদের ডেকে পাঠাব। আমরা কাল তিথি করতে যাচ্ছি। ম্যানেজার-সাহেব কুবেরকে যেতে দিলে না। সে রইল; তাকে তোমরা দেখো। বঙ্ক আর বৌ আমার সঙ্গেই যাবে।

চন্দনমণি অমনি সোহাগ জানাইয়া বলিল—কুবেরের ত দিদি আর বাবুদাদা-অন্ত প্রাণ। দিদি আর বাবুদাদা তার কাছে থাকলেই হল। আমরা ত যেন তার কেউই নই। তবে আমরা থেকে আর করব কি, তোমাদের কল্যেণে দিদির সঙ্গে একটু তিথিধম্ম করে আসিগে।

রাখাল চন্দনমণির কথা লক্ষ্য না করিয়াই রাণী জগদ্ধাত্রীকে বলিল—মা, আমরা এখান থেকে যাব বলে বিদায় নিতে এসেছিলাম।

রাণী জগদ্ধাত্রী রাখাল ও মণিমালার মুখের দিকে ছলছল চোখে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—তা ত তোমরা যাবেই বাবা, পরের বাড়ী আর কদ্দিন থাকবে, না বেশী দিন থাকা ভালো দেখায়। তা এত তাড়াতাড়ি কেন, আমরা তিথি সেরে ফিরে আসি, তার পর যেয়ো।

রাণী জগদ্ধাত্রীর চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আর হইল না। রাণী জগদ্ধাত্রী তীর্থযাত্রা করিলেন।

রাণী জগদ্ধাত্রী ও চন্দনমণির অবর্ত্তমানে রাখাল ও মণিমালার উপর রাণীর স্ত্রীধন সম্পত্তি রতনপুর পরগণা হইতে সংসার পর্য্যন্ত দেখিবার ভার পড়িয়াছে। মণিমালা হাসিমুখের মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিয়া ভোর হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাড়ীর চাকর দাসী, ঠাকুরবাড়ী অতিথশালা প্রভৃতির তত্ত্ব লইয়া ফিরিতেছে; যে-সব চাকর বাড়ীতে খায় না, সিধা পায়, তাহারা বরাদ্দের উপর দুটা আলু কি একটা মূলা বেশী পাইয়া খুসী হইয়া যাইতেছে। সকলেই হায় হায় করিতেছে—এমন সোনার মনিব থাকিতে কোথাকার একটা ছোটলোক দৃষ্টিকৃপণ মাগী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া এমন রাজবাড়ীকে মুদিখানার

চেয়েও হেয় করিয়া তুলিয়াছে—যেখানে লোকে এতকাল আমাপা জিনিস খাইয়াছে লইয়াছে, সেখানে আজকাল শুধু দাঁড়িপাল্লার টানাটানি আর মুখখিঁচুনি রাজত্ব করিতেছে!

রাখাল রতনপুর পরগণা তদারক করিতে গিয়াছে। সেখানে বঙ্কবিহারী গিয়া কেবল গালি ও চাবুকে প্রজার সহিত পরিচয় করিত, রাখাল সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের সমান হইয়া তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনী জানিতেছে; সে দেশের অভাব অসুবিধা নিজে দেখিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছে। প্রজারা বলাবলি করিতে লাগিল—এবার সেই বঙ্কাটা আসিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া রূপলহরী নদীর জলে ভাসাইয়া দিবে। রাণী মরিলে স্ত্রীধন সম্পত্তি মেয়েই ত পাইবে, তখন এই জামাই-বাবুই কর্ত্তা হইবে; তাহারা রামরাজত্বে বাস করিবে। কিন্তু তাহারা জানে না যে তাহাদের এই সুখের আশা মরীচিকা, আলেয়ার আলো—রাখাল প্রস্তুত হইয়া আছে রাণী জগদ্ধাত্রী তীর্থ করিয়া ফিরিলেই এখানকার সম্পর্ক চুকাইয়া সে বিদায় লইবে।

বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রায় বৎসর খানেক পরে রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আবার স্থগিত রাখিতে হইল।

কবিরাজ কান্তলাল মিশ্র চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন;

মুঙ্গের কি ভাগলপুর হইতে অপর বৈদ্য আনিবার জল্পনা হইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—রাখাল, আমার রতন-পুর পরগণা ভূপালকে দেবো; একটা লেখাপড়া করে আন, সই করিয়ে নাও।

রাখাল বলিল—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি ভালো হবেন। ভালো হয়ে যাকে যা দিতে ইচ্ছে হয় দেবেন।

বঙ্কবিহারী বলিল—বাঃ! এও কি একটা কথা হল! মানুষের শরীরগতিকের কথা ত বলা যায় না; যদি নাই ভালো হলেন? লেখাপড়া যখন করে দিতে চাচ্ছেন সই করিয়ে রেখে দেওয়া ভালো। ভালো হয়ে উঠে ইচ্ছে না হয় সে দানপত্র বাতিল করতে ত পারবেন। আমি ছোট দেওয়ানজীকে দিয়ে লিখিয়ে আনছি.. ...

বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বঙ্কবিহারীর পরোপকারের প্রবৃত্তি হঠাৎ এরূপ প্রবল হইতে দেখিয়া রাখাল ও মণিমালা আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

তোষাখানায় বঙ্কবিহারীর ঘরে দেওয়ান দীনদয়াল ও কাঙালীর ডাক পড়িল। তিন জনের পাকা মাথার সূক্ষ্ম-পরামর্শে একখানি দানপত্র অতি সত্বর মুসাবিদা ও পরিষ্কার করিয়া লেখা হইয়া গেল।

বঙ্কবিহারী সেখানিকে হাতে করিয়া দোয়াত কলম

লইয়া আসিয়া অজ্ঞানপ্রায় রাণী জগদ্ধাত্রীর শিয়রে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—দিদি, দিদি! ও দিদি, শুনছেন?

চটকা ভাঙিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী জোর করিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন—অ্যাঁ?

—রতনপুরের দানপত্তর লিখে এনেছি, সই করে দেবে?

—দাও।—বলিয়া জগদ্ধাত্রী তাঁহার কম্পিত হস্ত শূন্যে বাড়াইলেন। দুই হাত কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় পড়িয়া গেল।

বঙ্কবিহারী জগদ্ধাত্রীর গলার নীচে হাত দিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বসাইতে গেল।

রাখাল ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—ওঁকে মেরে ফেলবেন নাকি? বিষয়টাই পাওয়া বড় হল? ভূপাল তার দিদিমাকে মেরে বিষয় পেতে চায় না।

বঙ্কবিহারী রাখালের কথা কানে না তুলিয়া আস্তে আস্তে জগদ্ধাত্রীকে উঁচু করিয়া তুলিল। এবং বঙ্কবিহারীর চোখের ইসারায় চন্দনমণি একটা বড় তাকিয়া তাঁহার পিঠের নীচে দিয়া তাহার উপর আর-একটা বালিসে তাঁহার মাথাটি আস্তে আস্তে রাখিয়া দিল। একখানা খাতার উপর দানপত্র মেলিয়া ধরিয়া বঙ্কবিহারী কলমে কালি তুলিয়া কলম জগদ্ধাত্রীর হাতে ধরাইয়া দিল এবং সুস্থ বেলায় যাঁহাকে নামের বানান বলিয়া দিতে হইত এই অর্দ্ধ-চেতন

অবস্থায় তিনি অভ্যাস-বশত আলপনার রেখা টানার মতন রেখা মাত্র টানিয়া নিজের দস্তখতটি খতের উপর ফুটাইয়া তুলিলেন। তারপর তিনি অচৈতন্য হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি তখন দানপত্র লইয়া ব্যস্ত; রাণী জগদ্ধাত্রীর দিকে তাহাদের লক্ষ্য করিবার তখন অবসর নাই। রাখাল ও মণিমালা ধরাধরি করিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে ভালো করিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিল এবং কান্তলাল কবি-রাজ তখন ক্ষিপ্র হস্তে মকরধ্বজ মাড়িতেছিল। অনেক পাখার বাতাস ও তাহুতের পর যখন জগদ্ধাত্রীদেবীর জ্ঞান হইল বঙ্কবিহারী তখন রাখাল ও কান্তলাল মিশ্র কবিরাজকে সেই দানপত্রে সাক্ষীর স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করিল—বাবাজী, তুমি আর কবিরাজজী এই দানপত্রের সাক্ষী হও—সই কর।

রাখাল দানপত্রে সই করিতে গিয়া দেখিল যে তাহাতে ভূপালের নামের পরিবর্ত্তে কুবেরের নাম কাঙালীর হাতের স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। এবং সাক্ষী বলিয়া আগে হইতেই কাঙালী ও দীনদয়াল সই চুকাইয়া রাখিয়াছে। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়াইয়া যাহারা প্রবঞ্চনা করিতে পারে তাহাদিগকে রাখাল কুকুর মনে করে। রাণী জগদ্ধাত্রীকে বিক্ষুব্ধ করা হইবে বলিয়া সে আত্মসংবরণ করিল, নতুবা এক এক

পদাঘাতে তাহাদিগকে তাহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল। রাখাল সেই দলিল টান মারিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল, সই করিল না। বঙ্কবিহারী একলাফে তাহার উপর গিয়া পড়িয়া কুড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—হঁা হঁা ক্রোধ হতে পারে তোমার বাবাজী, ক্রোধ হতে পারে। ন্যায্য! ন্যায্য!

রাখাল আর তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

দলিল সই করিবার বিক্ষেপের ফলে, জগদ্ধাত্রীর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, দুর্ব্বলতার অবসাদে চেতনা লুপ্তপ্রায় হইল। যায়-যায় অবস্থা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ, দুধ ও বেদানার রস খাওয়াইয়া কোনো রকমে প্রাণটাকে দেহে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছে।

(৪৭)

আজ একাদশী। আজ ঔষধ পথ্য দেওয়া যাইবে না, আজ জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়। বঙ্কবিহারী ব্যস্ত হইয়া ব্যবস্থা করিতে লাগিল কেমন করিয়া তাঁহাকে তে-শূন্য হইতে মাটিতে উঠানে নামানো হইবে; কে কে সঙ্গে শ্মশানে যাইবে; বাড়ীর ভাণ্ডারে কত মণ চন্দন-কাঠ আছে, তাহাতেই দাহ শেষ হইবে, না, আরো কাঠ লাগিবে; যদি লাগে ত বাজার হইতে আর কতখানি চন্দন-

কাঠ সংগ্রহ হইতে পারিবে; গাওয়া ঘি কয় হাঁড়া আছে; এই-সমস্ত জিনিস লইয়া-যাইতে কতজন ভারী লাগিবে; পথে শব লইয়া যাইবার সময় খৈ বাতাসা ও পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতে হইবে; ভাণ্ডারে কয় ছালা খৈ মজুত আছে, প্রহ্লাদের মা না হয় আরও কিছু খৈ চট করিয়া ভাজিয়া ফেলুক; খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করা হোক কত টাকার পয়সা পাওয়া যাইবে; হারা-ময়রাকে বাতাসা করিতে বলিয়া আসুক; ঘিসু খানসামা মাল-খানা হইতে নূতন ধোয়া থান কাপড় বাহির করিয়া কতকগুলা কাপড় ও উত্তরীয় ফাড়িয়া ফেলুক; শব ঢাকা দিবার জন্য একখানা জামিয়ার বাহির করিয়া দিক। বঙ্কবিহারী সমস্ত একে একে মনে করিয়া-করিয়া আদেশ করিতেছিল এবং সেই-সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কি না চন্দ্রমণি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছিল।

মণিমালা মায়ের পা দুখানি কোলে করিয়া বসিয়া অত্যন্ত কাঁদিতেছিল; রাণী জগদ্ধাত্রীর কোলের কাছে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ভূপাল ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছিল; ঘরে বাহিরে সমস্ত চাকর দাসী আশ্রিত আত্মীয় পরিজন জড়ো হইয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছিল; কবিরাজ বিছানার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া নাড়ী ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল কখন্ কোন্ মুহূর্তে সেই অতি ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও স্থগিত হইয়া যায়। রাখাল

শিয়রের কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। দাঁড়াইয়া থাকিতে-থাকিতে রাখাল হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কবিরাজজী, কোনো উপায় আর নেই কি?

কবিরাজ বলিল—দাবাই ও পথ্য পড়িলে আরো দুচার দিন লড়িতে পারা যাইত। তার মধ্যে ভগবান চাহে ত এই কঠিন অবস্থা কাটিয়া রোগ আরামের পথে যাইতে পারে।

রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জোর দিয়া বলিল—আপনি ওষুধ দিন। মণি, চট করে গিয়ে একটু গরম দুধ নিয়ে এস, একটা বেদানার রস কর।

রাখাল ঔষধের পুরিয়া লইয়া খলে ঔষধ মাড়িতে বসিল। সেই শব্দে বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি ছুটিয়া ঘরে আসিয়া বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! রাখাল! তুমি করছ কি?

রাখাল মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—ওষুধ মাড়ছি।

—আজ যে একাদশী!

রাখাল ঔষধে মধু ও আদার রস মিশাইতে মিশাইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—জানি।

—আজকে ওষুধ খাবেন কি করে?

—আমি আস্তে আস্তে চাটিয়ে দেবো, তাহলেই খেতে পারবেন।

—পাপ হবে যে?

—হয় আমার হবে। যমরাজার সঙ্গে বোঝাপড়া আমিই করব।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—ধর্ম্ম আর রইল না!

রাখাল ঔষধের খল হাতে করিয়া উঠিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নাঃ!

এমন সময় মণিমালা দুধ আনিল।

চন্দনমণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওমা মণি! তুইও এইসব অকল্যাণের কাজ করছিস! জানিস একাদশীর দিন বিধবার খাবার জোগাড় করলে কিম্বা খাওয়া দেখলে নিজে বিধবা হয়! পতিহত্যার পাতক হয়!

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীকে ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে বিরক্ত হইয়া চাপা গলায় বলিল—তবে মামী, তুমি এখান থেকে যাও ত, একাদশীতে বিধবার খাওয়া দেখে তুমিও আর আমার গুণের মামাটিকে হত্যা কোরো না!

চন্দনমণির কিন্তু বঙ্কবিহারীর প্রতি কিছুমাত্র দয়া দেখা গেল না, সে ঠায় দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া একাদশীতে বিধবার খাওয়া দেখিল। বঙ্কবিহারী চন্দনমণির স্বামীভক্তি ও এয়োত রক্ষার আগ্রহ যে কতখানি তাহা জানিয়া প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন হইল তাহা তাহার বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি দেখিয়া কিছুই বোঝা গেল না।

সমস্ত দিন প্রাণলোলুপ আগন্তুক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পর সন্ধ্যার সময় কবিরাজের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—যাক এযাত্রা রাণীজী রক্ষা পাইয়া গেলেন।

বাড়ীর সকলে যে পরিমাণ প্রফুল্ল হইল, বঙ্কবিহারী চন্দনমণি দীনদয়াল ও কাঙালী সেই পরিমাণে বিষণ্ণ হইয়া গেল।

(৪৮)

রাণী জগদ্ধাত্রী রোগমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বড় দুর্ব্বল। কবিরাজ বলকারক রসায়ন ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন—ঔষধ পথ্য যত্ন শুশ্রূষার একটু ত্রুটি হইলে পীড়া যদি পুনরায় ফিরিয়া হয় তবে আর বাঁচানো যাইবে না।

রাখাল ও মণিমালা যাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া রাত্রিদিন প্রাণপণে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছে। এবং যাহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে এজন্য শ্রীধর কথককে আনাইয়া প্রত্যহ কথা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি সর্ব্বদাই কুন্ঠিত হইয়া দূরে দূরে থাকে; বাড়ীতে আর তাহারা জোর করিয়া আধিপত্য করিতে পারে না; সকল তাতেই তাহাদের কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ। কাজেই আস্তে-আস্তে বাড়ীর সমস্ত ভার রাখাল ও মণিমালার হাতে আসিয়া গেল; তাহারা কর্ম্ম ও সেবার আনন্দে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, বাড়ীর সকলে তাহাদের যত্নে প্রফুল্ল ও পরিতুষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন রাণী জগদ্ধাত্রী বসিয়া কথা শুনিতেছেন, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে, কথকের করুণ-রস বর্ণনায় সকলের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র রাজার সর্ব্বস্ব লইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেছেন—শুনিতে-শুনিতে রাণী জগদ্ধাত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আমারও এইরকম দশা হবে; কুবেরের যে-রকম রকম-সকম দেখছি তাতে সে আমায় লক্ষ্যস্থল দেবে বলে ত বোধ হয় না; নিজের একটা স্ত্রীধন ছিল, সেটাও ভূপালকে দিয়ে ফেলেছি; ভূপালও যদি আমায় তাড়িয়ে দ্যায় তবে হরিশ্চন্দ্রের মতন দশাই আমারও হবে।

মণিমালা পাশে বসিয়া ছিল। বলিল—কুবেরকে তুমি সর্ব্বস্ব দিয়েছ, সে কি মা তোমাকে অশ্রদ্ধা করতে পারে? আর ভূপালকে তুমি কিছু না দিলেও সে আপনার প্রাণ ফেলতে পারবে তবু তোমাকে ফেলতে পারবে না, তুমি যে তার মায়ের মা!

রাণী জগদ্ধাত্রী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—অত বড় রতনপুর পরগণাটা ভূপালকে দিলাম তবু সেটা কিছু দেওয়া হলনা! বাবা! তোমাদের খাঁই আর কিছুতে মেটে না! আমার পেটে যদি একটা ছেলে হত তবে ঐ বা কোথায় পেতিস?

মণিমালা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। চন্দনমণি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন বরজহাটির দিদি বলিলেন—রতনপুর পরগণা ভূপালকে দিয়েছ ছাই! বঙ্ক সেটা কুবেরের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও ব্যথিত হইয়া মণিমালার লজ্জিত বিষণ্ণ নত মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্যি মণি?

মণিমালা চুপ করিয়া বসিয়া কার্পেটের নক্সার উপর আঙুল বুলাইতে লাগিল।

জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওদের সর্ব্বস্ব নিয়েও পেট ভরছে না! শেষকালে আমায় ঠকিয়ে ভূপালের মুখের গ্রাস চুরি করে নিলে!

জগদ্ধাত্রী আর কথা শুনিতে পারিলেন না; দৌড়-ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—ঝুনকিয়া, রাখালকে ডেকে আন।

রাখাল কথা শুনিতেছিল। মা ডাকিতেছেন শুনিয়া উঠিয়া অন্দরে আসিল।

রাখালকে দেখিয়াই জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—রাখাল, এতদিন তোমরা আমাকে বলনি কেন?

—কি মা?

—বঙ্ক আমাকে ঠকিয়ে ভূপালের বিষয় চুরি করে নিয়েছে।

—এ কি বলবার কথা মা?

—তুমি এক্ষুনি লিখে নিয়ে এস; আমি সজ্ঞানে সই করে ভূপালকে রতনপুর পরগণা দান করব।

—তা হয় না মা, ও সম্পত্তি কুবেরকেই দেওয়া হয়ে গেছে। দিয়ে ফিরিয়ে নিলে কুবেরের মনে কষ্ট হবে। ভূপাল কি একটা তুচ্ছ সম্পত্তির জন্যে মামার সঙ্গে বিবাদ করতে যাবে? কুবের সকলকার বড় হয়েছে, সেই তার আত্মীয় স্বজন আশ্রিত প্রতিপাল্য-দের দেখবে।

জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওরা আমার সব নিলে!

এই ঘটনায় বঙ্কবিহারী, চন্দনমণি ও কুবের জগ-দ্ধাত্রীর চক্ষুশূল হইয়া পড়িল। তাহারাও কুণ্ঠায়, লজ্জায় চাকর-দাসীর কাছেও আর মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, মনে করিত যেন সকলের মনের মধ্যে নিরন্তর নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে—চোর! চোর!

উহারা যতই দূর হইয়া যাইতে লাগিল, রাখাল মণিমালা ও ভূপাল ততই জগদ্ধাত্রীর নিতান্ত আপনার ও নির্ভরের পাত্র হইয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী একদিন বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সোনার কাঁচি দিয়া আপনার রেশমের ন্যায় কোমল সূক্ষ্ম দীর্ঘ কেশরাশি কাটিয়া

ফেলিলেন; তারপর সেগুলিকে কালো রেশম দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া কতকগুলি চুলবাঁধা গুছি করিয়া বড় রূপার থালে সাজাইলেন; পেড়ে কাপড় ছাড়িয়া আবার সাদা ধুতি পরিলেন; হার ও অনন্ত খুলিয়া বাক্সে রাখিলেন; সোনা-বাঁধানো হুঁকাটাকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া সোনার বেড়টা বাক্সে রাখিলেন। ঝুনকিয়াকে বলিলেন—মণিকে ডাক।

মণিমালা আসিয়া মায়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—মণি, আমার মাথার এই চুলের গুছি, আমার গায়ের গহনা ভূপালের বৌ হলে তাকে দিস। নিয়ে যা। এইমাত্র আমার সম্বল বাকী আছে, আর কিছু নেই। শনির দৃষ্টি পড়বার আগে তুই নিয়ে রাখ। পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে—তাও আমি ভূপালকে দেবো মরবার সময়।

মণিমালার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—তোমার নাতবৌকে তুমিই হাতে করে সাজিয়ে দিয়ো মা।

জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া বলিলেন—সে সুখ আমার কপালে নেই। রাখাল ত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দিতে দেবে না। আমি আর কতদিন বাঁচব? তুইই আমার নাম করে ভূপালের বৌকে দিস।

মণিমালা চোখে আঁচল ঢাকা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী বলিলেন—ঝুনকিয়া, এই থালাটা, আর গহনার বাক্সটা মণির ঘরে রেখে দিয়ে আয়।

চন্দনমণি যখন শুনিল যে বড় হাতীর দাঁতের বাক্সর একবাক্স গহনা বেহাত হইয়া গিয়াছে, তখন সে আপনার কপালে নির্ঘাত এক চড় মারিয়া বলিল—পোড়াকপাল আমার! গহনাগুলোর কথা ছাই একটুও মনে ছিলনা!... আচ্ছা!...

চন্দনমণি ছুটিয়া গিয়া বঙ্কবিহারীকে বলিল—কুবিরের বিয়ের একটা শিগগির জোগাড় কর।

—হঠাৎ?

—দরকার হয়েছে।

শামুক আঁটিয়া গেলে যেমন ভাব হয় তেমনই একটা দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ ভাব সহধর্ম্মিণীর মুখে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কবিহারী বলিল—আচ্ছা, কাঙালীকে বলি, তার জানা শোনা যদি কোনো ভালো মেয়ে থাকে।

কাঙালী বঙ্কবিহারীর নিকট শুনিয়া খানিকক্ষণ মুখ উঁচু করিয়া ভাবিয়া বলিল—কৈ ভালো মেয়ে ত মনে পড়ছে না। রাজরাণী হবার যোগ্য মেয়ে ঘটক লাগিয়ে খুঁজতে হবে।

বঙ্কবিহারী বলিল—ঠিক বলেছ, ঘটকদের নিযুক্ত করাই শ্রেয়।

কাঙালী সেইদিন বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া শীঘ্র তাহার পরিবার পাহাড়পুরে আনাইবার ব্যবস্থা করিল।

যেদিন তাহার পরিবার আসিয়া পৌছিল সেইদিন কাঙালী কুবেরকে বলিল—রাজাবাবু, তুমি আমার বাড়ীতে যাও না কেন? আমার বাড়ীতে কেমন পায়রা আছে, হীরামন পাখী আছে, খরগোশ আছে.........

কুবের উৎসুক হইয়া বলিল—সত্যি মাষ্টার মশায়? আমি দেখতে যাব।

কুবের কাঙালীর বাড়ীতে যাইতেই কাঙালী ও তাহার স্ত্রী আন্না বহু সমাদর করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তারপর কাঙালী ডাকিল—কাতু, এইদিকে এস, রাজাবাবুকে নিয়ে গিয়ে তোমার চিড়িয়াখানা দেখাওগে।

কাঙালীর কন্যা কাত্যায়নী লজ্জারক্ত নতমুখে আসিয়া কুবেরের সামনে দাঁড়াইল। গৌরী সুন্দরী সে, বয়স তাহার চৌদ্দ বৎসর। সে একখানি ধোয়া জরি-পেড়ে নীলাম্বরী শাড়ী, হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি, কানে দুটি দুল ও আলতা-দেওয়া পায়ে ঘুঙুর-দেওয়া মল পরিয়া আসিয়াছিল; এই সামান্য আভরণেই তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল।

কাঙালী বলিল—কাতু, রাজাবাবুকে ডেকে নিয়ে যাও।

কাত্যায়নী লজ্জিত হাসিমুখ একটু তুলিয়া সঙ্কোচে চঞ্চল দৃষ্টিতে কুবেরের দিকে একটু চাহিয়া ধীর মৃদু কণ্ঠে বলিল—আসুন।

কুবের সেই সুন্দরী কিশোরীর আহ্বানে পুলক-মোহের মাদকতায় তন্ময় হইয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মলের ঘুঙুরের মৃদুগুঞ্জনে আকৃষ্ট হইয়া বংশীরবে মুগ্ধ সর্পের মতো কুবের কাত্যায়নীর সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া গেল।

আবার যখন মলের শব্দ ফিরিয়া আসিতে শোনা গেল তখন আন্না একটু উঁচু গলাতেই কাঙালীকে বলিতেছিল—কাতুর কি তেমন অদেষ্ট হবে যে রাজার গলায় মালা দেবে। রাজরাণী পাটরাণী হওয়া সে কি যেমন-তেমন ভাগ্যের কথা। সে আমাদের বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ!

উঁচু করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, কথা কয়টা কুবেরের কানে পৌঁছিল। সেইদিন হইতে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর পশুপক্ষী কয়টির উপর কুবেরের এমন মমতা পড়িয়া গেল যে দিনান্তে তাহাদের একবার না দেখিলে সে স্থির থাকিতে পারিত না, এবং তাহাদিগকে এমন নিবিষ্ট ভাবে এত বেশীক্ষণ ধরিয়া সে পর্য্যবেক্ষণ করিত যে কুবের প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো নূতন আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে বলিয়া ধারণা হইতে পারিত।

বঙ্কবিহারী যখন ঘটক লাগাইয়া মেয়ে খুঁজিতে ব্যস্ত ছিল, কাঙালী যখন মেয়েকে কুবেরের সহিত পরিচয় করাইতে ব্যস্ত ছিল, কুবের যখন কাত্যায়নীর চিড়িয়াখানায় ভর্ত্তি হইয়া প্রাণীতত্ত্বের গবেষণায় ব্যস্ত ছিল, তখন চন্দনমণিও

নিশ্চিন্ত ছিল না। সে আস্তে আস্তে গিয়া জগদ্ধাত্রীর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। জগদ্ধাত্রী মুখ ঘুরাইয়া ভার হইয়া বসিলেন। চন্দনমণি বলিল—দিদি, এই বেশই তোমার এখন ঠিক মানিয়েছে—আজ বাদে কাল তোমার বেটার বৌ ঘরে আসবে।······আচ্ছা দিদি, কুঁবরের বিয়ে দেবে না? আমরা ত বুড়ো হতে চল্লাম, কবে আছি কবে নেই, জীবনের সাধ আহ্লাদটা করে নেওয়া যাক এইবেলা। তোমারও ত একটি আদর যত্ন করবার লোক চাই—বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে নিয়ে এস।

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোনো কথাই বলিলেন না। চন্দনমণি কিন্তু দমিবার পাত্র নহে, সে এতদিন যে-সঙ্কোচে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া সে এখন নিরন্তর জগদ্ধাত্রীর কাছে-কাছে হামেহাল হইয়া তাঁহার সেবা করিয়া তুষ্টিসম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবে সঙ্কল্প করিল।

কুবের জগদ্ধাত্রীর ঘরের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। চন্দনমণি ডাকিল—কুবির, শুনে যাও, দিদি ডাকছেন।

কুবের বিরক্ত মুখে আসিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী কোনো কথাই বলিলেন না। চন্দনমণি বলিল—তোমার মা যে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন, তোমার বিয়ে হবে।

কুবেরের বিরক্ত মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে স্মিত মুখে চাহিল; কিন্তু তাঁহার মুখে হর্ষের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া কুবের সেখান হইতে প্রস্থান করিল। চন্দনমণিও আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

উহারা চলিয়া গেলে জগদ্ধাত্রী রাখালকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—রাখাল, কুবেরের বিয়ে দিতে হবে, তুমি মেয়ের খোঁজ কর।

—বঙ্কমামা ত খোঁজ করছেন।

—খোঁজ করছে বুঝি? আমাকে না জানিয়েই? না, ওদের খোঁজ করতে হবে না, তুমি খোঁজ কর।

—এত ছেলেমানুষের বিয়ে দেবেন না মা। কুবের এখন লেখাপড়া করুক, সাবালগ হোক, তখন বিয়ে দেবেন।

জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া গেলেন আর কোনো কথা বলিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেলে বঙ্কবিহারীকে ডাকাইয়া জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—বঙ্ক, কোথাও ভালো মেয়ের সন্ধান পেলি?

—হাঁ, মহিষবাথানের বেচন চক্করবর্ত্তীর মেয়ে নাক-ফুঁড়িকে ত আপনি দেখেছেন; তোফা সুন্দরী মেয়ে; তার সঙ্গে কুবেরের বিয়ে দিলে হয় না?

—তা মন্দ কি? বেচনকে বলে দাও একদিন

মেয়েকে নিয়ে আসুক, আমরাও একবার ভালো করে দেখি শুনি, কুবেরও একবার দেখুক!

বেচন চক্রবর্ত্তী খবর পাইয়াই মেয়েকে নূতন চুনরী কাপড় কোঁচা করিয়া ঘাগরার ধরণে পরাইল; পাটের জাদ দিয়া চুল বাঁধিয়া গোঁজ খোঁপার নীচে জাদের থোপনা দুলাইল; কপালময় পেটে-পাড়া চুলের নীচে তেল-সিঁদুর লেপিল; কাঁকন, খাড়ু, হাঁসুলী ও গুজরী প্রভৃতি গহনার ভার সর্ব্বাঙ্গে চাপাইল; কানে সার মাকড়ি ও নাকে বেসর ও বুলাকি ঝুলাইল; পায়ে আলতা, হাতে মেহেদি ও চুলে মাথাঘসার মসলা লেপিয়া রাজার মনোহরণ বেশে কন্যা সাজাইল। তারপর একখানি ডুলিতে তাহাকে মুড়িয়া-সুড়িয়া বসাইয়া দিয়া নিজে একটা বেটো ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। রাজদরবারে যাইতেছে বলিয়া নিজেও একটু সাজিয়া লইয়াছিল——কষিয়া মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া তাহার উপর একটা মলমলের চাপকান পরিয়াছিল এবং একখানা তসরের চাদর উত্তরীয় করিয়া বুকে ও একখানা পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধিয়াছিল,—রাজদর্শনের সময় অঙ্গে পট্টবস্ত্র থাকা আবশ্যক; বহুদিনের তেল ও শিশির খাওয়ানো দিল্লীওয়ালা জুতা পায়ে ও একখানি ময়লা গামছা 'উরমাল' হাতে লইয়াছিল!

নাকফুঁড়িকে দেখিয়া জগদ্ধাত্রী বলিলেন—বাঃ! বেশ [illegible]। একেই আমার বৌ-মা করব।

তাঁহার সেই বেশভূষা, আড়ষ্টভাব ও তামাটে পাকা চেহারা দেখিয়া মণিমালা ত হাসিয়া খুন। সে অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া জগদ্ধাত্রীকে বলিল—এ মেয়ের সঙ্গে কুবেরের বিয়ে দিয়ো না মা।

রাণী জগদ্ধাত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কেন? তোমাদের কিছুই পছন্দ হয় না! এ মেয়ে মন্দ কিসে হল?

—কুবেরের পছন্দ হবে না মা।

—এমন মেয়ে আবার পছন্দ হবে না! যা ত ভূপাল তোর মামাকে ডেকে আনত, তোর মামীকে এসে দেখুক।

ভূপাল হাসিতে-হাসিতে দৌড়িয়া গিয়া কুবেরকে বলিল—মামা মামা, শিগগির এস, একটা কেমন জানোয়ার এসেছে দেখসে।

কুবের আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি জানোয়ার?

ভূপাল হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল—হুতুমথুমো!

কুবের উৎসুক হইয়া ভূপালের সহিত হুতুমথুমো দেখিতে ছুটিল। আসিয়াই নাকফুঁড়িকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

—দেখলে মামা হুতুমথুমো!—বলিয়া ভূপাল হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িল।

রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—কুবের, দেখ্ কেমন কনে? বিয়ে করবি ত?

চন্দনমণি বলিল—দিব্যি মেয়ে, এ আর কুবিরের পছন্দ হবে না! ওর বেশ পছন্দ হয়েছে।

কুবের বলিয়া উঠিল—ছাই পছন্দ হয়েছে। আমি মাষ্টার মশায়ের মেয়ে কাত্যায়নীকে বিয়ে করব।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—মাষ্টার মশায়? কাঙালী? তার মেয়েকে আবার কোথায় দেখলি?

কুবের চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে, আবার কোথায়?

ভূপাল কুবেরের সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে-যাইতে জিজ্ঞাসা করিল—মামা, দিদিমার সামনে কাত্যায়নীকে বিয়ে করবে বলতে লজ্জা করল না?

কুবের বুক ফুলাইয়া বলিল—আমি রাজা! আমার আবার কাকে লজ্জা, কাকে ভয়! আমার যা খুসী আমি ত তাই করব। নইলে কি ঐ হুতুমথুমোকে বিয়ে কবব নাকি!

ভূপাল হুতুমথুমোকে স্মরণ করিয়া আবার হাসিতে গড়াইয়া পড়িল। বলিল—মামা, ওর নাম শুনেছ? দিব্যি নাম—নাকফুঁড়ি!

কুবের নাক সিঁটকাইয়া বলিল—যেমন চেহারা, তেমনি সজ্জা, তেমনি নাম!

বেচারী নাকফুঁড়ি আবার ডুলিতে চড়িল। বেচন চক্রবর্ত্তী আবার ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষবাথানে ফিরিয়া গেল।

ডাক কাঙালীকে, দেখ তাহার মেয়েকে,—রাজবাড়ীময় সাড়া পড়িয়া গেল।

বঙ্কবিহারী কাঙালীকে ডাকিয়া স্নেহপূর্ণ ভৎর্সনা করিয়া বলিল—বাবাজী, তোমার নিজের সুন্দর মেয়ে আছে! তোমাকে সুন্দর মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম সেদিন, তুমি ত তখন বললে না কিছু?

কাঙালী কাষ্ঠ-বিনয় অভিনয় করিয়া বলিল—রাজা-মামা, আমি কি কখনো মনেও করতে পারি যে আমার মেয়ে রাজরাণী হবে; সে কি রাজাবাবুর যোগ্য! সে সাধ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মতন হবে! লোকে হাসবে যে।

—না, না। তুমি অতি বিনয়ী সাধু সজ্জন আছ! তুমি আমাকে ভক্তি কর! তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে না ত হবে কে? তোমার মেয়েকে অন্দরে নিয়ে এস; রাণী-দিদি, তোমার রাণী-মামী, মণি-টনি সকলে দেখবে একবার।

রাজবাড়ীর কিংখাবের ঘেরাটোপ-দেওয়া রূপো-বাঁধানো পাল্কীতে লম্বা-লাঠিঘাড়ে চোগোঁপ্পাওয়ালা দারোয়ানের পাহারায় বেষ্টিত হইয়া কাত্যায়নী শুধু একখানি কালাপেড়ে

শাড়ী পরিয়া স্বল্প আভরণকে নিজের রূপে সুন্দর করিয়া রাজবাড়ীতে দেখা দিতে আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল —হাঁ, রাণী হইবার মতন রূপ বটে!

ভূপাল ছুটিয়া গিয়া কুবেরকে বলিল—মামা, মামা, কেমন মামী এসেছে দেখসে।

কুবের হাসিয়া বলিল—যাঃ! আর জ্যাঠামি করতে হবে না।

রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন—মণি, ত্যাখ, এ মেয়ে রাণী হবার যুগ্যি কি না!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—মা, শুধু রূপ হলেই রাণীর যুগ্যি হয় না,—বাহির-ভিতর দুইই যার ভালো, তারই রাণী হওয়া উচিত—তার ওপর যে অসংখ্য লোকের সুখদুঃখ নির্ভর করবে!......কাতু ত আমার অচেনা মেয়ে নয়? ওদের গাঁয়ে গিয়ে ত আমি বছর খানেক ঘর করে এসেছি।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—যাকে দেখতে নারি তার হাঁটন বাঁকা! তোমরা ক্যাঙালীকে দুচক্ষে দেখতে পারনা, তাইতে তার এমন সোনার মেয়েও তোমাদের মনে ধরে না!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো না মামী, দিলে কারুর ভালো হবে না।

—ষাট ষাট! শুভকর্ম্মে অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না বাছা!

—একবার বললাম আর বলব না। ঐটুকু মেয়ের কোঁদলের জ্বালায় পাড়ার লোক অস্থির থাকত, গায়ে পড়ে ঝগড়া করত ও।

—ছেলেবেলা অমন অবুঝ সবাই হয়েই থাকে। এখন ত দিব্যি শান্ত শিষ্ট হয়েছে; মুখে রা-টি নেই। ক্যাঙালীর মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে?

এ কথার আর উত্তর নাই। মণিমালা একটু হাসিয়া, উঠিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি জনান্তিকে বলিয়া উঠিল—উঃ! কী বিষম হিংসে!

রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ ভার করিয়া বলিলেন—বৌ, বঙ্ককে বল গণপতি ভটচাযকে দিয়ে একটা বিয়ের দিন দেখিয়ে ঠিক করুক। এই মেয়ের সঙ্গেই কুবেরের বিয়ে দিতে হবে।

(৫০)

রাজবাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার লাগিয়া গেল—রাজাবাবুর বিয়ে! বিবাহের ব্যয়-মঞ্জুরীর জন্য বঙ্কবিহারীর অনুরোধে কাঙালী বোর্ডে দরখাস্ত লিখিয়া দিল। রাণী জগদ্ধাত্রীর দস্তখতে সেই দরখাস্ত চল্লিশহাজার টাকা ষ্টেট হইতে পাইবার হুকুম মঞ্জুর করিয়া আনিল।

কিন্তু বঙ্কবিহারী এক ফর্দ্দ করিল ষাট হাজার টাকার। রাণী জগদ্ধাত্রীকে বুঝাইল যে স্বাধীন নৃপতির বিবাহে মাত্র

ষাটহাজার টাকা খরচ ত অতি সংক্ষেপে নমো নমো করিয়া কাজ সারা!

রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—তা ত বটেই! কিন্তু বাকী বিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় কোথায়? আমার ত তোরা কিছু বাকী রাখিস নি!

—কেন? আপনার কোম্পানির কাগজ রয়েছে ত!

—সে আমি ভূপালকে দেবো মনে করেছি।

—হাঁ সে ত দিতেই হয়। কিন্তু এখন কাজ আটকাচ্ছে, ঐটা ভাঙিয়ে এখন খরচ হোক, তারপর কুবের সাবালগ হয়ে রাজা হলে ষ্টেট থেকে সে আপনাকে পঁচিশ কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে!

রাণী জগদ্ধাত্রী কোম্পানির কাগজখানি বাহির করিয়া বঙ্কবিহারীর হাতে দিলেন। শুভকর্ম্মে অনেক বিঘ্ন ভাবিয়া কাঙালী স্বয়ং কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রাখাল যখন শুনিল যে কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার ভয় হইল যে কুবের এবং বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণির সঙ্গে কাত্যায়নীর যোগ হইলে কাহারো তিষ্ঠিবার জো থাকিবে না। কাঙালীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া রাখাল কাঙালীকে বলিল —কাঙালী-দা, এ কাজটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?

কাঙালীর মুখ শুকাইয়া গেল, রাখাল কোম্পানির

কাগজের কথা বলিতেছে মনে করিয়া শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল:—কি ?

—বংশজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া।

কাঙালী হাঁফ ছাড়িল।—কেন ক্ষতি কি ?

—তুমি এতবড় কুলীন, দেশে সমাজ নিমন্ত্রণ হলে আগে তোমাকে মালাচন্দন দিয়ে বরণ করতে হত; বংশজের বাড়ী অনুগ্রহ করে ভাত খেতে তুমি পাঁচটাকার কম দক্ষিণায় রাজি হতে না; আর আজ অক্লেশে তুমি সেই কুলমর্য্যাদা একেবারে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছ! আমি ত কুল-ফুল মানিনে, তোমরা মানো বলেই বলছি।

কাঙালী লজ্জিত হইয়া বলিল—কি জানো রাখাল, মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে··

—তোমার আরও মেয়ে রয়েছে। তোমার ছেলের মেয়ে রয়েছে, আরও হবে। তাদের মুখের দিকে ত তাকাচ্ছ না। তাদের এর পর কি গতি হবে? কোথায়ই বা তাদের বিয়ে দেবে, আর সমাজেই বা তোমার অবস্থা কি হবে তা ভেবে দেখেছ কি ?

—পয়সা থাকলে বিয়ের জন্যে আটকাবে না।

—তুমি ত মাত্র দুশো টাকার চাকরী কর।

—রাজা জামাই হলে সেই তার শ্বশুরবাড়ীর মেয়েদের ভালো জায়গায় বিয়ের খরচ দেবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—অনিশ্চিতের আশায় নিজের

জাতের সম্মানটা ঘোচানো ভালো হচ্চে কি না, আর একবার ভালো করে ভেবে দেখো!

কাঙালী গুম হইয়া রহিল। রাখাল চলিয়া যাইতে না যাইতেই রাজবাড়ীতে রাষ্ট হইয়া গেল যে রাখাল বিবাহে ভাঙচি দিতে গিয়াছিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—বৌ যে বলে, রাম সবার বন্ধু, রামের বন্ধু কেউ নয়, সে সত্যি! রাখাল আর মণি কুবেরের হিংসাতেই গেল।

চন্দনমণি বলিল—দেখলে দিদি, আমি কি মিথ্যে কথা বলি, না হিংসে করে বলি। মণি যে কুবিরের অত যত্ন করে, তার মতলব কি বুঝিনে, কুবির রাজা হলে ওর স্কন্ধে চেপে সুখ করবার ফিকির!

কুবের বলিয়া উঠিল—সে আর হচ্ছে না! আমি সবাইকেই চিনে নিয়েছি। আগে আমি স্বাধীন রাজা হই, তারপর দেখাব মজা!

চন্দনমণির একটা বড় রকমের দুর্ভাবনা ঘুচিল।

ইহার পর রাখাল মণিমালা ও ভূপালকে দেখিলেই রাণী জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া বসেন। তাহাদের সহিত কথা বলা একরকম বন্ধ হইয়া গেল এবং চন্দনমণির সহিত ঘনিষ্ঠতা আবার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

(৫১)

রাজার বিবাহ। সমারোহ আয়োজন নিমন্ত্রিতের আর

অন্ত নাই। বাড়ীর ভিতরে রাণী জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সব তদারক করিতেছেন, চন্দনমণি চেঁচাইয়া আপনার গুরুত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, আর মণিমালা নীরব হাসিমুখে সারা দিনরাত সকল কাজ করিয়া ফিরিতেছে। বাড়ীর বাহিরে বঙ্কবিহারী তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবোলার নল মুখে চাপিয়া গম্ভীর রাজকায়দায় হুকুম চালাইতেছে, দেওয়ান দীনদয়াল ও কাঙালী কাজের চেয়ে গণ্ডগোল বেশী করিতেছে এবং কাঙালী যে আর কেউ-কেটা নয়, সে রাজারও শ্বশুর ইহা সে সুযোগ পাইলেই লোককে খুব কড়া রকমে বুঝাইয়া দিতেছে; আর রাখাল নিমন্ত্রিত অভ্যাগত লোকদের বাসায় বাসায় গিয়া কাহার কি অভাব আছে, কাহার কি অসুবিধা হইতেছে, হাসিমুখে মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতেছে।

বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত। কিন্তু কলিকাতার সেকরারা আজ পর্য্যন্ত গহনা দিল না; বঙ্কবিহারী লোক পাঠাইয়াছে, টেলিগ্রাম করিয়াছে—কিন্তু না লোক ফিরিতেছে, না কোনো জবাব পাওয়া যাইতেছে। বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি অত্যন্ত বিষন্ন ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—নূতন রাজরাণী বাড়ীতে আসিবে অথচ তাহাকে কোনো আভরণ দিতে পারা যাইবে না! চন্দনমণি এক-একবার রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে আসিয়া হতাশাকাতর স্বরে বলিতেছে—দিদি, কি

হবে ?—রাণী জগদ্ধাত্রী নিরুপায় ভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার দিকে শুধু তাকাইয়া থাকেন।

বিবাহের দিন আসিল, কিন্তু গহনা আসিল না। গহনার জন্য বিবাহ আটক থাকিল না, বিবাহ নির্দ্দিষ্ট লগ্নেই হইয়া গেল।

বাড়ীতে নববধূকে বরণ করিয়া লইতে গিয়া মণিমালা দেখিল সোনা রূপা জহরৎ জড়োয়া গহনায় বধূর আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া গিয়াছে—মাথার মুকুট হইতে হাতের রতনচূড় ও পায়ের চরণচাঁদ পর্য্যন্ত কোনো গহনারই অভাব নাই, বধূর গায়ে হাজার দশ পনর টাকার অলঙ্কার চাপানো আছে। মণিমালার বুঝিতে বাকি রহিল না কাঙালী এত গহনা পাইল কোথায়। বরণ করিয়া কুবেরকে চন্দনমণি, ও কাত্যায়নীকে মণিমালা কোলে করিয়া উপরে তুলিল—সজীব ও নির্জীব বোঝা বহিয়া মণিমালার ত শাস্তির একশেষ!

কড়িখেলা ও মঙ্গলভাঁড় ঢাকা শেষ হইলে চন্দনমণি বলিল—দিদি, এইবার বেটা বৌকে আশীর্ব্বাদ কর। কিন্তু একখানা গহনাও দেওয়া হবে না—সব অলক্ষণ! গোড়া থেকেই যে টিকটিকি লেগেছে, এতে কি আর শুভ হয়! রাজার রাণী হয়ে এল তা আজকে একখানি গহনা অঙ্গে উঠল না!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ঐ ত অত গহনা দেওয়া হয়েছে মামীমা, বৌএর গায়ে আর জায়গা কোথায়?

চন্দনমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ও ত ওর বাপ দিয়েছে! ছাঁ-পোষা মানুষ, তবু মেয়েকে রাজরাণী সাজিয়ে ত দিতে হয়েছে! কিন্তু শাশুড়ী ননদের কাছ থেকে ত একটু সোনার আঁচড়ও পেলে না।......তা মা মণি, দিদির গহনাগুলো এখন তুই এনে দে, গহনা গড়িয়ে এলে তুই তখন ফিরিয়ে নিস। আজকের মঙ্গল-আচারটা ত হয়ে থাক।

মণিমালা একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল। তিনি নীরবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন, মণিমালার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিত হইলে তিনি দৃষ্টি নত করিয়া বসিলেন। তখন মনিমালা বুঝিল কলিকাতা হইতে গহনা গড়াইয়া কেন পৌঁছে নাই, এবং সেসব গহনা কেনই বা কাঙালীর বাড়ী ঘুরিয়া কাত্যায়নীর অঙ্গে চড়িয়া রাজবাড়ীতে বেনামিতে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল এই প্রবঞ্চনার চক্রান্তের মধ্যে তাহার মা সুদ্ধ আছেন। তাহাকে গহনাগুলি দিয়া মায়ের অনুতাপ হইয়াছে! কাহারো মনের ক্ষোভ সে রাখিবে না। সে অমনি দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। এবং তখনি সেই হাতীর-দাঁতের বাক্সটি আনিয়া বর ও বধূর সামনে কিংখাবের বিছানার উপর রাখিয়া সেই বাক্সর ডালা খুলিয়া ফেলিল। তারপর কাত্যায়নীর সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া তাহার গা হইতে তাহার সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিল এবং বাক্স

হইতে গহনাগুলি তুলিয়া তুলিয়া একে একে সমস্ত তাহাকে পরাইয়া দিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বৌ, এই সমস্ত গহনা আমি তোমাকে যৌতুক দিলাম!

রাণী জগদ্ধাত্রী ও চন্দনমণি, বঙ্কবিহারী ও কাঙালী এই বিজয়িনীর সম্মুখে নিতান্ত নিষ্প্রভ অপ্রতিভ হইয়া গেল। সমস্ত বিবাহ-উৎসবটা অলঙ্কারের স্থূচিমুখের বিদ্রূপে ম্লান হইয়া উঠিল। কেবল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল মণিমালার মুখ—জয়ের আনন্দে; রাখালের মুখ—পত্নীসৌভাগ্যের গর্ব্বসুখে; আর পরিজনদের মুখ—বিস্ময় সম্ভ্রমে! চন্দনমণি দাবার চালে মাত করিতে আসিয়া হঠাৎ বোড়ের কিস্তিতে এমন ঠকিয়া গেল যে সে তখন ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিতে চাহিতেছিল।

কিন্তু চন্দনমণির সে ভাব ক্ষণিক মাত্র। সে জোর করিয়া সঙ্কুচিত মুখের উপর শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—তা দেবে বৈ কি, তা দেবে বৈ কি, তুমি হলে বড় ননদ! আগে তুমি, তবে ত কুবির! রাজার মেয়ের এই রকমই নজর হবেই ত!... ওমা বৌমা, তোমার বড় ননদকে পেন্নাম কর ...

কিন্তু বিবাহের উৎসব আর কিছুতেই জমিতে পাইল না। চাকরদাসী নিমন্ত্রিত পরিজন স্থবিধা পাইলেই শুধু মণিমালার দানের কথা আলোচনা করে। এই ব্যাপারটা এত বড় অসাধারণ ঠেকিয়াছিল যে সকলের মনে রাজার বিবাহ-উৎসবের উপরেও ইহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

সকলের ধিক্কার ও কানাঘুষার গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য বঙ্কবিহারীর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া চন্দনমণি মুখ বাঁকাইয়া বলিল—মণিটার দেমাক দেখেছ! ভাঙেন ত মচকান না, এমনি হিংসে!

বঙ্কবিহারী বলিল—ইহার মধ্যে নিশ্চয় রাখালের টিপ আছে।

চন্দনমণি পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তা যাই হোক, গহনাগুলো ত ওর খপ্পর থেকে উদ্ধার করা গেছে!

মণিমালার এই অসাধারণ ত্যাগে ফল হইল এই যে সে ও রাখাল কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের বিবাহে আপত্তি তুলিয়া সকলের যেরূপ অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিল তাহা ঘুরিয়া গেল, তাহারা এই বাড়ীর আবার সর্ব্বপ্রধান হইয়া পড়িল। যাহারা তাহাদের মাথা নত করিতে চেষ্টা করিতেছিল তাহারাও তাহাদিগের নিকট নত না হইয়া থাকিতে পারিল না, সকলেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

যখন এইরূপে সকল উপদ্রব নিরস্ত হইয়া গেল তখন আর রাখাল ও মণিমালার এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার আগ্রহ রহিল না; তাহারা প্রাণপণ সেবাযত্নের পরিবর্ত্তে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিতে-ছিল না। রাণী জগদ্ধাত্রী যদি কখনো কিছু টাকা হাতে

তুলিয়া দিতেন তাহাই রাখাল ও মণিমালা লইত; রাখাল যাহা পাইত তাহা তাহার গোসাঁইদাদাকে পাঠাইয়া দিত, আর মণিমালা যাহা পাইত তাহা দিয়া সে স্বতন্ত্র সংসার পাতিবার মতন জিনিষপত্র কিনিত—সেদিন দুধ ঢালিয়া লইবার মতন একটা বাটিও তাহার নিজের ছিল না, ইহা তাহার মনে বড় বেশীরকম বাজিয়াছিল।

(৫২)

বিবাহের গোলমাল মিটিতে না-মিটিতে কুবের সাবালগ হইবার সময় আসিল। কুবের নিজে জমিদারীর ভার লইবে, কোর্ট-অব-ওার্ডসের অধীনতা ঘুচিয়া যাইবে, এই সম্ভাবনার উল্লাসে সকলের মন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কোর্ট-অব-ওার্ডস তাহার অধিকার-কালের সমস্ত হিসাবের নিকাশ-আপেরী প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তখন ধরা পড়িল রাজনাথ ও দীনদয়াল অনেক টাকা চুরি করিয়াছে। কাঙালীরও যোগ ছিল বোধ হয়, কিন্তু তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার মতন কোনো প্রমাণ সে রাখে নাই; যে একটু ক্ষীণ ঘুর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় কাঙালী মাত্র হাজার খানেক টাকা নিজের পকেটজাত করিয়াছিল।

ম্যানেজার উহাদের তিনজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া নালিশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাঙালী বুক ফুলাইয়া

বলিয়া বেড়াইতেছে—হুঁঃ! আমি রাজার শ্বশুর! আমার ত সব করবে!

'রাখাল ম্যানেজারকে ধরিয়া বসিল—ঐ তিনজনে যদি চুরির টাকা প্রত্যর্পণ করে তবে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভদ্রলোকের ছেলেকে জেল খাটাইয়া উহাদের আখের নষ্ট করিয়া ষ্টেটের লাভ কি?

অনেক বলা-কহায় ম্যানেজার রাজি হইল। এবং রাজনাথ ও দীনদয়াল চুরির দৌলতে যে বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিল তাহার সমস্ত বেচিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া জেলে যাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিল।

কাঙালী কিন্তু নুইয়া ডুব দিতে চায় না। রাখাল তাহাকে টাকাটা ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করাতে সে মাথা ঘুরাইয়া বুক ফুলাইয়া বলিল—হুঁঃ! নিয়েই যদি থাকি আমি, আমার জামাইএর টাকা নিয়েছি! তাতে কার বাবার কি! আমি রাজার শ্বশুর! আমায় অমনি জেল খাটালেই হল?

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল—ইংরেজের আদালতের কাছে রাজাদেরই জারিজুরি খাটে না, তা আবার রাজার শ্বশুর! তুমি তোমার জামাইএর টাকা ত নাওনি, ও কোর্ট-অব-ওার্ডসের টাকা! তাদের যখন রাজাকে হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে কড়া ক্রান্তি মিলিয়ে, তখন তারা তোমাকে রেয়াৎ করবে কেন?

কাঙালী ভয় পাইয়া একটু দমিয়া গিয়া বলিল—আচ্ছা রোসো, রাজামামাকে রাজাবাবুকে রাণীমাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, পরামর্শ করি......

রাখাল বিরক্ত হইয়া জোরে বলিয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করি, পরামর্শ করি, হচ্ছে হবে, নয়। টাকা দিতে হবে। তোমার চাকরী হয়েছিল আমার সুপারিশে। তুমি টাকা নিয়ে আমাকে অবিশ্বাসী করেছ; তোমার অপমানে আমার অপমান! তুমি হয়ত মনে করতে পার টাকাটা ত মেরে দিয়েছি, আসি না হয় দুদিন জেল খেটে! তা আমি হতে দেবো না—তুমি যদি টাকা না দাও আমাকে দিতে হবে, তোমাকে বাঁচাতে চাই আমার নিজের মান বাঁচাবার জন্যে।

রাখালের এই কথা শুনিয়া কাঙালী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; সাহস পাইয়া খুব জোর করিয়া বলিল—তা তোমার যা খুনী করগে—আমি কিছুতেই টাকা দিচ্ছিনে—রাজার শ্বশুর আমি! কার সাধ্য আমার কিছু করতে পারে।

রাখাল আর কোনো কথা না বলিয়া রাগে গসগস করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

মুখে রাজার শ্বশুর বলিয়া খুব আস্ফালন করিয়া বেড়াইলেও কাঙালী অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল, যদি রাখাল টাকাটা শেষে নাই দ্যায়, যদিই হঠাৎ

পুলিশ আসিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া এত লোকের সামনে দিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিতে-টানিতে লইয়া যায়!

রাখালের বিষম চিন্তা হইল কাঙালীর চুরির টাকাটা সে কোথা হইতে কেমন করিয়া শোধ করিয়া দিবে। সে রাজার জামাই বটে, কিন্তু তাহার হাতে ত একটা পয়সাও নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট হইতে সামান্য অর্থ যখন যাহা পাইয়াছে তাহা গোসাঁইগঞ্জের আত্মীয়দের যত্নের ঋণের সুদ দিতেই শেষ হইয়া গিয়াছে! মণিমালার কাছেও ত বেশী কিছু থাকিবার কথা নয়। রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে চাওয়া যায়, কিন্তু কাঙালীর চুরির ঋণ তিনি শোধ করিতে যদি অস্বীকার করেন, সে বড় অপমান। তবে কি কুবেরকে বলিবে যে তোমার শ্বশুর চুরি করিয়াছে, হাজার খানেক টাকা দাও? না, তাহা বলাতে কুবেরকে অপমান করা হইবে, লজ্জা দেওয়া হইবে। তবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখাল ম্যানেজারের কাছে গিয়া বলিল—সাহেব, আমি মাস পাঁচ ছয় মাইনর ওয়ার্ডকে পড়াইয়াছিলাম; তাহার জন্য আমি ষ্টেট হইতে কিছু পাইতে পারি কি?

সাহেব আনন্দিত হইয়া বলিল—নিশ্চয়! কমিশনার সাহেব ত আড়াইশ টাকা দক্ষিণা আপনার জন্য মঞ্জুর করিয়া গিয়াছিলেন, আপনিই লন নাই। বিল করুন, আমি আপনার টাকাটা খাজাঞ্চিকে দিতে বলিতেছি।

রাখাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল—আমি আর বিল করব না; আমার নামে হাজার টাকা খরচ লিখে কাঙালীর কাছে ষ্টেটের পাওনা হাজার টাকা শোধ করে জমা করে নিতে বললে আমি অত্যন্ত উপকৃত হব, আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকব।

ম্যানেজার অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—রাখাল বাবু, আপনি ঐ বদমায়েস কাঙালীটার জন্য এত করছেন, সে আপনার কে?

—সে আমার সম্বন্ধীর শ্বশুর; সে আমার গ্রামের লোক; আমার সুপারিশে তার চাকরী হয়েছিল; আর তার জন্যে আমার চাকরী জুটেছিল।

কাঙালী বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্য ম্যানেজারের কাছে প্রার্থনা জানাইতে, নিজের প্রত্যাখ্যাত অর্থ পুনরায় যাচিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিতে রাখালকে যে কতখানি খাটো হইয়া অপমান স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল তাহা কেহ ঠিক করিয়া অনুভব করিতে পারিল না।

কাঙালী অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—রাখালের এ ভারি অন্যায়, এ হিংসে করে আমায় অপমান করা, আমাকে লোকের কাছে চোর বানানো!—আমি টাকা নিইনি বলেই ত আমি নির্ভয়ে ছিলাম! নালিশ করত, আদালতে আমার নির্দ্দোষিতা

প্রমাণ হয়ে যেত। এ ধরে ভদ্দর ঘটিয়ে একজন ভদ্র-লোককে চোর করা!

কুবের শুনিয়া বলিল—আচ্ছা! আগে আমি রাজা হই তখন দেখে নেবো!

বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি বলিল—রাখাল মুখে বলেন টাকা নিইনে, টাকা চাইনে; এদিকে কিন্তু ম্যানেজারের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বাকী বকেয়া হিসেব করে মাইনে চুকিয়ে নেওয়া হয়েছে! ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আর কি!

নিরন্তর এই-রকম কথা শুনিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

(৫৩)

মহা সমারোহের উৎসব-আনন্দের মধ্যে কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আসিয়া কুবেরকে জমিদারীর সমস্ত ভার বুঝাইয়া দিয়া রাজপদে অভিষেক করিয়া গেলেন। তাঁহারা রাখালকে বলিয়া গেলেন—আপনিই রাজাকে দেখিবেন, সুপরামর্শ দিবেন, রাজা এখনো বালক।—কুবেরকে বলিয়া বুঝাইয়া গেলেন—তুমি রাখাল-বাবুর পরামর্শ লইয়া চলিও, তোমার মঙ্গল হইবে, রাজ্যের প্রজা সুখী হইবে।

রাখাল তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইল। কুবের গোঁজ হইয়া মাথা বাঁকা করিয়া রহিল।

কুবের রাজ্যপরিচালনের অধিকার হাতে পাইয়াই

বঙ্কবিহারী ও কাঙালীর পরামর্শে হুকুম দিল—সমস্ত ব্রহ্মত্র দেবত্র চাকরান লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত হোক্; কাহারো কোনো অধিকার থাকে সে দলিল দস্তাবেজ দেখাইয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া যাক।

দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল। কত বিধবার, কত অনাথ শিশুর, অন্ন-সংস্থানের উপায় গেল; কত দেবতার মন্দিরে পূজা বন্ধ হইয়া গেল; কত দরিদ্র একেবারে নিঃস্ব সম্বলহীন হইয়া পড়িল। এই-সমস্ত জমি পাহাড়পুরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজারা দিয়া গিয়াছেন—কাহাকেও মাত্র মুখের কথায়, কাহাকেও মাত্র এক চিল্‌তে ফাঁস কাগজে লিখিয়া—সে কাগজ দুতিন-পুরুষ আগেই হয়ত উইএ খাইয়াছে, কি গৃহ-দাহের সময় আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তাহাদের একমাত্র দলিল তাহারা এতদিন নির্ব্বিবাদে বিনা ওজরে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে, স্বর্গীয় মহারাজ ধনেশ্বরের আমলে কখনো কোনো আপত্তি উঠে নাই।

কুবের এমন ফাঁকা প্রমাণে ঠকিবার পাত্র নয়—তাহার এককানে বঙ্কবিহারীর, অন্যকানে কাঙালীর মন্ত্রগুঞ্জন হইতেছে; এবং তাহাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য কুবেরের অন্তঃপুরে জননী চন্দনমণি ও জায়া কাত্যায়নী মুখাইয়া আছেন—স্বামীর বা পিতার টিপ্‌টি পাইলেই হইল।

রাখাল বলিল—এ-সমস্ত বড় অন্যায় হচ্ছে কুবের!

তোমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি আর গরিবদের রুজি লোপ করে অখ্যাতি আর মন্যু কুড়িও না! এতে সুখ নেই, মঙ্গল নেই!

কুবের মাথা নীচু করিয়া হনহন করিয়া রাখালের নিকট হইতে চলিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া কাত্যায়নীকে বলিল—হুঁঃ! সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ওঁর মতন ফকির হই আর কি! গরিবের রুজি মেরেই ত জমিদার! আর, ভারি পূর্ব্ব-পুরুষ দেখাতে এসেছে! এরা আমার কোথাকার কে?—

মামার শালা, পিসের ভাই,
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

কাত্যায়নী তাহার সুন্দর মুখখানি ঘুরাইয়া বলিল—কক্খনো ওদের কথা শুনো না, ওরা চিরকাল আমাদের হিংসে করে!

কাঙালী আসিয়া আমতা-আমতা করিয়া রাখালকে বলিল—দ্যাখো রাখাল, রাজাবাবু তোমাকে বলতে পাঠালেন যে আমি রাজা, আমার রাজকার্য্যে কেউ টিকটিক করে এ আমি পছন্দ করিনে। তা তুমি……

রাখাল অবাক হইয়া কাঙালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাঙালী আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল।

কত লোক আসিয়া সদরে ধন্না দিয়া পড়িল, রাখালকে ধরিয়া বসিল তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে। কত বিধবা অপোগণ্ড শিশু লইয়া আসিয়া অন্দরে মণিমালার কাছে

কাঁদিয়া পড়িল—এ বিপদে যদি কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে তবে সে মণিমালার পরম ধার্ম্মিক ন্যায়বান স্বামী রাখাল-বাবু!

রাখাল ও মণিমালা প্রতিকারের অক্ষমতা জানাইল। দরিদ্র ব্যথিতদের চোখের জল পড়িতে দেখিয়া গোপনে শুধু নিজেদের চোখ মুছিল। তাহারা তাহাদিগকে বঙ্কবিহারী ও রাণী জগদ্ধাত্রীকে দুঃখ জানাইতে পরামর্শ দিল।

বঙ্কবিহারী বলিল—হুঃ। স্বাধীন নৃপতি আছে—তার যা খুশী করতে পারে। এতে কাহারো কিছু বলবার নাই।

রাণী জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কুবের আমার কথা রাখবে না। আমাকে মিছে বলা।

সকলে হতাশ হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ভগবানের উপর বিচারের ভার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, ফিরিল না কেবল মহিষবাথানের বেচন চক্রবর্ত্তী। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছে হয় ব্রহ্মত্র উদ্ধার করিবে নয় ব্রহ্মহত্যা হইয়া লোভী রাজাকে ধনের সহিত প্রাণও দিয়া আসিবে। বেচারা নিত্য কাছারীতে দরবার করিতে যায়, একদিনও রাজার সাক্ষাৎ পায় না, কর্ম্মচারীরা তাহাকে পাগল বলিয়া হাঁকাইয়া দ্যায়। তবু বেচনের উদ্যমের শৈথিল্য নাই।

একদিন রাখাল ও কুবের ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইয়া ফিরিয়া ঘোড়া হইতে যেই নামিয়াছে, অমনি কোথা হইতে

বেচন চক্রবর্ত্তী লাফাইয়া আসিয়া কুবেরের রাইডিং-বুট-পরা দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—দোহাই মহারাজের, ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন। আমার পক্ষে বলবার কি আছে শুধু সেই কথাটি দয়া করে শুনুন। ... ...

কুবের বুটসুদ্ধ লাথি মারিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূরে ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়া গটগট করিয়া রংমহলের দিকে চলিয়া গেল। রাখাল গর্জ্জন করিয়া ডাকিয়া উঠিল—কুবের!

কুবের ফিরিয়া না তাকাইয়া টকটক করিয়া সিঁড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া গেল— প্রজা পাইক বরকন্দাজদের সামনে রাজা কুবেরকে রাখাল অপমান করিয়াছে।

চন্দনমণি বলিল—পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে! গেলেন বলে, আর দেরী নেই।

বঙ্কবিহারী শাদা-শাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—

'কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী?
মঙ্গল অষ্টমে কার রন্ধ্রগত শনি?'

শাস্ত্রেই আছে—

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ!
অতি দানে বলির্বদ্ধ, সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্॥'

রাণী কাত্যায়নী বলিল—

'অত বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে।'

রাণী জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া বলিলেন—রাখাল চিরকেলে গোঁয়ার! মহারাজকে জ্বালিয়েছে, এখন কুবেরকে জ্বালাতে আরম্ভ করেছে।

বৃন্দাবন গোস্বামী রাখালকে চিঠি লিখিয়াছেন যে তাঁহাদেরই বাড়ীর পাশে উদ্ধব গোসাঁইএর বাড়ী হাজার টাকায় বিক্রী হইয়া যাইতেছে, যদি রাখাল টাকা পাঠাইতে পারে তবে তিনি উহা রাখালের জন্য কিনিয়া রাখিতে পারেন।

মণিমালা রাখালকে বলিল—এখান থেকে চলে চল, উদ্ধব গোসাঁইএর বাড়ীটা কিনে আমরা থাকব।

রাখাল বলিল—না মণি, এখান থেকে গেলে চলবে না, কুবের দিন দিন যে-রকম হয়ে উঠছে, তাকে রক্ষা করবার, পরামর্শ দেবার, উপদেশ দেবার কেউ না থাকলে জমিদারী রসাতলে যাবে।

—কিন্তু ওরা ত তোমার উপদেশ চায় না, বিরক্ত হয়।

—ওষুধ খেতে তেতো লাগে, কিন্তু রোগ সেরে গেলে ওষুধের গুণ টের পাওয়া যায়। একটু বয়েস হলেই কুবের ভালো মন্দ বুঝতে পারবে।

মণিমালা নিরস্ত হইল। পরের উপকার করার একটা বৃহৎ ও মহৎ আবরণের অন্তরালে, খাওয়া-পরার ভাবনা

না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইয়া দিবার সুযোগের প্রতি একটু মমতা বোধহয় রাখালের মনের মধ্যে এক কোণে অতি গোপনে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য সে নিজে না বুঝিয়াও বারবার এই রাজবাড়ী ছাড়িয়া যাইতে নানা-রকম ওজর তুলিতেছিল। চিরদিন যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার এই এতটুকু নিশ্চিন্ত আরাম জোর করিয়া ভাঙিতে মণিমালার ক্লেশ হইত, তাই সেও কখনো জোর বা জেদ করিতে পারিত না।

(৫৪)

বেচন চক্রবর্ত্তীকে জুতা-সুদ্ধ লাথি মারিয়া রাখালের নিকট ভর্ৎসিত হওয়ার পর কয়েক দিন কুবের আর রাখালের কাছে দেখাই দ্যায় নাই। কুবের লজ্জিত হইয়াছে ভাবিয়া রাখাল খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মণিমালা দেখিতেছিল সকলেই কেমন ভার ভার; সকলেই যেন ফিসফিস করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে অথচ তাহা তাহার নিকটে লুকাইতে চাহিতেছে। একদিন প্রভাতে মণিমালা নিজের ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল রাণী জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছেন, মণিমালাকে দেখিয়া তাঁহার কান্না আরো বেশী হইয়া উঠিল; চাকরদাসীরা সকলেই ম্লানমুখে এক এক জায়গায় জড়ো হইয়া চুপিচুপি কি বলাবলি করিতেছে, মণিমালাকে

দেখিয়াই চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া সরিয়া যাইতেছে; চন্দনমণির মুখে কেমন একটা টেপা হাসি পালিশকরা ইস্পাতের ছুরির সরু ফলার মতো বড় নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল; কাত্যায়নী চোখ ঘুরাইয়া সারা অঙ্গে ঢেউ তুলিয়া কৌতুকে হাততালি দিয়া-দিয়া বলিয়া-বলিয়া ফিরিতেছিল—আজকে একটা মজা হবে গো! আজকে একটা মজা হবে গো!

হানা-বাড়ীর মতো সমস্ত বাড়ীটাতে একটা কি অব্যক্ত ভয় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; পিশাচীর হাসির ন্যায় কাত্যায়নীর হাসি কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গল ফেরি করিয়া ফিরিতেছিল; সয়তানীর হাসির ন্যায় চন্দনমণির হাসি বিষের জ্বালার ঝলক বলিয়া মনে হইতেছিল।

ভীত শুষ্ক মুখে মণিমালা কাত্যায়নীকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হবে বৌ? আজকে কি হবে?

অট্টহাস্য করিয়া কাত্যায়নী বলিল—হবে হবে, সে একটা মজা হবে!

—মামী, তুমি বল না কি হয়েছে?

চন্দনমণি ক্রূর হাসি হাসিয়া রহস্য আরো নিগূঢ়তর করিয়া বলিল—কি জানি বাছা, পাগলীর মেয়ে বৌমা কি বলছে!

মণিমালা চাকরদাসীদের জিজ্ঞাসা করিল—ওরে কি হয়েছে তোরা জানিস যদি বল্।

সকলে ছলছল চোখে একবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে সরিয়া গেল।

মণিমালা মাকে জিজ্ঞাসা করিল—মা, মা, তুমি বল কি হয়েছে।

তিনি শুধু বেশী করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মণিমালা বলিল—তবে যাই আমি কুবেরকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

কাত্যায়নী মুচকি হাসিয়া বলিল—সে পথে কাঁটা পড়েছে।

মণিমালা সে কথা কানে না তুলিয়া কুবেরের মহলে যাইতে গেল; আকালু খানসামা বলিল—মহারাজ কাহাকেও যাইতে দিতে মানা করিয়াছেন।

মণিমালা অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই বুঝিতে-না-পারার ব্যাপার হইতে দূরে থাকিবার জন্য মণিমালা তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল; অমনি চন্দনমণি ও কাত্যায়নী হো হো হো করিয়া রাক্ষসীর মতো নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল।

রাখাল কাছারীতে গিয়া বসিয়াছে, সেখানেও সকলে এমনি উদাস ভাবে একএকবার তাহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে এবং রাখাল অন্যদিকে ফিরিলেই আমলারা আপনাদের মধ্যে কি বলাবলি করিতেছে।

রাখাল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হে? কি হয়েছে?

সকলে অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আজ্ঞে কিছু না।

রাখাল সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া কাছা... হইতে নামিয়া অন্দরে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া কাঙালী তোষাখানা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বলিল—রাখাল-ভায়া, তুমি একবার ওপরে এস।

রাখাল প্রশ্নমাত্র না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাঙালীকে অনুসরণ করিয়া চলিল—আজকের বাতাসে এমনি একটা অজানা রহস্য ভাসিতেছিল যে তাহার মধ্যে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য যেন কিছু ছিল না, যা-খুসী একটা উদ্ভট কাণ্ডের বীজ যেন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবার জন্য ফাটিবার উপক্রম করিতেছে!

তোষাখানায় বিরাজ করিতেছিল বঙ্কবিহারী। রাখাল আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কাঙালী বলিল—বস, বলছি।

রাখাল চুপ করিয়া বসিল। কাঙালীও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কেহ কোনো কথা কহে না, কেহ কাহারো দিকে চাহে না, কেহ একটু নড়িতে বা নিশ্বাসের শব্দ করিতেও যেন ভয় পাইতেছে!

হঠাৎ কাঙালী বলিয়া উঠিল—রাজাবাবু তোমাকে বলতে বললেন......

রাখাল মুখ তুলিয়া কাঙালীর দিকে চাহিল।

—তোমার ব্যবহার ইস্তক-নাগাদ তাঁর ওপরে শুধু শত্রুতা সাধাই হয়েছে।......

রাখাল অবাক আশ্চর্য্য!

—প্রথম দৃষ্টান্ত, তুমি রাজা-মামাকে ওয়ারেণ্ট দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিলে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, তুমি রতনপুর পরগণা ফাঁকি দিয়ে নিতে চেয়েছিলে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত, কাত্যায়নীর সঙ্গে বিবাহে তোমরা স্ত্রীপুরুষে আপত্তি তুলেছিলে। চতুর্থ দৃষ্টান্ত, রাজা-বাহাদুরের মাতা রাণী জগদ্ধাত্রী দেবীর গহনার হক পাওনাদার কাত্যায়নী-রাণীকে বঞ্চনা করে তোমার স্ত্রী সেগুলি আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। পঞ্চম দৃষ্টান্ত, তুমি আমাকে—রাজার শ্বশুরকে—চোর বানিয়েছিলে। ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত, তুমি শিক্ষক থাকা কালীন রাজা-বাহাদুরকে তামাক খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে প্রহার করেছ, উঠতে বসতে লেখাপড়া করাবার জন্য তিরস্কার করেছ। সপ্তম দৃষ্টান্ত, রাজা-বাহাদুর তাঁর প্রজাদের সঙ্গে যেমন খুসী ব্যবহার করবেন, তুমি তার জন্যে তাদের সামনে তাঁকে তিরস্কার ভর্ৎসনা করে প্রজাদের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করে আস্কারা দিয়েছ আর তাদের বিদ্রোহী হতে শিক্ষা দিয়েছ। অষ্টম দৃষ্টান্ত, তুমি রাজার স্বাধীনতায় বরাবর বাধা দিয়েছ।

এক নিশ্বাসে এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাঙালী একখানা

কাগজ রাখালের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই দেখ, রাজা-বাহাদুরের নিজের হাতে লেখা তোমার অপরাধের ফিরিস্তি। এখন রাজা-বাহাদুরের হুকুম—তুমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে তিন দিনের মধ্যে পাহাড়পুর ছেড়ে চলে যাবে। যদি না যাও, আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে, দরোয়ান দিয়ে বে-ইজ্জত করে তোমাদের বাড়ী থেকে বা'র করে দিতে হবে।

রাখাল মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিল—কাঙালী, শেষের কথাটা তোমার মুখ থেকে না বা'র করলেও তুমি পারতে।

কাঙালী লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি কি করব, আমি কি করব, আমার ওপরে রাজা-বাহাদুরের যেমন হুকুম!

রাখাল ঘৃণাভরে বলিল—তোমরা কজনেই ত কুবেরের মাথা খেলে। একজন বাবা, একজন মা, একজন শিক্ষক ও শ্বশুর—তোমরা রাতদিন তার কানের কাছে রাজা রাজা করে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ। এর ফল তোমাদেরও ভোগ করতে হবে।

রাখাল অপমানের লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে আপনাকে লুকাইবার জন্য অন্দরে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল, আজ তাহার মণিমালা-কেও মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ হইতেছিল।

(৫৫)

রাখাল গিয়া যেই ঘরে ঢুকিল অমনি কাত্যায়নী ও

চন্দনমণির উচ্চ হাস্যধ্বনি আবার সমস্ত বাড়ী ভরিয়া তুলিল।

মণিমালা রাখালের লজ্জিত মুখের দিকে ক্লিষ্ট মুখে চাহিয়া বলিল—আজকে ওদের সব কি হয়েছে, আমাদের দেখছে আর টেপাটিপি করে হাসছে? মা কেবল কাঁদছেন?

রাখাল অপরাধীর মতন বলিল—আমাদের কুবের তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাইতে ওদের অত আনন্দ। যেমন আমি এর আগে তোমার কথা শুনে যাইনি, তেমনি আজ গলাধাক্কা খেয়ে বেরুতে হচ্ছে। নাও তল্পি বাঁধো। তিন দিনের মধ্যে পাহাড়পুরের এলাকা ছেড়ে যেতে হবে, নইলে দরোয়ানে বেইজ্জত করে বার করে দেবে।

এই দারুণ অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়া আকাট হইয়া মণিমালা দাঁড়াইয়া রহিল।

দাবানলের ন্যায় এই সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্যের মেয়ে পুরুষ যে যতদূর হইতে আসিতে পারিল রাখাল ও মণিমালাকে শেষ বিদায় দিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সকলে কাঁদিয়া আকুল—তাহারা পিতৃমাতৃহীন হইল। রাজ্য দ্বিতীয়বার রাজা ও রাণীকে একসঙ্গে হারাইল! তাহাদের মান ইজ্জতের রক্ষক, সুখদুঃখের অংশীদার, তাহাদের ভয়ত্রাতা সহায় আজ বিদায় লইতেছে! এই সমস্ত লোকের সহিত রাখাল ও মণিমালারও প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহাদের

কাছে বিদায় লইতে ইহাদের চোখের জলের সঙ্গে তাহাদেরও চোখের জল মিশিতে লাগিল। সব-চেয়ে ভূপালবেশী কাঁদিল—তাহার দিদিমাকে আর সে দেখিতে পাইবে না; সে তাহার মামা-মামীকেও যে বড় ভালোবাসে; এখানেই তাহার জন্ম, এখানেই তাহার জ্ঞানের উন্মেষ, এখানকারই স্থান গাছপালা মানুষ তাহার পরিচিত প্রিয়; সে এই সমস্ত ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানে না। আর কষ্ট হইতেছে তাহার একমাত্র বন্ধু গৌরীপ্রসাদকে ও ম্যানেজার-সাহেবের কন্যা নেলীকে ছাড়িয়া যাইতে—নেলীকে যে সে বড় ভালোবাসিত; তাহারা সমবয়সী; ভূপালের খেলিবার জুটি এ বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, রাজার দৌহিত্র বাহিরের কাহারও সহিত মিশিতে পাইত না, কাজেই তাহার একমাত্র সঙ্গিনী সখী ছিল নেলী। নেলীও তাহাকে বড় ভালোবাসিত, ভূপাল চলিয়া যাইবে শুনিয়া সেও যে বড় কাঁদিয়েছে, তাহার পোষা খরগোশটা মরিয়া গেলেও সে এমন কান্না কাঁদে নাই। সব-চেয়ে ভূপালের কষ্ট বোধ হইতেছিল, আর দুইমাস মাত্র পরে তাহার ক্লাশের পরীক্ষা—সে নূতন স্কুলে গিয়া এ পরীক্ষায় হয়ত পাশ করিতে পারিবে না, তাহাকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আর-এক বৎসর হয়ত পড়িয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ক্রন্দন বৃথা! এ বাড়ীতে একমাত্র তাহারই অধিকার ছিল, কিন্তু

তাহার মাতামহের নাম-সই-করা এক ছত্র লেখায় তাহার অদৃষ্ট একেবারে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে, সে এখানকার কেউ নয়!

রাখাল মণিমালা ও ভূপাল রাণী জগদ্ধাত্রীর চরণে চোখের জল ফেলিয়া নীরবে বিদায় লইল। রাণী জগদ্ধাত্রীও নীরবে অশ্রুমোচন করিতে-করিতে রাখালের হাতে হাজার টাকার নোট তুলিয়া দিলেন; এই মাত্র তাঁহার শেষ সম্বল।

তাহারা চন্দনমণি ও কাত্যায়নীর কাছেও সকল ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া মিনতি করিয়া কাঁদিয়া বিদায় লইল—তাহারা শাশুড়ী-বৌএ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বঙ্কবিহারী হাসিতে-হাসিতে বলিল—দুঃখ করিয়ো না বাবাজী, ক্ষোভ করিয়ো না মা, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট!

মণিমালা শেষকালে আকালু খানসামার নিষেধ না মানিয়া কুবেরের কাছে গেল। কুবের গম্ভীর হইয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল—আজ সে দিদিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল না, ব্যস্ত হইয়া গড়গড়া লুকাইল না।

কুবেরের সম্মুখে চোখের জল জোর করিয়া বন্ধ রাখিয়া অকম্পিত সহজ স্বরে মণিমালা বলিল—শেষ বিদায়ের ক্ষণে তোমায় জানিয়ে যেতে এসেছি ভাই, ভগবান সাক্ষী, আমরা কখনো তোমার অহিত চিন্তা করিনি।

কুবের ক্রুদ্ধ হইয়া রুখিয়া বলিয়া উঠিল—করেননি? আগা-গোড়া হিংসে করে শত্রুতা করেছেন!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—আমরা তোমার হিংসে করে শত্রুতা করলে আজকে তোমার এমন করে অপমান করবার সুযোগ পেতে হত না, ভাই!

কুবের এ কথার জবাব দিতে পারিল না, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মণিমালা জয়ী হইয়া গর্ব্বভরে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

রাখাল বা ভূপাল কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

(৫৬)

যাহারা তাহাদিগকে চাহে না, নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে যাহারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল, তাহাদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে-করিতে মণিমালা কন্যা বিভাকে কোলে করিয়া পাল্কীতে উঠিল, রাখাল ভূপালকে লইয়া হাতীতে চড়িল। হরিহরছত্রের মেলা হইতে রাখাল এই হাতী পাল্কী ও ভূপালের চড়িবার জন্য একটি ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছিল;—আজ অনেক হাতী-পাল্কীর মধ্যে সেই পাল্কী সেই হাতী বাছিয়া তাহাদিগকে চিরবিদায় করিয়া দিতে পাঠানো হইয়াছে। হাতীটি দাঁতাল, পিঠে সওয়ারী চড়িলে সে মাঝে-মাঝে পিঠ ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিত। রাখাল সেই হাতীতে চড়িবার সময় হাসিয়া বলিল—বাহাদুর-গজ, এইবার তোমার পালা!

হাতী ও পাল্কী দেউড়ি পার হইয়া যাইতেই দুড়ুম দুড়ুম করিয়া দুইটা বোম ফুটিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে রাজার শত্রুরা রাজবাড়ীর হাতা ত্যাগ করিয়া গেল।

বোমের আওয়াজে সাধারণ লোকের বুক ফাটিয়া অশ্রু পড়িল। চন্দনমণি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— আঃ! এত দিনে আপদ বিদায় হল!

রাণী কাত্যায়নী চন্দনমণির দিকে চাহিয়া ক্রূর হাসি ঠোঁটের কোণে চাপিয়া রাখিয়া বলিল—আরো গোটা-কতক আপদ শিগ্‌গির বিদায় হবে!

চন্দনমণির মুখ শুকাইয়া গেল। উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে বৌমা, আবার কে? দিদি বুঝি?

কাত্যায়নী হাসিতে-হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে, আছে!

পাহাড়পুর হইতে রেল-ষ্টেশন কুড়ি ক্রোশ তফাতে। কার্ত্তিক মাস। সেই ছোট বড় অসংখ্য নদীতে ঘেরা দেশের বন্যার জল এখনো শুকায় নাই। নদীগুলি এখনো কানায়-কানায় পূর্ণ থাকিয়া খরবেগে বহিতেছে—পাহাড়িয়া নদীর স্রোত বিষম; নদীর কূলের দুই পারেও স্থানে-স্থানে জল জমিয়া আছে, কোথাও-কোথাও জল নামিয়া গিয়া কাদা হইয়াছে। এখনকার অবস্থা এমন যে ষ্টেশন পর্য্যন্ত বরাবর নৌকাতেও যাওয়া যায় না; হাতী-

পাল্কীরও পথ বেশ পড়ে নাই। কোনো-মতে ছোট-ছোট সোঁতাগুলি পার হইয়া ভীমশ্রী নদীর ধারে গিয়া পড়িতে পারিলে নৌকায় যাওয়া যাইতে পারে।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। হাতীর উপর ভূপাল ঘুমাইয়া গিয়া রাখালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রাখাল এক হাতে ভূপালকে ও একহাতে হাতীর গদির কাছি ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে একটা সোঁতা। পার হইতে হইবে। বেহারারা পাল্কী কাঁধে করিয়া জলে নামিল। সোঁতায় জল বেশী ছিল, জল পাল্কীর তলায় পৌঁছিল। বেহারারা পাল্কী মাথায় করিয়া চলিল। পাল্কী টলমল করিতেছে—যদি বেহারাদের হাত ফস্কাইয়া পড়িয়া যায় তাহা হইলে মণিমালা ও বিভার জীবনলীলা এইখানেই শেষ। ক্ষুদ্র বিভা ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া মায়ের গলা ধরিয়া বলিতে লাগিল—দুগ্‌গা দুগ্‌গা মাকে বেঁচে থেকো, বাবাকে বেঁচে থেকো, দাদাকে বেঁচে থেকো!

পাল্কী সোঁতা পার হইয়া গেল। বাহাদুর-গজ কূলে দাঁড়াইয়া পিঠ ঝাড়া দিয়া আপত্তি জানাইতে লাগিল সে জলে নামিবে না। মাহুত যত গজ-বাগ দিয়া তাহার মাথায় মারে, মেট যত ফার্শা দিয়া তাহার পশ্চাতে খোঁচা মারে সে তত জোরে পিঠ ঝাড়িতে থাকে। রাখালের প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় হইতে লাগিল এখনি হয়ত সে ভূপালকে লইয়া ছিটকাইয়া গিয়া জলে পড়িবে। তারপর ক্রুদ্ধ হাতী

শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জলেই চাপিয়া রাখুক বা পায়েই চাপিয়া ধরুক বা আছাড়ই মারুক ফল তাহার একই-প্রকার। রাখাল মাহুতকে বলিল—মন্নু মন্নু, আর মেরো না। ওকে ঠাণ্ডা করে আমাদের নামিয়ে দাও, আমরা হেঁটে সোতা পার হচ্ছি।—মাহুত বলিল—কুছ ডর নেই বাবু, আপনি চুপ করে বসে থাকেন।—আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন, বসিয়া থাকিতে দিলে ত! অনেক ধস্তাধস্তির পর হাতী জলে নামিল বটে, কিন্তু সম্মুখে ছিল গর্ত, হাতী হুন করিয়া গিয়া তাহাতে নামিয়া পড়িল, হাতীর পিঠ পর্য্যন্ত জল! রাখাল তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া লইল। বাহাদুর-গজ সেখানে আবার বাহাদুরী দেখাইতে আরম্ভ করিল। রাখাল একএকবার মনে করিতে লাগিল ভূপালকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া পলাইবে। কিন্তু হাতী শুঁড় ফিরাইয়া যদি ধরিয়া ফেলে! রাখাল হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিল—মণি, কুবেরের মনস্কামনা এবার পূর্ণ হল!

হঠাৎ এই উচ্চ কথা শুনিয়া হাতী জল হইতে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। এও ভয়ানক! তবু জলে দাঁড়াইয়া পিঠ ঝাড়া দেওয়ার চেয়ে ঢের ভালো।

এমনি করিয়া কোনো মতে সোনাখড়কে নদীর তীরে কাঁদনটোলা ডিহির কাছারীতে আসিয়া পৌঁছিল। মাহুত ও বেহারারা হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমাদের

কসুর মাফ হয়, মহারাজের হুকুম আমাদের এখান থেকেই ফিরতে হবে। না ফিরলে আমাদের রুজি যাবে, জান যাবে।

রাজার মেয়ে-জামাই-দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে একটা কাছারীর সামনে অসহায় নামাইয়া দিয়া যান বাহন সমস্ত ফিরিয়া চলিয়া গেল একটা কোথাকার কে বেদখলকার ছোকরার হুকুমে। অদৃষ্ট!

মণিমালা হতাশভাবে বলিল—এ যে দ্বীপান্তরে দেওয়া! উপায় কি হবে?

রাখাল শুষ্ক মুখে বলিল—দেখি ডিহির নায়েবের যদি দয়া হয়, সে যদি যাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

এমন সময়, সেই যে তুফানি রাখালকে ঘুষ দিতে গিয়া রাখালের কাছে চাবুক খাইয়াছিল, সে আসিয়া রাখাল ও মণিমালাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। সে হাত জোড় করিয়া বিনীতভাবে রাখালকে বলিল—হুজুর, রাজকন্যাকে আমার গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে বলুন। আমি আপনাদের ছেলে, এখানকার নায়েব-তহশীলদার।

তুফানির স্ত্রীকন্যা ঘোমটা দিয়া আসিয়া মণিমালাকে "ভক্তি" করিল। মণিমালা তাহাদিগের সহিত তুফানির অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। তুফানি রাখাল ও ভূপালকে আনিয়া নিজের হাতে মোড়া পাতিয়া বসাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—হুজুর, এ রাজ্য আপনার, আমি আপনার

গোলাম, আপনি অসঙ্কোচে এখানে থাকুন, আমি নৌকার জোগাড় দেখছি।

—তুফানি, শিগগির নৌকা দেখ। তোমাদের রাজা-বাহাদুরের হুকুম তিন দিনের মধ্যে তাঁর রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে, নইলে তাঁর দরোয়ান অপমান করে তাড়িয়ে দেবে।

তুফানি গর্ব্বভরে বলিল—কার সাধ্য আমার সামনে আপনার অপমান করবে? আমার তাবে একশো লাঠিয়াল পাইক আছে, তারা মরবে, আমি মরব, আমার স্ত্রীপুত্র-কন্যা মরবে, তারপর আপনাদের দেখা পাবে। আমি মহারাজের চাকর; কিন্তু আপনি আমার কাচ্চা-বাচ্চার মুখের ভাত রক্ষা করে দিয়েছিলেন।—আমাদের জান ও মালের ওপর আপনার অধিকার।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল—তুফানি, আমি আরো কত লোকের একটু আধটু উপকার করতে চেষ্টা করেছি; তাদের কাছ থেকে উল্টে অপকারই পেয়েছি। আর তোমাকে আমি বেত মেরেছিলাম তুফানি!

তুফানি শা হাত জোড় করিয়া বলিল—সে কথা আমি ভুলিনি হুজুর। আমি আপনার মহত্ত্ব মাহাত্ম্য মর্য্যাদা বুঝতে না পেরে নীচ কাজ করতে গিয়েছিলাম। আপনি গুরুমশায়ের মতন বেত মেরে আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি সেইদিন থেকে আপনার গোলাম হয়ে আছি।

রাখাল উঠিয়া তুফানিকে আলিঙ্গন করিয়া সজল নয়নে বলিল—তুমি আমার বিপদের বন্ধু, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর তুফানি।

তুফানি রাখালের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আমি আপনার দাস।

(৫৭)

পাটের সময়। সমস্ত নৌকা বোঝাই। নৌকা আর পাওয়া যায় না। তিন চার দিন এই কাঁদনটোলা ডিহিতে রাখাল ও মণিমালা পড়িয়া আছে। তুফানি শা সপরিবারে গুরুর মতো তাহাদের সেবা করিতেছে।

অনেক কষ্টে একখানা নৌকা মিলিল। রাখালেরা আজ যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। সদর হইতে ডিহির নায়েব-তহশীলদারের উপর পরোয়ানা লইয়া পাইক আসিল—মহারাজের বাবা ও শ্বশুর সপরিবারে বাড়ী যাইবেন, একখানা নৌকা যেন হাজির থাকে।

পাইক রাখাল ও মণিমালার জন্য নিযুক্ত নৌকা আটক করিল।

রাখাল ও মণিমালা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল—হঠাৎ বাবা ও শ্বশুর-মহাশয়দের সপরিবারে বাড়ী যাওয়াটা কি-রকম কি-রকম ঠেকিতেছে! তাহাদেরও কি আমাদের দশা হইল না কি!

তুফানি রাখালকে বলিল—আপনারা এই নৌকা নিয়ে

চলে যান ; এই নৌকা ফিরে এলে ওঁরা যাবেন, ততদিন আমার এখানেই একটু বিশ্রাম করবেন না হয়।

রাখাল বলিল—এতদিন রইলাম, আর একদিনের কথা বৈ ত নয়। বড় নৌকা ; একসঙ্গেই সকলে যাওয়া যাবে।

পরদিন বঙ্কবিহারী ও কাঙালী ডিহিতে নামিয়াই রাখালকে দেখিয়াই আঁৎকাইয়া উঠিল—অ্যাঁ! তুমি এখনো যাওনি ?

রাখাল হাসিয়া বলিল—না, একসঙ্গে এক নৌকোর যাত্রী হব বলে অপেক্ষা করছি।

বঙ্কবিহারী ও কাঙালী বলিল—না, ও নৌকোয় ত তোমাদের জায়গা হবে না।

রাখাল তেমনি হাসিমুখেই বলিল—জায়গা বেশ হবে। কাল ঐ নৌকো নিয়ে আমরা চলে গেলে আজকে এই ডিহিতে গড়াগড়ি দিতে হত। দয়া করে নৌকো নিয়ে যাইনি। আমরা আগে এসেছি, এ নৌকোয় আগে আমরা চড়ব। জায়গা না হয়, তোমরা পরে যেও।

রাখাল আর কাহারও দিকে না চাহিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া গিয়া নৌকায় উঠিল এবং মাঝিকে হুকুম করিল—নৌকা খুলে দাও।

গণপত মাঝি নৌকা খুলিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া রাখাল নৌকার গলুইএর উপর দাঁড়াইয়া হুকুমের স্বরে বলিল—গণপত, নৌকা খোলো।

এতদিন যাহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় করিয়া আসিয়াছে তাহার আদেশ রাজার ভয়েও অবহেলা করিতে গণপতের সাহস হইল না; সে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

বঙ্কবিহারী ও কাঙালী তাহা দেখিয়া বলিল—বড় নৌকো আছে, বড় নৌকো আছে, সকলেরই বেশ জায়গা হবে; সকলেরই কুলিয়ে যাবে, কতক্ষণেরই বা মামলা!...

কাত্যায়নী তাহাদের বিষদাঁত ভাঙিয়া বিদায় করিয়াছিল। কাঙালীর ইচ্ছা ছিল বঙ্কবিহারীকে বিদায় করিয়া সদরে সে-ই রাজার শ্বশুররূপে প্রধান হইয়া থাকিবে; এবং অন্দর হইতে চন্দনমণিকে বিদায় করিয়া কাত্যায়নীর মাকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কাঙালীর অস্ত্র হইয়াছিল কন্যা কাত্যায়নী। সে যখন-তখন বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণির আচরণ লক্ষ্য করিয়া কুবেরকে বলিত—ভালো আপদ হয়েছে বুড়োবুড়িগুলো! রাতদিন কেবল ঘুরছে। আমরা দুটিতে যে একটু নিরিবিলি আমোদ আহ্লাদ করব তার জো নেই।

হঠাৎ কথাটা কাত্যায়নীর রূপমুগ্ধ যৌবনমত্ত কুবেরের মনে লাগিল।—ঠিক ত! বুড়াবুড়িগুলা বড় জ্বালাইয়াছে! দাও ওদের খেদাইয়া!

কাত্যায়নীর হিসাবে একটু ভুল হইয়াছিল। সে নিজের বাবাকে বুড়ার দলে না ফেলিলেও কুবের ফেলিল। হুকুম দিল, বঙ্কবিহারী ও কাঙালীকে সপরিবারে বাড়ী চলিয়া

যাইতে হইবে—বাড়ীতে থাকিয়া তাহারা কিছু কিছু মাসহারা পাইবে। রাণী জগদ্ধাত্রীও বুড়ি হইয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট-কমিশনারের ভয় থাকাতে তিনি রেহাই পাইয়া গেলেন। কাত্যায়নী নিজের ফাঁদে নিজে জড়াইয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বঙ্কবিহারী ও কাঙালী রাজাগিরির খোলস পিছনে খুলিয়া-রাখিয়া আপনাদের কুটিরে লুকাইতে যাইতেছে; তাহাদের দম্ভ আস্ফালন সমস্ত সমাপ্ত; চন্দনমণি ত একেবারে চুপ।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এখন হঠাৎ চল্লেন যে?

কাঙালী বলিল—এখন রাজাবাহাদুর স্বয়ং লায়েক হয়েছেন, আর তাঁকে আগলাবার ত দরকার নেই। আমরা অনেক দিন বাড়ীঘর ছাড়া, তাই দেশে যাচ্ছি একবার।

বঙ্কবিহারী ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিল—যথার্থ, যথার্থ!

ষ্টেশনের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগিল। বঙ্কবিহারীদের সঙ্গে আহারের আয়োজন ছিল; আহার করিতে বসিয়া গেল। ভূপাল ও বিভা যে দুটি বালক বালিকা আছে, তাহাদেরও খাইতে ডাকিল না। এই বুনো জায়গায় প্রস্তুত খাদ্য কিনিতে পাওয়া যায় না; তুফানি-শার উপহার-দেওয়া সিধা রন্ধন করিবারও সময় নাই, ট্রেন

অল্পক্ষণ পরেই আসিবে। তুফানি-শার দেওয়া দুধ চিঁড়ে মুড়কি কলা দিয়া ফলারের জোগাড় করিবার জন্য রাখাল ডাঙায় নামিল।

উপরে উঠিতেই কে তাহাকে ডাকিল · রাখাল-বাবু মশায়, রাখাল-বাবু মশায়।

রাখাল ফিরিয়া দেখিল এক জায়গায় নৌকার পাল দিয়া ঘিরিয়া পাহাড়পুর-কলেজের শিক্ষকেরা বসিয়া আছেন, তাঁহারা পূজার ছুটির পর বাড়ী হইতে স্কুল-কলেজের কাজে সপরিবারে ফিরিয়া যাইতেছেন।

রাখাল নিকটে গেলে তাঁহারা বলিলেন—আপনি এখানে?

রাখাল লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—পাহাড়পুরের বাস উঠিয়ে দেশে চলেছি। কুবের ভায়া রাজা হয়েছেন, আর আমাকে দরকার নেই।

—কী অন্যায়! পাহাড়পুরের যিনি প্রাণ ছিলেন তাঁকে বিদায় করে দেওয়া!

রাখাল সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল—আমাকে তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, মাপ করবেন। আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি, ট্রেনের আর বিলম্ব নেই।

শিক্ষকেরা বলিয়া উঠিলেন—আমাদের পরিবারেরা রয়েছেন, রান্না প্রস্তুত। অনেক দিন রাজবাড়ীতে আপনারা

স্ত্রীপুরুষে যত্ন সমাদর করে আমাদের নিমন্ত্রণ খাইয়েছেন। আজ আমরা স্ত্রীপুরুষে এই মাঠের মাঝখানে আপনাদের নিমন্ত্রণ করছি।......ওগো তোমরা যাও, রাখাল-বাবুর স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে নৌকোতে আছেন, নামিয়ে নিয়ে এস।

অনাত্মীয়ের সহৃদয় যত্নে রাখাল ও মণিমালা মুগ্ধ হইয়া দেশে রওনা হইল।

(৫৮)

রাখাল ও মণিমালা আবার গোসাঁইগঞ্জে ফিরিয়া আসিল। সুখী হইল প্রসাদী ও বিন্দি।

বিন্দি মণিমালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া গাহিল—

"শুন লো রাজার ঝী,
তোরে কহিতে আসিয়াছি—
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি এ কাজ করিলি কি!"

মণিমালা হাসিয়া বলিল—মরণ আরকি! বুড়ো হয়ে মরতে চললেন তবু রঙ্গরস কম্‌ল না!

বিন্দি হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

"সুবল মিতা হে কি কহব সে সব রঙ্গ।
সে যে মুগধিনী, হেরিয়া মুখানি বাঢ়ল রস-তরঙ্গ!"

নারাণদাসী রাখাল ও মণিমালাকে দেখিয়া নথ নাড়িয়া বলিল—'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।' এমন হাড়-হাবাতে যে রাজার ঈশ্বর্য্যিতেও দৈন্যতা ঘুচল না।

রাজবাড়ী জ্বলিয়ে এখন এলেন আমাদের গণ্ডে পা দিতে। ঐ ত কাঙালীও এল রাজবাড়ী থেকে—কেমন গুছিয়ে এসেছে, বৌএর গায়ে বাউটি-সুট গহনা হয়েছে, মেয়েকে রাজরাণী করে দিলে, নিজেও বেশ দুপয়সা হাতে করে বাড়ী এসে বসল। আর এঁরা এলেন শুধু-হাতে নাচতে-নাচতে। ঝাঁটা মারো অমন ধাম্মিকপনায়, মুখে আগুন অমন পরের উপকারের। আপনি বাঁচলে তবে ত বাপের নাম!

গৌর বলিল—এল উৎপাত, এখন কেবল করবে পড় পড়। বাপ-ঠাকুদ্দারা আচ্ছা এক কুলীনের ভেজাল বাড়ীতে পুষেছিল!

নারাণদাসী নথ নাড়িয়া বৃন্দাবনকে বলিল—ফুলের সোহাগে ছোটার আদর! বুঝতাম দুপয়সা পাব-থোব নাড়ব-চাড়ব, পরের ঝক্কি ঘাড়ে নিতাম! ওদের ভিন্ন হয়ে নিজের সংসার পাততে বলো।

সুতরাং বৃন্দাবন রাখালকে বলিল—দেখ রাখাল, আমি বুড়ো হয়েছি, আর বেশীদিন বাঁচব না। আখেরে গৌরের সঙ্গে ভূপালের বনিবনাও নাও হতে পারে। আমরা থাকতে-থাকতেই তোমার ভিন্ন হওয়া ভালো। তোমায় আমি জায়গা দিচ্ছি—ফণে বাগদীর পড়াটায় তুমি বাড়ী কর। তখন যদি উদ্ধব-গোসাঁইএর বাড়ীটা কিনে রাখতে তাহলে আর কোনো গণ্ডগোল হত না।

রাখালকে তাহার দাদামশায় যখন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন তখন সে ক্ষুন্ন মনে পৃথক ঘরের পত্তন করিল। মাটির দেয়ালের উপর খড়ের চাল-দেওয়া দুখানি শোবার ঘর ও চেঁচা-বেড়ার উপর তালপাতায়-ছাওয়া একখানি রান্নাঘর। এই কুঁড়েঘর স্বতন্ত্র নিজের হইতেছে দেখিয়া মণিমালার আনন্দ আর ধরিতেছিল না।

ঘর শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবন হঠাৎ মারা গেলেন। নারাণদাসী যথারীতি চীৎকার করিয়া কান্নাকাটির পর পাড়ায়-পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল-- রাখাল অপ্পেয়ে এমনি ধাম্মিক যে রাজারা তাড়িয়ে দিয়ে তবে হাঁপ ছাড়লে; আর এতকাল যাদের খেয়ে মানুষ তাদের নাবালক ছেলেকে ফাঁকি দিয়ে জায়গা বেদখল করে বাড়ী হচ্ছে!

রাখাল নারাণদাসীকে বলিল—রাঙা-দিদিমা, গোসাঁই-দাদা আমাকে যে জায়গা দিয়ে গেছেন সেটা আমি অমনি চাইনে, তুমি আমায় বিক্রী কর।

কাঙালী এতকাল রাজসংসারে ছিল, রাজার শ্বশুর, ওরও রাজবুদ্ধি থাকা সম্ভব মনে করিয়া নারাণদাসী তাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

কাঙালী বলিল—এখন বেচে দাও, তারপর গৌর সাবালগ হলে নাবালকের বিষয় কারুর দানবিক্রীর অধিকার নেই বলে হয় জায়গা নয় ক্ষতিপূরণের আরো কিছু টাকা আদায় করে নেওয়া যাবে।

নারাণদাসী খুসী হইয়া টিপসই দিয়া জমী বিক্রয় করিল।

নারাণদাসী হাতে টাকা পাইয়া স্বামীশোক কিছু ভুলিতে পারিল। তখন সে বিষয়কর্ম্মে মন দিল। গৌরকে বলিল—তোর আর ইস্কুলে যেতে হবে না! সেবক-শিষ্য দেখে বেড়ালে তোর কড়ি খায় কে? তোর ত আর চাকরী করতে হবে না, তোর ত চরণে কড়ি!

গৌর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার সমবয়সী নিতাই শ্যাম কৃষ্ণ হলধর জগাই—তাহারা কেহই পড়ে না; গলায় তিনকণ্ঠী মালা আঁটিয়া তিলকসেবা করিয়া গয়লাবাড়ী কলুবাড়ী জেলেবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, কত দেশ দেখে, কত কি খাইয়া মজা করিয়া বেড়ায়—গয়লাবাড়ী ক্ষীর ছানা দই, কলুবাড়ী ছাঁকা তেলে ভাজা তালের বড়া, জেলেবাড়ী বাড়ের ভালো ভালো মাছ গুরুর ভোগে লাগে। তা ছাড়া যদি কোথাও অষ্টপ্রহর কি ধূলোট হয়, যদি কোথাও মচ্ছব লাগে, তবে মালসাভোগ পানোড়া ও মালপো খাইয়া জীবনের পরমায়ু অনেকখানি বাড়াইয়া লইতে পারা যায়। তাহারা গোসাঁইগোবিন্দ লোক, তাহারা প্রভুপাদ, তাহারা গুরুবংশ—তাহাদের শুধু পা থাকিলেই হইল, বিদ্যা সাধ্য জ্ঞান বুদ্ধি আর কিছুরই দরকার নাই।

রাখাল বলিল—রাঙা-দিদি, ওকে এর মধ্যে স্কুল ছাড়িও না।

নারাণদাসী বলিয়া উঠিল—তুমি তবে ওকে মাসে-মাসে মাসহারা দিও, বসে থাকলে ত পেট চলবে না।

—কেন, ছুটির সময়ে শিষ্যসেবক দেখতে ত পারবে। গুরুর যোগ্য হতে দাও আগে, তারপর ত গুরুগিরি করবে?

নারাণদাসী ফরকিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল —গোসাঁইগোবিন্দের ছেলে গুরু হয়েই জন্মায়!

নারাণদাসী ও গৌর বলিল—এ কেবল শত্রুতা সাধা।

তাহাতে কাঙালীও প্রাণ খুলিয়া খুব জোরে সায় দিল।

(৫৯)

জমির দাম দিতে ও ঘর করিতে রাখালের পুঁজি হাজার টাকার তোড়ার পেট অনেকখানি সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

তাহার উপর বাড়ীতে কিছু খাবার হইলেই রাখাল মণিমালাকে বলে—আমার ভাগটা ভাগ করে গৌরকে আর প্রসাদীদের দিয়ে এস, আমি ওদেরই পেষে মানুষ! —ইহাতে মণিমালাকে প্রত্যেক জিনিসই বেশী বেশী করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

কাঙালী গ্রামের মজলিসে খুব লম্বা চওড়া গল্প করে— রাজার বাড়ীতে কি-রকম নিখুঁতি-নাড়ু হইত, কি-রকম ঘিওর হইত, কি-রকম পোলাও হইত, কি-রকম কোপ্তা কোর্ম্মা কালিয়া হইত! তাহা একদিন খাইলে দশ দিন হাতে গন্ধ থাকিত—সে স্বাদ জন্মে ভুলিবার নহে।

গ্রামের লোকে অনেকে এসবের নামও শুনে নাই; অনেকে নাম জানে, খায় নাই। কাঙালী সকলকে চুপিচুপি টিপিয়া দ্যায়—রাখালের বৌ এসব খাসা তৈয়ার করিতে পারে, তোমরা রাখালকে ধর।

রাখালকে বলিবামাত্র সে আহ্লাদিত হইয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে—সে মনে করে লোককে খাওয়াইতে পারা সে ত ভাগ্যের কথা; সে কত লোকের খাইয়া আছে, একটুও যদি সে শোধ করিতে পারে। মণিমালা ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু স্বামীকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। এমনি করিয়া তাহার হাজার টাকার শেষ টাকাটিও শীঘ্রই খরচ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ভূপাল এণ্ট্রান্স পাশ করিল। পাহাড়পুরের স্কুলের শিক্ষকেরা মনে করিত ভূপাল এণ্ট্রান্সে কম্পিট করিয়া প্রথম দশজনের মধ্যে হইবে; কিন্তু খারাপ স্কুলে আসিয়া ও নানাবিধ বিক্ষেপে সে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইল। এখন কেমন করিয়া তাহার কলেজে পড়া চলিবে, তাহাদের সেই ভাবনা উপস্থিত।

মণিমালার পিসেমহাশয় শ্রীকৃষ্ণ মারা গিয়াছেন। কুবের এই সুযোগে তাঁহার তালুকটি দখল করিয়া লইয়াছে —রাজা ধনেশ্বর ভগ্নীপতি ও ভগ্নীকে ঐ তালুক মৌখিক কথায় দান করিয়াছিলেন, কোনো লেখাপড়া ছিল না। তথাপি মণিমালার পিসি হরসুন্দরী অনেক দিনের ভোগ-

দখলের স্বত্ব দেখাইয়া নালিশ করিবে বলিয়া যখন চোখ রাঙাইল, তখন কুবের তাঁহাকে মাসে পাঁচশত টাকা মাসহারা দিবে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। হরসুন্দরী তালুক খোয়াইয়া সেখানে থাকিতে লজ্জা বোধ করিলেন, তিনি পুত্রকন্যা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া আছেন।

মণিমালা বলিল—ভূপাল কলকাতায় পিসিমার বাড়ীতে গিয়ে থাকুক; সেখানে পিসিমা দুটি করে খেতে আর কলেজের মাইনেটা দিতে অস্বীকার করতে পারবে না।

এই খবরটা কাঙালী সাত-তাড়াতাড়ি মেয়েকে লিখিয়া পাঠাইল। কুবের হরসুন্দরীকে চিঠি লিখিল ভূপালকে ঘরে জায়গা দিলে তাঁহার মাসহারা বন্ধ হইবে।

বালক ভূপালকে একাকী কলিকাতায় পাঠাইতে গিয়া রাখাল ও মণিমালার অনেক চোখের জল পড়িল। রাধা-কান্তর চরণতুলসী তাহার পাথেয় দিয়া তাঁহাদের অন্ধের যষ্টিকে তাঁহারা বিদায় দিলেন।

ভূপাল অনেক খুঁজিয়া যখন হরসুন্দরীর বাসায় গিয়া গাড়ী হইতে নামিল তখন বেলা বারোটা; বালক ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সাড়া পাইয়াই বিধু দাসী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—মামাবাবু, মা বললেন, এ বাড়ীতে ত জায়গা নেই, এখানে তোমার থাকার সুবিধে হবে না, তুমি অন্য জায়গা দেখ।

ভূপাল কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—

আচ্ছা। শুধু আমার তোরঙ্গটা থাক, আমি কোথাও বাসা ঠিক করে এসে নিয়ে যাব।

বিধু উপর হইতে জানিয়া আসিয়া বলিল—হাঁ, তোরঙ্গটা দু-এক দিন থাকতে পারে।

শুষ্ক ম্লান মুখে ভূপাল বাহির হইয়া যাইতেছে, বিধু তাহার মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মামাবাবু, তোমার এখনো খাওয়া হয়নি? দাঁড়াও কিছু খেয়ে যাও।

ভূপাল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদিমা বললেন, না তুমি বলছ?

বিধু লজ্জিত হইয়া বলিল—মা কিছু বলেননি, আমিই বলছি।

—তবে থাক।—বলিয়া ভূপাল পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কলিকাতায় কখনো সে আসে নাই; কখনো সে একাকী কোথাও যায় নাই; কলিকাতার এই অট্টালিকার অরণ্যের মধ্যে মানুষের আগাছা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; গাড়ী ঘোড়া ট্রাম হিংস্র-জন্তুর মতো তাহাকে ভীত করিয়া তুলিল। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সে হেদোর পুষ্করিণীতে শ্রান্ত বিপন্ন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল তখন বেলা চারটে। সে অঞ্জলি ভরিয়া এক-পেট হেদোর জল খাইয়া ইট-বাঁধানো বেদীর উপর শুইয়া পড়িল; শুইবামাত্র ঘুম আসিয়া তাহার সকল দুঃখ ঢাকিয়া বসিল।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তাহাদের বাড়ীতে যাইবার একমাত্র উপায় ষ্টিমার; ষ্টিমার প্রত্যহ একবার সকালে ছাড়ে; আজ বাড়ী যাইবার আর কোনো উপায় নাই। তবে আজ রাতটা সে কোথায় থাকিবে? সে একবার মনে করিল পথে-পথে হাঁটিয়া রাত কাটাইয়া দিবে। কিন্তু ক্ষুধায় পা আর চলিতেছিল না। ভূপাল হেদো হইতে বাহির হইল কোনো দোকান হইতে কিছু কিনিয়া খাইবে।

খানিকদূর যাইতেই একটা বাড়ীর সম্মুখে দেখিল পাহাড়পুরের ইনাম সিং জমাদার বসিয়া আছে। একজন চেনা লোককে দেখিয়া ভূপাল সমুদ্রে যেন কূল পাইল। অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—জমাদার, তুমি এখানে?

—হাঁ বাবু। ইয়ে মোকান রাণীমা মোল লিয়েসে কি না, সেই হামি আসিয়েসে।

—এ বাড়ী দিদিমার? আমি তবে এখানে থাকব।

ইনাম-সিংএর মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—উ ত হোবে না বাবু, মহারাজের মানা আসে।

ভূপাল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—শুধু আজকের রাতটা থাকব জমাদার; কাল সূর্য্য ওঠবার আগেই চলে যাব। এই আমি বসলাম। ইচ্ছে হয় আমায় জোর করে বার করে দাও।

জমাদারের বোধ হয় একটু দয়া হইল, অথবা রাখাল-বাবুর ছেলেকে গলাধাক্কা দিবার সাহস তাহার হইল না, সে আর কিছু বলিল না।

ভূপাল পড়িবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরদিন ভোরে আবার বাড়ী ফিরিয়া গেল।

(৬০)

এই সময় এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক গোসাঁইগঞ্জে রাখালের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল—ভূপালের সঙ্গে তাহার কন্যাটির বিবাহ দিবার ইচ্ছা। তাহার নাম যোগেশ, বাড়ী বঙ্কবিহারীর দেশে, বঙ্কবিহারীর কাছে খবর পাইয়া আসিয়াছে।

রাখাল তাহাকে নিজের নিঃস্ব অবস্থার কথা বলিয়া হাঁকাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু যোগেশ নড়িল না। রাজার মেয়ে, রাজার জামাই, রাজার নাতি—তাহারা কখনো নিঃস্ব হইতে পারে? যোগেশ হাসিয়া বলিল—আমার কাছে গোপন করবার দরকার নেই মুখুয্যে মশায়; আমি আপনাদের সমস্ত ইতিহাসই জানি। বঙ্ক বলেছে যে আপনার স্ত্রীর কাছে অনেক দামী অলঙ্কার আছে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। আপনার আত্মীয় কাঙালী-বাবুও সেই কথাই আমাকে বলেছেন।

তাহার কথা অবিশ্বাস করিতেছে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া রাখাল বলিল—অত টাকা আছে তাই আমার মেয়ের

বিয়ে দিতে পারছি না, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারছি না!

যোগেশ মনে করিল রাখাল প্রকারান্তরে ছেলের বিবাহ দিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে পারে এবং ছেলেকে লেখাপড়া করাইবার ভারটা ছেলের শ্বশুরই লয় এইরূপ একটা গাছের তেলে মাছ ভাজিবার মতন দাঁও খুঁজিতেছে। যোগেশ বলিল—আমি মেয়ের গা-সাজানো গহনা, বরাভরণ, রূপোর দান আর হাজার টাকা নগদ দেবো; জামাইকে পড়ার খরচ বলে মাসে মাসে দশ টাকা করে দেবো। আপনি রাজি হোন।

ভূপালের বয়স অল্প ইত্যাদি অনেক রকম ওজর তুলিয়া রাখাল অসম্মতি জানাইল।

বিবাহের পর যতদিন না ভূপালের পড়া শেষ হয় ততদিন তাহার মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকিবে ইত্যাদি বলিয়া যোগেশ রাখালের সমস্ত ওজর খণ্ডন করিল।

বিভার বয়স বারো বৎসর হইয়াছিল। তখনো তাহার বিবাহ হয় নাই বলিয়া গ্রামের লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অতবড় সোমখ মেয়েকে ঘরে রাখিয়া বাপ-মার মুখে ভাতের গ্রাস কেমন করিয়া উঠে এবং রাত্রে কেমন করিয়া তাহাদের নিদ্রা হয় এই ভাবিতে-ভাবিতে গ্রামের লোকের আহার ও নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রাখালের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়

দেখিয়া ব্যথিত কাঙালী অত্যন্ত আত্মীয়তা দেখাইয়া গ্রামের সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছিল—আমাদেরই চাঁদা করে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে! গরীব দুঃখী প্রতিবেশীকে আমাদের সকলেরই ত দেখা দরকার।

যোগেশের অত্যন্ত আগ্রহে ও গ্রামের লোকের নিতান্ত নিগ্রহে বাধ্য হইয়া মণিমালা রাখালকে ভূপালের বিবাহ দিতে রাজি হইতে বলিল; ভূপালের বিবাহে যে টাকাটা পাওয়া যাইবে তাহা দিয়া কোনোমতে বিভার আইবড় নামটা ঘুচাইয়া গাঁয়ের লোকদের নিশ্চিন্ত করিতে পারা যাইবে।

ভূপালের সহিত যোগেশের মেয়ে সোহাগীর বিবাহ হইয়া গেল। বরযাত্রী হইয়া গিয়া আবার বঙ্কবিহারীর সহিত কাঙালীর শুভমিলন হইল।

কাঙালী বঙ্কবিহারীদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে বিভার বিবাহের সম্বন্ধ করিল। ছেলেটির কেউ কোথাও নাই; স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে; খুব কুলীন; নাম বিরিঞ্চি।

রাখাল ছেলেটিকে দেখিয়া ও বঙ্কবিহারী ও কাঙালীর মুখে তাহার গুণব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বিবাহ দিতে সম্মত হইল। ভূপাল অত্যন্ত আপত্তি তুলিল, কিন্তু বঙ্কবিহারী ও কাঙালী রাখালকে ভূপালের আপত্তি ছেলে-মানুষী বলিয়া মানিতে দিল না।

বিভার সহিত বিরিঞ্চির বিবাহ হইয়া গেল। ভূপালের বিবাহে যে টাকাগুলি রাখালের ঘরে আসিয়াছিল তাহা বিরিঞ্চির মারফতে বঙ্কবিহারী ও কাঙালী ভাগ করিয়া লইল। বিভার আইবড় নাম ঘুচিল; কিন্তু সে স্বামীর ঘর চক্ষে দেখিল না। বিরিঞ্চিও শ্বশুরবাড়ী-মুখো হইল না; শোনা গেল তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া জাজ্বল্যমান সংসার বর্ত্তমান আছে।

(৬১)

ভূপাল শ্বশুরের-দেওয়া দশটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া আবার কলিকাতায় পড়িতে গেল; ভরসা, আর দশ টাকার একটা শিক্ষকতা জুটাইয়া লইয়া সে কলিকাতার খরচ কোনোমতে চালাইয়া লইবে।

যাইবার সময় ভূপাল সোহাগীকে বিনয় করিয়া বলিয়া গেল—সোহাগ, আমার মা বাবা রইলেন; আমি বিদেশে চললাম; তুমি ওঁদের যত্ন সেবা কোরো।

তাই সোহাগী সকলের আগে ওঠে, সকলকে শোয়াইয়া তারপর শোয়। মণিমালার হাত হইতে কাড়িয়া কাজ করে; রাখাল ও মণিমালা যেন তাহার শিশু সন্তান, এমনি ভাবে তাহাদের সেবা যত্ন করে।

একদিন মণিমালার পা চাপিয়া দিতে-দিতে সোহাগী জিজ্ঞাসা করিল—মা, বাবা বলেন আপনার নাকি হীরের বালা আর মোতির মালা আছে?

মণিমালা হাসিয়া বলিল—না, মা! তোমার শাশুড়ী বড় গরীব। আর যদি থাকে ত সে তোমারই আছে!

সেদিন সেকথা তাহার তেমন বিশ্বাস হইল না, কিন্তু শীঘ্রই সোহাগীর বিশ্বাস হইল যে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী বাস্তবিকই বড় গরীব। সকল দিন বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না; যেদিন চড়ে সেদিনও ভরা-পেট খাইতে মিলে না। যেদিন কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয় সেইদিন মাত্র পেট ভরিয়া খাওয়া জোটে।

রাখাল চাকরী খুঁজিতেছিল। তাহার যে বিদ্যা তাহা কোনো বিদ্বৎসভা দ্বারা যাচাই হইয়া চিহ্নিত হয় নাই; যাহারা বিদ্বান চাকর চায় তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় টোল চতুষ্পাঠী বা নর্ম্যাল স্কুলের কোনো একটা উপাধি দেখিয়া বিচার করে। যে-সব জায়গায় উপাধির দরকার নাই, সে-সব জায়গায় পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা, অপর স্থানে কর্ম্মের প্রশংসাপত্র ইত্যাদি দেখাইবার আবশ্যক হয়। রাখালের এসব কিছুই নাই। সে এত বয়স পর্য্যন্ত কোথাও এমন কোনো কাজ করে নাই, কোনো বিশেষ কর্ম্মের এমন কোনো অভিজ্ঞতা ও তাহার জন্য প্রশংসা অর্জ্জন করে নাই, যাহার জোরে সে কাহারও অনুগ্রহ আদায় করিতে পারে। সুপারিশ করিবার মতন বন্ধু আত্মীয় মুরুব্বিরও নিতান্ত অভাব। সে মনে করিল একবার কাঙালীর শরণাপন্ন হইয়া দেখিবে।

কাঙালী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া রাজা জামাইএর নিকট হইতে পুনরাহ্বান অথবা মাসহারা পাইবার প্রত্যাশায় অনেক দিন রহিল। ক্রমে ক্রমে চিঠি লিখিয়া স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কুবেরের কোনো-রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সে সত্য-মিথ্যা নানা-রকম প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া ও চুরি-চামারির টাকা কিছু গচ্ছিত রাখিয়া নন্দনপুরের নটবর সামন্তের জমিদারী-সেরেস্তায় একটি মোটা মাইনের চাকরী জোগাড় করিয়াছিল।

রাখাল কাঙালীর কাছে নন্দনপুরে গেল। কাঙালী একেবারে তাড়াইয়া না দিয়া দয়া করিয়া রাখালকে তাহার অধীনে একটি মোহরেরের পদে বাহাল করিতে চাহিল—মাহিনা মাসিক পনর টাকা, তহরির মিলিবে পাঁচ টাকা আন্দাজ, এবং লইতে জানিলে উপরি পাওনা হইবে আরো টাকা কুড়ি। যে লোক এতকাল সিংহের কাছে শশকের ন্যায় ভয়ে সম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত, সে সুযোগ পাইয়া তাহার কাছে খুব একচোট মুরুব্বিআনা করিয়া লইল; এবং রাখালকে উপরি-পাওনার প্রলোভন দেখাইতেও কুণ্ঠা বোধ করিল না। রাখালের অত্যন্ত ঘৃণা হইলেও সে এই কুড়ি টাকার চাকরিই স্বীকার করিত, কিন্তু সে দেখিল তাহার ভাবী প্রভু তাহাকে প্রথম সাক্ষাতেই তুমি বলিয়া কথা কহিল—সে ব্যক্তি এমনই দাম্ভিক যে কোনো কর্ম-

চারীকে সে আপনি বলে না, কর্ম্মচারী বলিয়া তাহার যেন কোনো মর্য্যাদা নাই, সে যেন ভদ্রলোকের সম্মান পাইবার অনধিকারী। তাহার উপর সে দেখিল নটবর অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে কর্ম্মচারীদের অকথ্য গালাগালি দ্যায়, কাঙালীও তাহা হইতে বাদ পড়ে না। রাখাল অনাহারে মরিবে তবু এমন নীচতা স্বীকার করিবে না সঙ্কল্প করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

কুবের ও কাত্যায়নীর কাছে রাণী জগদ্ধাত্রী নিতান্ত ফাল্‌তো ও ভার হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তাহারা কথায় কথায় ঝগড়া বাধাইয়া তাঁহাকে অপমান করে ; তাই তিনি শ্বশুর-স্বামীর ভিটা পরকে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন—সেই বাড়ী কেনার পরই ভূপাল জোর করিয়া এক রাত্রির জন্য তাহাতে আশ্রয় লইয়াছিল। বঙ্কবিহারী সংবাদ পাইবা মাত্র ছুটাছুটি আসিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর অভিভাবক হইয়া বসিয়াছে, আর তাহার সঙ্গে আসিয়াছে তাহার সহধর্ম্মিণী চন্দনমণি। রাণী জগদ্ধাত্রীর মাসহারাটি আসিলেই বঙ্কবিহারী তাহার বারো আনা অংশ রাণী জগদ্ধাত্রীরই সংসার-খরচ চালাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে বলিয়া হস্তগত করে এবং বাকি চার আনা যাহা রাণী জগদ্ধাত্রী মনে করেন তাঁহার রহিল তাহা চন্দনমণির হেফাজতে থাকে। কুবেরের আদেশে ও বঙ্কবিহারীর হুকুমে এ বাড়ীতে রাখালের সম্পর্কীয় কাহারও প্রবেশ

নিষেধ। তাহার দিদিমার জন্য ভূপালের মন-কেমন করিত; রাণী জগদ্ধাত্রীও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন; কিন্তু তিনি রাণী হইয়াও বন্দিনী; চাকর দাসী দারোয়ানেরা তাঁহার চেয়ে কুবের বঙ্কবিহারী ও চন্দন-মণিকে বেশী ভয় করিত, কারণ তাহারাই বেতন দিবার না-দিবার মালিক, বাহাল বরতরফের কর্ত্তা, কাজে-কাজেই তাহারা তাহাদেরই হুকুম পালন করিত। ভূপাল মাঝে-মাঝে মলিন মুখে মলিন বেশে এই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে; যদি একবার তাহার দিদিমাকে সে দেখিতে পায়, যদি তাহার দিদিমা তাহাকে দেখিতে পাইয়া একবার নিকটে ডাকেন, যদি দিদিমার দয়ার দান কিছু-কিঞ্চিৎ মিলিয়া যায়। কোনো কোনো দিন রাণী জগদ্ধাত্রীর সহিত তাহার দেখা হইয়া যাইত, জগদ্ধাত্রী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন; কিন্তু ভূপালকে বাড়ীতে ডাকিতে তাঁহার সাহসে কুলাইত না। কোনো দিন চন্দনমণির শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া দশ বিশ টাকা গোপনে ঝুনকিয়া দাসী কি ঘিসু খানসামার হাত দিয়া ভূপালকে দিতেন, কখনো বা নিজেই জানলা গলাইয়া দুএকখানা নোট রাস্তায় ফেলিয়া দিতেন, আর ভূপাল চোরের মতন তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিত।

ভূপালের এই উঞ্ছবৃত্তি স্বীকার করিতে কষ্ট ও অপমান বোধ হইত খুবই। কিন্তু যখন সে মনে করিত যে

বাড়ীতে তাহার পিতা মাতা ভগিনী পত্নী অনাহারে রহিয়াছে—তাহার সূর্য্যের সমান তেজস্বী দৃপ্ত পিতা অন্ন-চিন্তায় মুষড়িয়া পড়িতেছেন, তাহার রাজকন্যা মাতা অন্নাভাবে শীর্ণ হইতেছেন, তাহার বড় আদরের বোনটি সকল সুখ সাধে বঞ্চিত হইয়া প্রাণেও মরিতে বসিয়াছে, তাহার সোহাগের সোহাগী বাপের বাড়ী যাইতে অস্বীকার করিয়া তাহাদের সঙ্গে সকল দুঃখ হাসিমুখে সহিতেছে—তখন ভূপালের কাছে কোনো কর্ম্মই অকরণীয় থাকিত না। সে রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট হইতে সামান্য যাহা পাইত পাইবামাত্রই বাবাকে পাঠাইয়া দিত।

ভূপাল টাকা পাঠাইলে দিন পনর কুড়ি একরকমে চলিত, মাসের বাকী দশ পনর দিন কষ্টের অন্ত থাকিত না। ভূপালের এই অতিকষ্টে সংগৃহীত অর্থ হইতে মণিমালা অনেক হিসাব করিয়া মাত্র প্রাণধারণের উপযোগী যে সামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিত তাহাই তাহার রন্ধনপটুতায় অল্প উপকরণেই বিচিত্র ও সুখাদ্য হইত। সুখাদ্য একলা খাওয়া রাখালের কোষ্ঠীতে লেখে নাই, গৌরকে তাহার মুখের গ্রাস হইতে ভাগ দিয়া আসিতে মণিমালাকে রাখাল অনুরোধ করিত—কারণ গৌরের বাবার খাইয়াই রাখালের দিদিমা, মা ও সে নিজে মানুষ! যদি রাখাল পূর্ব্বে টের পাইত যে আজ একটা সুখাদ্য কিছু প্রস্তুত হইবে, তবে বেড়াইতে বাহির হইয়া একজন দুজন লোককে ডাকিয়া

লইয়া সে বাড়ী ফিরিত—হয় তাহারা এককালে ভালো অবস্থায় থাকিয়া ভালো খাইত, এখন খাইতে পায় না, অথবা তাহাদের ঊর্দ্ধতন কোনো পুরুষে কেহ রাখালের দিদিমাকে কি মাকে কি রাখালকে একটি স্নেহের কথা বলিয়া আহা করিয়াছিল! এমনি করিয়া টানাটানির সংসারে অভাব বেশী করিয়া শীঘ্র ডাকিয়া আনা হইত—মণিমালা মনে মনে বিরক্ত হইলেও স্বামীকে কিছু বলিতে পারিত না। লোকে ভাবিত—উঃ! রাজার জামাই কিনা, রাখাল বেশ দু পয়সা হাতে করিয়া গুছাইয়া আসিয়া বসিয়াছে!

যেদিন আহার জুটিবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকিত না, সেদিন মণিমালা নারাণদাসীকে গিয়া বলিত—রাঙা-দিদি, আজকে বিভাকে দুটি খেতে দিও, আমাদের রান্না হতে দেরী হবে।

সে দেরী যে কত দেরী তাহা ভগবান ছাড়া আর কেহ বলিতে পারিত না।

মণিমালা বধূর জন্যও কাতর হইতেন, কিন্তু সোহাগী কিছুতেই পরের বাড়ী খাইতে যাইতে স্বীকার করিত না। সে হাসিমুখে খুব গিন্নির ধরণে বলিত—ঠাকুরঝি ছেলেমানুষ, ওকেই খাইয়ে আনুন মা। আমার উপোষ করা খুব অভ্যেস আছে—আমি বাবার ওপর রাগ করে কতদিন উপোষ করতাম।

মণিমালা ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত—এই হাসির প্রতিমা স্নেহের পুতুল এ কি কখনো রাগ করিতে জানে ?

মণিমালা চোখ মুছিয়া স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলিত—মা, তুমি দুধের মেয়ে, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন কষ্ট পাচ্ছ ? তোমার বাপকে চিঠি লিখি, তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও।

একথায় সোহাগীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। তাহার স্বামী যে তাহাকে বলিয়াছে,—সে কলেজে বসিয়া থাকে, কিন্তু শিক্ষকের পড়ানো সে শুনিতে পায় না, সে ভাবে শুধু তাহাকেই ; ভূপাল যে তাহাকে বলিয়াছে যে সে যদি পুতুল হইত তবে তাহাকে বুক-পকেটে লুকাইয়া লইয়া সে কলেজে যাইত, তাহাকে যদি পুরুষের ছদ্মবেশে কলেজে ভর্ত্তি করিতে পারিত তবে এক দণ্ড বিচ্ছেদের দুঃখ সহিতে হইত না ; তাহার স্বামী তাহাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে কলেজ পালাইয়া বাড়ীতে ছুটিয়া আসে, এবং এখন কিসের ছুটি জিজ্ঞাসা করিলে বাবাকে যা-হোক একটা সামান্য কোনো পরবের নাম করিয়া প্রবঞ্চনা করে, সে যে তাহারই জন্য ; এমন ছুট্‌কো ছুটি একদিনেই ফুরাইয়া যায়, পরদিন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার স্বামীর মন চাহে না, সে অসুখের ভান করিয়া বাড়ীতে থাকে, আর কাজেই সমস্তদিন উপবাস করিয়া কাটাইতে হয়, সেও যে শুধু তাহারই জন্য ; সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া

তাহার স্বামী যে তাহার খাবারের অধিকাংশ পাতে প্রসাদ রাখিয়া উঠিয়া যায়; এ-সব কি সোহাগী বুঝে না? এমন স্বামীকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? শনিবারের ষ্টিমারের বাঁশী যে তাহাকে বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশীর মতন উতলা করিয়া তোলে—খাইতে বসিয়া বাঁশী শুনিলে আনন্দে তাহার আর খাওয়া হয় না, রন্ধন চড়াইয়া বাঁশী শুনিলে সে আর রাঁধিতে পারে না। মা ত এসব জানেন, তবে তাহাকে বাপের বাড়ী যাইতে বলিতেছেন কেমন করিয়া? সে সজল চোখে মিনতি করিয়া বলে—মা, বাবা আমাকে ত আপনাদেরই দিয়ে দিয়েছেন; আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না!

মণিমালা তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলে—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমাকে কি আমি তাড়াতে পারি মা!

যেদিন সামন্য দুটিখানি চালের জোগাড় হয়, সেদিন সোহাগী হাসিমুখে বলে—মা, আজকে ফেন ফেলে দেবেন না; নুন দিয়ে ফেন খেতে বেশ লাগে মা! আমি বাপের বাড়ীতে খেতাম!

সেদিনকার ফেন মণিমালার অশ্রুতেই লবণাক্ত হইত।

সোহাগীর পরিবার কাপড় নাই। সে বাপের দেওয়া তোলা ভালো কাপড়গুলি আটপৌরে করিয়াছে। প্রসাদী বলিল—মা সোহাগী, অমন ভালো কাপড়গুলো পরে পুরোণো করছ কেন মা?

সোহাগী হাসিয়া বলিল—পরে' নি বড়মা, কোন্‌দিন আবার মরে যাব।

এমনি করিয়া নিজেদের দারুণ দারিদ্র্যকে ঐশ্বর্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখালের সংসার চলিতেছিল।

(৬২)

একদিন দুপ্রহরে ঠাকুরবাড়ীর তিনকড়ি-পূজারী দুই থালা রাধাকান্তর প্রসাদ আনিয়া মণিমালার ঘরের পিঁড়ায় দুম করিয়া নামাইল। মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—এ কার প্রসাদ তিনকড়ি?

—পেসাদী-মাসীর আর বিন্দি-বষ্টমীর। ঠাকুরবাড়ীতে পেসাদী-মাসী রাঁধুনী আর বিন্দি পাটকরণী হয়েছে যে।

—তা তাদের প্রসাদ আমার বাড়ীতে কেন?

—তারা এখানেই দিতে বলেছে।—বলিয়া তিনকড়ি চলিয়া গেল।

একটু পরেই প্রসাদী ও বিন্দি আসিল।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—তোদের আজ পেসাদ এল যে?

বিন্দি হাসিয়া বলিল—আমরা যে ঠাকুরের সঙ্গে স্বয়ম্বরা হয়েছি বৌ! আমি বৃন্দে, আমার সঙ্গে রাধাকান্তর ত অনেক কালের ভাব—সবাই সেটা নিয়ে কম কানাঘুষো করে কি? আর উনি প্রসাদী; উনিও রাধাকান্তরই!—

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥

মণিমালা আজ আর হাসিতে পারিল না। বলিল—তোমাদের পেসাদ আমার বাড়ীতে দিয়ে গেল কেন?

বিন্দি বলিল—আমারও মা মরে গেছে, পেসাদীরও মা মাপ গেল; আমরা দুটোতে এক-একটা ভিটে আগলে পড়ে থাকি, লোকের প্রাণে তা সয় না, কত কি বলে। তাই আমরা ঠিক করেছি আজ থেকে আমরা তোমাদেরই, এই বাড়ীই আমাদের বাড়ী। আমরা অনাথ, আমাদের একটু আশ্রয় দিতে হবে বৌ।—

কোন্ বিধি সিরজিল স্রোতের শেয়লি।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
তুমি মোরে যদি প্রভু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

মণিমালার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। সে বুঝিল যে, যাহা সে এত যত্নে গ্রামের লোকের নিকট লুকাইয়া চলিতেছিল, এই দুটি ব্যথার ব্যথীর কাছে সে তাহা গোপন রাখিতে পারে নাই। ইহারা দুজনে পরামর্শ করিয়া ঠাকুরের সেবার কাজ স্বীকার করিয়াছে শুধু তাহাদের অন্নকষ্ট মোচন করিবার জন্য। প্রত্যহ ইহাদের দুজনের যে "বাড়া" আসিবে

তাহাতে তিন চার জনের খাওয়া অনায়াসে চলিয়া যাইবে।

বিন্দি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌ, তোর কি চোখের জল ফুরোয় না? তুই কতই কাঁদতে পারিস্!—

ওরে, চোখের জল কি সস্তা?

খাঁটি সোনা বিলিয়ে দিলি যেন রাং কি দস্তা!

মণিমালাকে আজ আর কিছুতেই হাসাইতে না পারিয়া বিন্দিও কাঁদিতে বসিয়া গেল। প্রসাদী ত আগে হইতেই চোখ মুছিতেছিল।

(৬৩)

নারাণদাসীকে আসিতে দেখিয়া মুক্তামালা তাড়াতাড়ি ঘরে উঠিয়া গিয়া চোখ মুছিল।

নারাণদাসী আসিয়া মণিমালাকে ডাকিয়া বলিল—ওগো ও নাতবৌ, শুনেছ? তোমার মামাশ্বশুরের যে বিয়ে!

মণিমালা মুখে হাসি টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল—কোথায় রাঙা-দিদি, কবে ঠিক করলে?

—রাইপুরের অক্রুর-গোসাঁই বড় ধরে বসেছে; এই মাসেই বিয়ে হবে। বিয়েটি কিন্তু তোমাদের দিয়ে দিতে হবে বাছা! ওর বাপ নেই, আমি কোত্থেকে খরচ-পত্তর করব? তোমাদেরই ত এ কর্ত্তব্য!

—আর কিছুদিন অপেক্ষা কর রাঙা-দিদি। ভূপাল আমার মানুষ হোক, রোজগার করুক, আমাদের তখন কিছু বলতে হবে না।

—ভূপাল গৌরের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে। তোমরা গৌরের বিয়ে দিয়ে দাও।

কথাটা রাখালের কানে গেল। রাখাল সেখানে আসিয়া বলিল—গৌরকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলাম তাতে তুমি বাধা দিলে; স্কুল ছাড়াতে বারণ করলাম, শুনলে না; বিয়ের সব নিজে ঠিক করলে—আমরা জানলাম না কার মেয়ে, কেমন মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে দিয়ে দিতে হবে আমাদের। কেন? আমাদের গরজ?

শুকনা খড়ে আগুন লাগার মতন নারাণদাসী জলিয়া উঠিল—গরজ নয়ই বা কেন? সাতগুষ্টিতে খেয়ে গতর বাড়িয়েছেন, বুকের ওপর চেপে বাস করছেন, এততেও গরজ হয় না? আচ্ছা, দেখে নেবো গরজ হয় কি না!

নারাণদাসী ফরফর করিয়া রাখালের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়া আপনার বাড়ীর রকে বসিয়া তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

কান্না শুনিয়া গৌর ছুটাছুটি বাড়ী আসিয়া যখন মায়ের কাছে শুনিল যে তাহারই বিবাহের নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল এই অপরাধে রাখাল তাহার মাকে তাহাদেরই দেওয়া জায়গা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, প্রজা হইয়া জমি-দারকে

অপমান করিয়াছে, এবং হয় রাখালের নিকট হইতে ঐ জমির মূল্য লওয়া নয়ত চালা কাটিয়া তাহাকে উদ্বাস্তু করা গৌরের মাতৃভক্তি থাকিলে একান্ত কর্ত্তব্য, তখন গৌর সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া রাখালকে অধার্ম্মিক চোর হিংসুক শত্রু বলিয়া গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল।

রাখাল ব্যথিত হইয়া বলিল—গৌর, তোমায় যে আমি মুখের গ্রাস খাইয়ে এত বড় করেছি! তুমি আমাকে গালাগালি দিয়ো না!

গৌর রাখালের প্রদত্ত খাবারকে এমন একটা দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিল, এবং রাখালের খাবারে সে এমন একটা কথার আরোপ করিল যে রাখাল স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তাহার পর গৌর তর্জ্জন করিয়া বলিল—হয় জমির দাম দেওয়া হোক, নয়ত সে জুতা মারিয়া তাহার জমি হইতে চালা কাটিয়া উঠাইয়া দিবে।

রাখাল ব্যথিত স্বরে বলিল—জুতো মারতে চাইলে যখন, তখন মারাই হল। কিন্তু গৌর, পায়ের দিকে চেয়ে দেখ, ও জুতো আমারই দেওয়া! জমির দাম চাচ্ছ? তোমার বাবা আমাকে অমনি বাস করতে দিয়েছিলেন; কারণ, তোমার বাবা আমার মায়ের মামা; তারপর, তোমার মা আপত্তি করাতে তাঁকে আমি দাম দিয়েছি, তাঁর টিপসই-করা দলিল আছে। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা

করলেই জানতে পারতে। আর তুমিই কি সেসব জানো না?—তুমি ত আর কচি খোকাটি নও।

—ওসব ফাঁকির কথা আমি শুনিনে। মাকে টাকা দিয়েছ, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করতে হয় কোরো। আমি তখন নাবালক ছিলাম; আমার বিষয় বিক্রীর অধিকার মায়ের ছিল না। আমি এখন সাবালক হয়েছি, আমার জমির দাম আমি চাই!

রাখাল ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়া বলিল—দাম দেবার সঙ্গতি আমার এখন নেই। ভূপাল তোমার ঋণ শোধ করবে। আর যদি ততদিন স্বর না সয়, তোমার যা খুসী করতে পার।

মণিমালার গহনা সব পেটের দায়ে কতক বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, কতক বন্ধক পড়িয়াছিল। কেবল পুঁজি ছিল সোহাগীর আর বিভার গহনা। প্রাণ থাকিতে তাহাদের নিরাভরণ করিতে তাহারা পারিবে না বলিয়াই রাখাল ও মণিমালা সেগুলি এতদিন ছোঁয় নাই। আজ সোহাগী আপনার গা হইতে গহনাগুলি খুলিয়া শ্বশুরের সামনে রাখিয়া বলিল—বাবা, এই দিয়ে ওদের ধার শোধ করে ফেলুন।

রাখাল ও মণিমালা সজল চক্ষে সোহাগীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা কিছু বলিবার আগেই গৌর তাড়াতাড়ি গহনাগুলি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে-

যাইতে বলিয়া গেল—মায়ের দস্তখতি দলিলটা দিও, কাল আমিও তাতে সই করে দেবো।

গৌর জমির দ্বিগুণ দামের গহনা লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়াও রাখাল বা মণিমালা গৌরকে কিছু বলিতে পারিল না। তাহারা সোহাগীর চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া নীরবে চোখের জল মুছিল।

প্রসাদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বাড়ী হইতে একটা বাক্স হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সোহাগীকে ডাকিয়া বলিল—বৌমা শোনো।

সোহাগী কৌতূহলী হইয়া তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলিল—কি বড়মা ?

প্রসাদী বাক্স খুলিয়া আপনার সমস্ত অলঙ্কার দিয়া সোহাগীকে সাজাইয়া মুখচুম্বন করিল। সোহাগী লজ্জিত হইয়া প্রসাদীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—এ কি করছ বড়মা ?

প্রসাদী কৃতার্থতার সন্তোষ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিমুখে বলিল—আমার বৌমাকে আমি যতুক দিলাম। বাক্সর মধ্যে পড়ে পচছিল, আজ সোনার অঙ্গে উঠে সোনা সার্থক হল।

বিন্দি বলিল—এস বৌমা, বাকীটুকু আমি সাজিয়ে দি।

বিন্দি সোহাগীর সিঁথিতে সিঁদুর ও পায়ে আলতার

হাসি উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল—এইটুকু নিয়ে তুমি সুখে থেকো!

দুঃখে সুখে আনন্দে রাখাল ও মণিমালা কাঁদিল হাসিল।

(৬৪)

ছেলে যখন রুখিয়া রাখালের সহিত ঝগড়া করিতে গেল তখন ব্যাপার কতদূর গড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য নারাণদাসী পাঁচিলে মই লাগাইয়া মইয়ের উপরে দাঁড়াইয়া পাঁচিলের উপর শুধু চোখ দুটি তুলিয়া রাখালের বাড়ীতে আড়ি পাতিয়া দেখিতেছিল। সে যখন দেখিল তাহার পুত্র সোহাগীকে একেবারে নিরাভরণ করিয়া বিজয়ীর যোগ্য লুণ্ঠন লইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন আনন্দের আতিশয্যে তাহার পা এমন কাঁপিতেছিল যে মইয়ের উপরে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। নারাণদাসী নামিতে যাইতেছে এমন সময় দেখিল প্রসাদী একটা বাক্স লইয়া আসিল। আর তাহার নামা হইল না। কৌতূহলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন দেখিল সর্ব্বনাশী প্রসাদী নিজের হাতে এক-একখানি করিয়া সমস্ত গহনা সোহাগীকে পরাইয়া দিল, তখন এক-একখানি গহনার স্বর্ণকান্তি তপ্ত আঙারের ন্যায় নারাণদাসীর অন্তর পুড়াইয়া তুলিতে লাগিল, একএক-খানি গহনার রজত-আভা প্রলয়সূর্য্যের ন্যায় তাহার দৃষ্টি ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। সে রাখালের লাভের কপাল

দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া তাহাদের উপর ত রাগ করিলই, প্রসাদী ও বিন্দির উপরও তাহার চিরকালের রাগ মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল। সে মনে করিল—প্রসাদী আর বিন্দির রাখালের উপর এত যে টান, তাহারা সর্ব্বস্বই যে ইহাদের ঢালিয়া দিতেছে, তাহার নিশ্চয় একটা মস্ত-রকম হেতু আছে। পাড়ায় সেই হেতুটা প্রচার করিবার প্রচুর আনন্দে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নারাণদাসী মই হইতে নামিয়া পড়িল।

গৌর বাড়ী আসিয়া গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকিল।

নারাণদাসী বলিল—গৌর, কি আনলি দেখি।

গৌর বিস্ময়প্রকাশ করিয়া বলিল—কি আবার আনব?

—আ মর অপ্পেয়ে, আমি কি দেখিনি? সোহাগীর গায়ের গয়না যে নিয়ে এলি।

গৌর দেখিল তাহার মা জ্যোতিষ জানে, নতুবা অমন চুপে চুপে অত সহজে যে ব্যাপারটা হইয়া গেল তাহার সন্ধান মা জানিল কিরূপে? গৌর বলিল—নিয়ে এলাম ত নিয়ে এলাম, তাতে তোমার কি? ও আমি তোমায় দেবো না।

—আরে মোলো, আমার বুদ্ধিতেই ত পেলি!

—ও আমার জমির দাম, আমি নেবো। তুমি ত একবার নিয়েছ।

এমনি করিয়া গহনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে গিয়া মায়ে পোয়ে এককথা দুকথায় মহা কলহ বাধিয়া গেল। অবশেষে

গৌর এক বাঁশ লইয়া মাকে তাড়া করিয়া বলিল—বেরোও আমার বাড়ী থেকে। এ সব আমার!

"সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো!" নারাণদাসী বাড়ী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

নারাণদাসী সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় রাখালের উপর প্রসাদী ও বিন্দির টানের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মনটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া যখন রাত্রি একপ্রহরের সময় বাড়ী ফিরিল তখন দেখিল সদর দরজায় চাবি। সন্ধান লইয়া জানিল অক্রূর গোসাঁই আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে গৌর গহনা বিক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছে, কলিকাতা হইতে রাইপুরে বিবাহ করিতে যাইবে।

তখন নারাণদাসী কাঁদিয়া আসিয়া রাখালের বাড়ীতে পড়িল—পেটের ছেলে আমার এমন খোয়ার করলে! আমায় একবার বললে-না কইলে-না, অমনি একলা বিয়ে করতে চলে গেল! আমি এখন আথান্তরে পড়েছি, আমি কোথায় দাঁড়াই রাখাল?

রাখাল বলিল—রাঙা-দিদি, এ বাড়ী তোমারই। তুমি এখানেই থাক।

মণিমালা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া গম্ভীর হইয়া শুধু বলিল—এস রাঙা-দিদি।

নারাণদাসী বলিল—লক্ষ্মীশ্বর হয়ে বাপ-বেটায় বেঁচে থাকো। তোমরা শাশুড়ী-বৌএ পাকা-চুলে সিঁদুর পর,

হাতের লোহা ক্ষয় যাক! তোমাদের ভরসাই ত আমি বেশী করি।

ঘরের মধ্যে সোহাগী হাসিয়া চুপিচুপি বিভাকে বলিল—ঝিমা গালও দিতে যেমন, আশীর্ব্বাদ করতেও তেমন—একেবারে কল্পতরু!

প্রসাদী বলিল—মুখের কথা বৈ ত নয়, পয়সা ত লাগে না!

বিভা বলিল—বাবার দয়াতেই ত খেয়েছে। আমরা হলে ঝাঁটা মেরে দিতাম খেদিয়ে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হত!

বিন্দি গুনগুন করিয়া গাহিল—

পায়েও পড়ি কামড় মারি আমি যে ডালকুত্তা।
নাই দিওনা বাড়বে বড়াই, পত্তি আমার জুত্তা!

(৬৫)

রাখালের পরিবার বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং তাহাতে খরচ বাড়িতেছে আয় কমিতেছে। ভূপাল এখন এম-এ ও ল পড়ে; তাহার খরচ সংগ্রহ করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সোহাগীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। সোহাগীর বাবা মারা গিয়াছে; তাহার কাছে যে সামান্ত কিছু পাওয়া যাইত তাহা বন্ধ হইয়াছে। গৌর বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে এক মাস-শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সেই গৌরের ঘরকন্নার কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছে,

নারাণদাসী সে-বাড়ীতে আর প্রবেশের অধিকার পায় নাই। গৌরকে নারাণদাসী যখন জিজ্ঞাসা করিল তাহার দিন চলিবে কেমন করিয়া, তখন গৌর মাকে বৃন্দাবনবাসের সৎপরামর্শ দিল। কাজেই নারাণদাসী এখন রাখালেরই পোষ্যের মধ্যে।

কাঙালী জমিদারী-সেরেস্তার চাকরী করিতে-করিতে অনেক টাকা চুরি করিয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছে। সে একদিন রাখালকে বলিল—রাখাল, তুমি বই লেখ, আমি নিজের খরচে ছেপে প্রকাশ করব; তার পর যা লাভ হবে তোমার আমার অদ্ধা-অদ্ধি।

রাখাল যেন অকূল সমুদ্রে অবলম্বন পাইল। কাঙালী যে তাহাকে দুঃখের সময় সাহায্য করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহার জন্য রাখালের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। রাখালের অনেকগুলি বই লেখা ছিল; কাঙালীকে সেইগুলি দিল।

কাঙালী সেগুলি ছাপাইয়া টাইটেল-পেজের প্রুফ দেখাইয়া রাখালকে বলিল—দেখ ভাই রাখাল, আমার ইচ্ছে যে আমারও নামটা লেখকের স্থানে দিয়ে দি—তা হলে আর পৃথক লেখাপড়া কিছু করতে হবে না, যা লাভ হবে তা আমরা পুরুষানুক্রমে অদ্ধা-অদ্ধি করে পাব, আমাদের ছেলেপিলেদেরও কোনো গণ্ডগোল হবে না।

রাখাল লজ্জায় পড়িয়া অস্বীকার করিতে পারিল না;

কাঙালী বইএর প্রুফ পর্য্যন্ত না দেখিয়াও লেখকের নাম লইতে চাহিতেছে দেখিয়া তাহার যেমন একটু বিরক্তি হইতেছিল, তেমনি কাঙালী নিজে উপযাচক হইয়া তাহার লেখা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া তাহার খ্যাতি-বিস্তারের ও আয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে এই কৃতজ্ঞতাও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রাখাল ও কাঙালী দুজনের নামেই বই বাহির হইল।

বই প্রকাশ করিয়া কাঙালী বিজ্ঞাপনে লেখকের নামের স্থানে শুধু নিজের নামই প্রচার করিতে লাগিল, রাখালের নাম চাপা পড়িয়া গেল।

রাখাল মনে করিল, যাক, নাম লইয়া কি করিব, আমার বই ত দপ্তরে বাঁধা বন্ধই ছিল, কাঙালীই উদ্যোগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আমার কিছু টাকা পাইলেই হইল।

দু-তিনখানা বইএর প্রথম সংস্করণ চট করিয়া বিক্রয়ও হইয়া গেল। রাখাল কাঙালীকে বলিল—কাঙালী-দা, হিসেবটা একবার দেখলে হত না ?

কাঙালী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তোমায় কি আমি টাকা দিইনি ?

রাখাল তুচ্ছ টাকা লইয়া হিসাব-নিকাশ করিতে চাহিতেছে এই চিন্তাতে লজ্জিত হইয়া বলিল—কৈ, বোধ হয় দাওনি।

—তুমি ভালো করে মনে করে দেখো ত ?

— না, আমার ভালো-রকমই মনে আছে।

—তা হবে তবে। নানান ঝঞ্ঝাটে কাকে কি দিচ্ছি না-দিচ্ছি মনে থাকে না। আচ্ছা, একটু ফুরসৎ পেলেই আমার খাতা-পত্তর দেখবো।

রাখাল সেই সুসময় আসিবার প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে।

এইসময় হৃদ্‌রোগে হঠাৎ রাণী জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু হইল। অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি দেশে প্রস্থান করিল। কুবের আসিয়া গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় কলিকাতার বাড়ীটি দখল করিয়া বসিল। ভূপাল কালেভদ্রে যে দশ বিশ টাকা দিদিমার নিকট হইতে পাইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

দুঃখ বিপদ একলা আসে না। অনাহারে পরিশ্রমে ম্যালেরিয়ায় সোহাগীর শরীর জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; মাতৃত্বের গুরু বেদনা সে সহ্য করিতে পারিল না, সূতিকা-গৃহে সে সজল চক্ষে "মা, একটিবার ওকে দেখতে পেলাম না" বলিয়া মণিমালার কোলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

বিভা বিধবার মতনই ছিল, এবার সে সত্যসত্যই বিধবা হইল।

ভূপালের আর পড়া চলিল না। তাহার চাকরী না করিলেই নয়।

সে বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাইবে, সেই চিঠির মাশুল দিবার পর্য্যন্ত সঙ্গতি নাই। তাহার পঞ্জরের ন্যায় বুকের নিতান্ত নিকটের প্রসাদীর-দেওয়া সোহাগীর গহনা একএকখানি করিয়া হস্তান্তর হইয়া যাইতে লাগিল।

রাখাল বারবার তাগাদা করিয়া কাঙালীকে জেদ করিতে লাগিল তাহার বইএর হিসাব মিটাইয়া দিতে হইবে।

কাঙালী বলিল—এই যে ভাই, হিসেব ঠিক করে রেখেছি। প্রত্যেক বই হাজার কপি করে ছাপা হয়েছিল। তা থেকে আমাদের গল্পের বইখানার তুমি নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের দিয়েছ পঞ্চাশ, আমি দিয়েছি সাতষট্টি; দুশো তেরোখানা বই দপ্তরীর বাড়ীতে উইএ খেয়েছে, দপ্তরী গরিব-মানুষ কাঁদা-কাটা করছে, ওটা আমাদেরই লোকসান গেল; বিক্রী হয়েছে বাকি ৬৭০, একটাকা হিসেবে ৬৭০ টাকা। তা থেকে বুকসেলার্স কমিশন শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে ১৬৭৷৷০ আর প্রকাশকের প্রাপ্য অর্দ্ধেক ৩৩৫ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ১৬৭৷৷০ টাকা; আমরা দুজন গ্রন্থকার সেই টাকাটা অদ্ধা-অদ্ধি পাব—তা হলে তোমার পাওনা হল ৮৩৸০। আর আমাদের উপন্যাসখানারও ঐ-রকমই তোমার পাওনা হবে। স্কুলের বইখানার ৪০০ কপি বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; সেটা আর-একবার দেখে যদি

নাই পাওয়া যায় ঐ ৬০০ বই বিক্রী ধরেই হিসেব করতে হবে। শিগগিরই করে দেবো। তোমার যদি টাকার বিশেষ দরকার থাকে আগাম কিছু নিতে পার।

এই কথাতেই রাখালের মনের সমস্ত বিরক্তি দূর হইয়া গেল। কাঙালী যে শাঁখের করাতের মতন যাইতে আসিতে তাহার পাওনা কাটিয়া কমাইয়া দিল, নষ্ট বইএর জন্য যে প্রকাশকই দায়ী এবং কাঙালী যে প্রকাশক ও গ্রন্থকার দুই রূপে দুবার নিজে লইল, এসব রাখাল আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। একজন ভদ্রলোককে মুখের উপর চোর প্রবঞ্চক বা জুয়াচোর কি কখনো সে বলিতে পারে? তাহার উপর এই দারুণ অভাবের সময় কাঙালী তাহাকে যাহা হাতে তুলিয়া দিল তাহাই পরম উপকার করিল মনে করিয়া রাখালের মন কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই কটি টাকায় আর কদিন চলে? আবার অভাবের বিভীষিকায় রাখাল মুষড়িয়া পড়িল।

বার বার আঘাতে রাখালের বুক ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজে যে কি-রকম বঞ্চিত হইয়াছে ও ঠকিয়াছে, তাহা সে এখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল। সে নিজের অক্ষমতায় ও নিষ্ফলতায় স্ত্রীপুত্রকন্যার নিকট কুন্ঠিত লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাহার উপর পরের মেয়ে সোহাগীকে যখন হাসিমুখে সকল দুঃখ

সহ্য করিতে দেখিত তখন রাখালের অন্তর শতধা বিদীর্ণ হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিত। মণিমালা রাজার মেয়ে, তাহার হাতে পড়িয়া উহার কি দুর্দ্দশা! প্রসাদীর জীবনটাকেও ব্যর্থ করিল ত সে-ই। দুধের মেয়ে বিভা, তাহাকে চিরদুঃখিনী করিল সে-ই। ইহার উপর লোকের অকৃতজ্ঞতা, নারাণদাসীর ও গৌরের কুব্যবহার, গ্রামের লোকের কাছে হেয় হইবার আশঙ্কা, সর্ব্বোপরি দারুণ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন রাখালের হৃদয় একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর যখন সোহাগী তাহাদের বুকে শেল হানিয়া একবুক অতৃপ্তি লইয়া মরিয়া গেল, বিভা বিধবা হইল, শেষ আশ্রয় ও নিরাশার সম্বল রাণী জগদ্ধাত্রীও মরিয়া গেলেন, তখন সে-দুঃখ রাখালের মতন অতিবলিষ্ঠ তেজস্বী লোকের পক্ষেও অতিরিক্ত হইয়া উঠিল। বালক ভূপালের লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেল, সে কোথায় কেমন করিয়া একটু আশ্রয় একটু অবলম্বন পাইবে তাহা ভাবিয়াও নির্ণয় করিবার কোনো উপায় দেখা যাইতেছিল না। রাখাল আর হাসে না, রাখাল কাঁদে না, রাখাল কাহারও সহিত কথা বলে না,—ভোর হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘরের কোণে বসিয়া কেবল পূজা পাঠ ধ্যান জপ করে; পাঁজি আর জ্যোতিষের বই লইয়া অদৃষ্টের সন্ধান করে; আর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া শুধু ভাবে আর ভাবে।

আহার পাইবার সম্ভাবনা যত কম হইয়া উঠিতেছিল, রাখালের পূজা আরাধনা ভগবানে নির্ভর ও আত্মসমর্পণ তত বাড়িয়া চলিয়াছিল।

সেদিন রাখাল পূজা পাঠ শেষ করিয়া আসনের উপর তখনো চুপ করিয়া ফ্যালকা-মুখো হইয়া বসিয়া ছিল। জপের মালা তখনো হাতে রহিয়াছে।

মণিমালা আসিয়া ডাকিল—অত ভাবছ কেন? খাবে এস।

রাখাল শূন্য দৃষ্টিতে মণিমালার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া উদাস ভাবে বলিল—খাব? কি খাব? আমি ত খাবার কিছু জোগাড় করিনি কখনো!

—তুমি অত ভাবছ কেন? ভূপাল বেঁচে থাক, আমাদের দুঃখ কি?

—ভূপাল? আমার সব গেছে, ভূপালই কি বেঁচে আছে?

মণিমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে বুঝিল তাহার অমন জ্ঞানবান স্বামী জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে; তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।

মণিমালা চীৎকার করিয়া ভূপালকে ডাকিল।

ভূপাল তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—বাবা, এই যে আমি, আমি আপনার ভূপাল!

রাখাল হতাশ ভাবে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া

বলিল—তুমি আমার ভূপাল নও! তুমি কাঙালী, ভূপালের মুখোস মুখে দিয়ে আমায় ঠকাতে এসেছ! আর আমি ঠকছিনে!

মণিমালা কাতর হইয়া বলিল—আমাকে ত চিনতে পারছ? আমি ত তোমার মণি!

রাখাল তেমনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি চন্দনমণি!

বিভা আসিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—বাবা বাবা, আমি ত তোমার বিভা!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ তুই বিভা, আমি তোর সর্ব্বনাশ করেছি, তোকে আর চিনতে পারব না?

—বাবা, আমার অদেষ্টে ছিল, তুমি কি করবে। উঠে খেতে এস।

—তুই যে আমাকে বিষ খাওয়াবি, তোর হাতে আমি খাব না।

দুঃখের উপর এ এক দুর্দ্দৈব, রাখালকে খাওয়ানো দুষ্কর হইয়া উঠিল। কাহাকেও সে আর বিশ্বাস করিতে পারে না, কাহাকেও সে আর চিনিতে পারে না। সে সর্ব্বদা ঘরের এক কোণে অন্ধকারে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকে, আর হয় পূজা করে, নয় পাঁজি দেখে। বাহিরের কোনো লোকের সাড়া পাইলে বলে—আমাকে লুকোও লুকোও,

ও আমাকে মারতে এসেছে—আমি বোধহয় ওর কিছু উপকার করেছিলাম!

এ দৃশ্য আর চোখে দেখা যায় না। একদিন যাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছে, রাজার ন্যায় ভয় করিয়াছে, গুরুর ন্যায় যাহার নিকট হইতে সর্ব্বদা জ্ঞান-উপদেশ পাইয়াছে, যাহাকে পরম দৃপ্ত তেজস্বী বলিষ্ঠ দেখিয়াছে, তাহাকে আজ এমন নির্জীব জ্ঞানশূন্য হীন অবস্থায় দেখিতে বুক যেন ফাটিয়া যায়। ভূপাল সোহাগীর শোকে জর্জ্জরিত হইয়েছিল, তাহার উপর পিতাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আর সে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না।

মণিমালা বলিল—ভূপাল, কুবেরকে একখানা চিঠি লেখ। সে যদি কিছু এখন দ্যায় তা হলে ওঁর চিকিচ্ছে করাতে পারি।

ভূপাল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—না মা, অন্যের কাছে ভিক্ষে চাইব, কিন্তু ওর কাছে নয়।

মণিমালা তখন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরে লুকাইয়া বিভাকে দিয়া কুবেরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া চিঠি লেখাইল।

কিন্তু কুবের কোনো জবাবই দিল না।

আজকাল খাওয়া একরকম বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মণিমালা আবার নিজের জবানী চিঠি লেখাইল। সেও অনেক দিন হইয়া গেল, জবাব আসে নাই।

আজ কাহারো কিছু খাওয়া জুটে নাই। বেলা তিন-প্রহরের সময় ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদী ও বিন্দির প্রসাদ আসিবে, তখন তাহাই সকলে ভাগ করিয়া খাইবে। ভূপাল দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। অপর পিয়ন আসিয়া ভূপালের সামনে দুখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল।

ভূপাল চিঠি দুখানি পরম আগ্রহে তুলিয়া লইয়া দেখিল একখানি তাহার মাকে কুবের লিখিয়াছে, অপরখানি অপরিচিত হাতের লেখা, তাহার নামে।

কুবেরের চিঠি খুলিয়া ভূপাল মাকে পড়িয়া শুনাইল, কুবের লিখিয়াছে—"শ্রীচরণকমলে প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন, আপনার চিঠি পাইয়াছি। আমি জানি আপনারা ষ্টেট হইতে চল্লিশ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছেন; অতএব আমার নিকট আর কিছু আশা করিবেন না। ইতি সেবক শ্রীকুবেরচন্দ্র রায়।"

এই দারুণ দুঃখের উপর এই অপমান দেখিয়া মণিমালার হাসি আসিল।

ভূপাল বলিল—কেমন মা? আর ভিক্ষে চাইবে? আমরা সমস্ত দিন উপোষ করে একবেলা পরের দেওয়া প্রসাদ দুটি খেতে পাই, আর ওটা লিখেছে কিনা যে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা আছে! আমার মা-বাবা কি ওদের মতন চোর! থাকত সামনে ও......

মণিমালা চোখ রাঙাইয়া বাধা দিয়া বলিল—চুপ কর্‌ ভূপাল, ও তোর মামা!

ভূপাল নিরস্ত হইয়া দ্বিতীয় চিঠির খাম খুলিয়া দেখিল ষাট টাকা মাহিনায় নয়াসরাই স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে নিয়োগের পত্র আসিয়াছে। ভূপাল যেন সাম্রাজ্য লাভ করিল। একদিন বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইবে বলিয়া রাজা ধনেশ্বর যাহার নাম ভূপাল রাখিয়াছিলেন, সে আজ ষাট টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টারী পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল।

সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমার চাকরী হয়েছে!

তারপর হাসিমুখে ছুটিয়া রাখালের কাছে গিয়া বলিল—বাবা বাবা, আর আমাদের দুঃখ থাকবে না! আমার ষাট টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে!

মণিমালা, বিভা, প্রসাদী, নারাণদাসী, বিন্দি সকলে হাসিতে-হাসিতে সেখানে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল তখন পূজার আসনে বসিয়া ফুল-তুলসীতে চন্দন মাখাইয়া নারায়ণের চরণে দিতে যাইতেছিল। ভূপালের কথায় রাখালের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অনেক দিন পরে একটু হাসির রেখা তাহারও মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া ভূপাল চাকরী পাওয়ার চেয়েও আনন্দিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি

মাথায় লইল। রাখাল নারায়ণের নির্ম্মাল্য লইয়া পুত্রের মস্তকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য হাত বাড়াইল,—কিন্তু হাত কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপালের মাথা হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাখালের প্রাণহীন দেহ নারায়ণের টাটের সম্মুখে পুষ্পপাত্রের উপর ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

(সমাপ্ত)